ভয়ঙ্কর
অ্যাডভেঞ্চার

ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চার

সম্পাদনায়
অনিল ভৌমিক

মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশক ঃ
মহেশ চন্দ্র গুপ্ত
মহেশ পাবলিকেশন
৩৯২ ডি, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

লেজার সেটিং ঃ
লেটার সেটার
১০, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা-৬

অলঙ্করণে ঃ
সত্য চক্রবর্ত্তী
দীলিপ দাশ

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা

মুদ্রক ঃ
স্পেকট্রাম অফসেট
৫বি, কুণ্ডু লেন
কলিকাতা-৭০০ ০৩৭

নিবেদন

ছোটবড় সকলের কাছেই অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনীর আবেদন সমান। অন্য অনেক কাহিনী ভুলে গেলেও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী কিন্তু আমাদের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে দীর্ঘকাল। আসলে সকলের মধ্যেই কমবেশি অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় একটা মন বেঁচে থাকে। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী তার প্রেক্ষাপট কাহিনীর নায়ক অন্য চরিত্র—সব মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা চিরকালীন ভালো-লাগার ছাপ মনে ফেলে যায় যা আমরা কোনদিন ভুলতে পারি না।

সেইদিকে তাকিয়েই বর্তমান অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর সংকলন।

অনিল ভৌমিক

সূচীপত্র



ইতিহাসের কয়েকজন দুঃসাহসী ছেলেমেয়ে

রবিদাস সাহারায়

সব চেয়ে দুঃসাহসী ছেলে

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে। শক্তিতে আমেরিকা দুর্বল নয়। তবু কিছুদিন যুদ্ধ চলার পরই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন খুবই ভাবনায় পড়ে গেলেন। কিউবার স্পেনীয় বিদ্রোহী নেতা গার্সিয়া এখনো কোন পক্ষেই যোগ দেন নি। তিনি যে পক্ষে যোগ দেবেন সে দেশেরই পাল্লা ভারী হবে।

উড্রো উইলসন একটা জরুরী গোপনীয় চিঠি লিখলেন গার্সিয়ার নামে। সেই চিঠি পড়লে নিশ্চয়ই গার্সিয়ার মন নরম হবে, হয়তো ঝুঁকে পড়বে আমেরিকার দিকে।

চিঠি তো লিখলেন, এখন পাঠাবেন কি ভাবে?

গার্সিয়া কোথায় আছেন কেউ সঠিক জানে না। মাঝে মাঝে তাঁর সৈন্যরা রাত্রিবেলায় অতর্কিতে দেখা দেয়, আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। যতদূর খবর পাওয়া গিয়েছিল তাতে জানা যায়, কিউবা শহর থেকে বহুদূরে পর্বতের ওপর এক গভীর জঙ্গলের ভেতর গার্সিয়া থাকেন। সেখানে ডাক বিভাগের কোন লোক কোনদিন চিঠি বিলি করতে যায় নি।

এখন সমস্যা হল নিউইয়র্ক থেকে সেই অজানা জায়গায় গিয়ে গার্সিয়াকে খুঁজে বার করে কে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের গোপন চিঠি দেবে? এমন দুঃসাহসী মানুষ কে আছে?

দিনের পর দিন যায়, উইলসনের মন হতাশায় ভরে ওঠে। অনেক চেষ্টা করেও গার্সিয়ার কোন সঠিক খবর পাওয়া যাচ্ছে না। কে যাবে সাহস করে সেই পাহাড়ের ঘন অরণ্যে? সেজন্য প্রচুর পুরস্কার দিতেও তিনি রাজী।

এমন সময় এক সেনানায়ক এসে প্রেসিডেন্টকে গোপনে খবর দিলেন, একজন সাহসী লোকের খবর পাওয়া গেছে।

উইলসন জিজ্ঞেস করলেন,—কে সেই লোক?

সেনানায়ক জবাব দিলেন,—আমাদের এক প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষের ছেলে।

—তাকে সত্বর আমার কাছে নিয়ে এসো।

নিয়ে আসা হল ছেলেটিকে। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত চেহারার এক কিশোর যুবক। নাম, রোয়েন।

তার দিকে তাকিয়ে উল্লসিত উইলসন জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি সব কিছু শুনেছ তো? পারবে এই কাজ করতে?

রোয়েন ধীর স্থির ভাবে জবাব দিল,—নিশ্চয়ই পারব।

—এ কাজে খুব বিপদ, তা তুমি জান?

—হ্যাঁ জানি।

—এই কাজের বিনিময়ে তুমি কি পুরস্কার চাও?

—পুরস্কার কিছুই চাই না। তবে আমাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর কিছু সাজ পোশাক দিতে হবে। দিতে হবে নৌকো ভাড়া করার টাকা।

—বেশ, তা সবই দেওয়া হবে তোমাকে। কিন্তু কি স্বার্থে তুমি এই দুঃসাহসের কাজ করতে চাইছ?

—দেশের স্বার্থে। আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির দুশ্চিন্তার কারণও আমি বুঝতে পেরেছি।

প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন খুব খুশি হলেন। বুঝলেন, এই কিশোর ছেলেটিই হয়তো পারবে। তিনি মূল্যবান গোপন চিঠিটি দিলেন রোয়েনের হাতে। বললেন,—এই চিঠি অন্য লোকের হাতে যেন না পড়ে। তা হলে ভয়ানক ক্ষতি হবে। তোমার প্রাণ তো যাবেই, দেশেরও সর্বনাশ হবে।

রোয়েন বলল,—দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি এ চিঠি অন্যের হাতে দেবো না। কেউ ছিনিয়েও নিতে পারবে না।

উইলসন বললেন,—বেশ। তুমি বিশ্রাম কক্ষে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। অন্য সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমাকে দিয়ে দেওয়া হবে।

রোয়েন বিশ্রাম কক্ষে চলে গেল। কোমরের বেল্টের ভেতর একটা গোপন পকেটে লুকিয়ে রাখল মূল্যবান চিঠিটা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে গেল। নিজের একটা ডায়েরীও সে সঙ্গে করে এনেছিল। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে পিঠে-ঝোলানো ব্যাগে ভরে রোয়েন বিদায় নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

চারদিন পর দেখা গেল এক অন্ধকার রাত্রিতে কিউবার ধার দিয়ে সরু পাহাড়ী নদীর বুকে একটা ছোট ডিঙি নৌকা ভেসে চলেছে। নৌকোয় কোন ছাউনি নেই। এক পাহাড়ের গায়ে নৌকাটা রেখে এক তরুণ যুবক পাহাড়টার গা বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেই তরুণ আর কেউ নয়, রোয়েন।

কিন্তু তারপর তিন সপ্তাহ চলে গেল, রোয়েনের আর কোন খবর পাওয়া গেল না।

হঠাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে এক তরুণকে দেখা গেল নদীর বুকে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য মাত্র। ডিঙি নৌকো নদীর ঢেউয়ের বুকে দুলতে দুলতে কোথায় চলে গেল।

তারপর রোয়েনের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। আর কোনদিন ফিরেও আসেনি রোয়েন। কিন্তু অনেকদিন পরে তার নাম লেখা ডায়েরীটা পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ঃ

২৩ এপ্রিল ১৮৯৮। সকাল দশটার সময় একজন ইংরেজ শিকারীর বেশ ধারণ করলাম। জামাইকা পার হলাম। তার পরের দিন রাত একটার সময় এসে পৌছলাম সেন্ট এ্যানির উপসাগরে। একটি ছোট নৌকা নিলাম। ভোর বেলা ক্যারিবান সাগরে এসে পৌছলাম। সেখান থেকে কিউবার উপকূলে এলাম রাত প্রায় এগারোটার সময়। সেখানে আমাকে ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হল। একটু সূর্যের আলো দেখা দিতেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

১মে। দুপুর বেলা বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে এসে পৌছলাম। বিদ্রোহী নেতা গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা হল। চিঠি দিলাম। গার্সিয়া আমার সঙ্গে একটি লোক দিলেন। ফেরবার পথ সে-ই দেখিয়ে দিল।

৫মে। নতুন পথ দিয়ে সূর্যাস্তের পর আবার সমুদ্রের ধারে এলাম। সামনেই স্পেনীয়দের দূর্গ। সারি সারি কামান পাতা। তারই মধ্য দিয়ে রাত্রি বেলা অন্ধকারে পেরিয়ে এলাম বিস্তীর্ণ জলরাশি। যখন ভোর হল তখন কিউবার তীর আর দেখা যায় না।

অতি অল্প কথায় একান্ত অনাড়ম্বরভাবে রোয়েন তার নিজের ডায়েরীতে ঘটনাটি এইভাবে লিখেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ইতিহাসের গোপন খাতায় এই ঘটনাটিকে বলা হয়েছে—জগতের ইতিহাসে এর চেয়ে দুঃ-সাহসিক কাজ এত ধীর স্থির ভাবে আর কেউ করেনি।

পাহাড়-পর্বত, বিপদসঙ্কুল অরণ্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ভয়াবহ জলাভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটা, সম্পূর্ণ অজানাকে এমন করে খুঁজে বের করার এই কাহিনীকে বিখ্যাত মার্কিন লেখক এলবার্ট হাব্বার্ড অমর করে রেখেছেন। আমেরিকার প্রত্যেক ছাত্র এলবার্ট হাব্বার্ডের সেই লেখার সঙ্গে পরিচিত।

রোয়েনের পরিণাম কি হয়েছিল তা ইতিহাস পড়ে জানার উপায় নেই। কিন্তু সেই আমেরিকা-স্পেন যুদ্ধের পরিণতির কথা সবার জানা আছে। স্পেন পরাজিত হয়েছিল। আমেরিকার গৌরব রয়েছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু সেই গৌরব রক্ষার মূলে সবচেয়ে দুঃসাহসী সেই ছেলেটির দান কতটুকু ছিল, তার মূল্যায়ন করবে কে?

বিদ্রোহী পিতার বিদ্রোহী পুত্র

সুইটজারল্যান্ডকে বলা হয় ইউরোপের ক্রীড়াভূমি। অনেক নিপুণ তীরন্দাজ ঐ দেশে বাস করত। বীরের বাসভূমি হলেও বহুকাল ঐ দেশ ছিল পরাধীন। স্বাধীনতা লাভ করেছে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে১৬৪৮ সালে। কিন্তু বহু মানুষের আত্মদানের ফলেই সেই স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

উইলিয়াম টেল এবং তাঁর কিশোর পুত্রের সাহসিকতা ও দুঃখবরণের কাহিনী সুইটজারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

ইন্টারলেকেন ঐ দেশের একটি সুন্দর শহর। পাহাড় বেষ্টিত মুন ও ব্রীয়েজার হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত। সেখানেই বাস করতেন উইলিয়াম টেল এবং তাঁর পরিবার।

চতুর্দশ শতাব্দীতে সুইটজারল্যান্ড অনেকগুলো রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অস্ট্রিয়ার শাসনকর্তাদের দ্বারাই সেই সব রাজ্য শাসিত হত।

শাসনকর্তারা ছিলেন ভয়ানক অত্যাচারী। তাঁদের অত্যাচারে অনেক মানুষ জন্মভূমি ছেড়ে বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যেতে শুরু করে। সেই সব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই উপজীবিকা ছিল পশুপালন। তাদের ভেড়া ছাগল ও গরু অবাধে বিচরণ করত শস্যশ্যামল উন্মুক্ত প্রান্তরে।

পশুদের অবাধ বিচরণের সুযোগ থাকলেও, মানুষদের কিন্তু সে সুযোগ সুবিধা ছিল না। পদে পদে তাদের সহ্য করতে হত নানা বিধিনিষেধের হুমকি, আর কর আদায়ের উৎপীড়ন।

বর্গাটেন নামের রাজ্যটি ছিল ইন্টারলেকেনের পাশে। সেখানকার বাসিন্দা মরিসন ছিলেন একজন সাহসী ও সৎ নাগরিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজ্যের গভর্নরের কোপদৃষ্টি পড়ল মরিসনের ওপর। অত্যাচারে বিব্রত হয়ে মরিসন গভর্নরকে হত্যা করে পালিয়ে গেলেন।

গভর্নরের অশ্বারোহী সৈন্য ছুটল মরিসনকে ধরার জন্য। মরিসন বনজঙ্গল পেরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন ইন্টারলেকেনে। আশ্রয় ভিক্ষা করলেন অনেক গৃহবাসীর কাছে। কিন্তু শাসকদলের অত্যাচারের ভয়ে কেউ আশ্রয় দিল না।

শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম টেল তাঁকে আশ্রয় দিলেন। শুধু আশ্রয় দেওয়াই নয়, আরও অনেক উপকার করলেন। মরিসনের স্ত্রীপুত্ররা তখন ছিল গৃহবন্দী। উইলিয়াম টেল নিজের কিশোর পুত্র ডেসমন্ডকে পাঠিয়ে মরিসনের বাড়ি থেকে তাঁর পরিবারের সবাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

এবার ইন্টারলেকেনেই চলল সেখানকার গভর্নরের অত্যাচার। খানাতল্লাশির নামে যার তার ওপর অযথা উৎপীড়ন। এক নিরীহ গৃহস্থ ছিল ফুস্ট। তার খামারবাড়ির সব চেয়ে সেরা বলদ দুটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাবার জন্য এল কয়েকজন সরকারী ফৌজদার। ফুস্ট তাদের একজনকে গুরুতর আঘাত করে পলাতক হল। কিন্তু সে পালিয়ে নিস্তার পেলেও, তার পরিবার নিস্তার পেল না। অস্ট্রিয়ান ফৌজদার, ফুস্টের পিতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। গভর্নর ফুস্টের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিলেন। শুধু তাই নয়, ফুস্টের পিতার চোখ উপড়ে নেবারও আদেশ দেওয়া হল।

সেই খবর গিয়ে পৌঁছল উইলিয়াম টেল-এর কাছে। তিনি স্থির করলেন, যেভাবেই হোক এই অন্যায় নৃশংস কাণ্ড রোধ করতে হবে। তিনি দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে গোপনে এই খবর প্রচার করে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে লাগলেন।

ওদিকে জোটবদ্ধ হতে লাগলেন অস্ট্রিয়ান গভর্নররাও। বিদ্রোহ যাতে জোরদার হতে না পারে, সেজন্য তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

আল্টওক রাজ্যের শাসনকর্তা, জেসলার ছিলেন অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি লুসান হ্রদের ধারে সদর রাস্তার ওপর একটা লাঠির মাথায় তাঁর

টুপি রেখে, প্রত্যেককে সেখানে নতজানু হয়ে অস্ট্রিয়ান সরকারের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আদেশ জারী করলেন।

ঠিক তখনই উইলিয়াম টেল মরিসনের পরিবারকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে, তাঁর বারো বছরের ছেলে ডেসমণ্ডকে নিয়ে কাঁধে ধনুর্বাণ ঝুলিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলেন। লুসান হ্রদের ধারে রাস্তায় সেই দৃশ্য দেখলেন, কিন্তু নতজানু হলেন না। তার ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। একই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হল পুত্র ডেসমণ্ডকে। দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হল জেসলারের কাছে।

জেসলার অনেকদিন থেকেই উইলিয়াম টেল-এর ওপর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি বললেন,- তোমার ছেলের সামনে তোমাকে আমি ফাঁসির কাঠে ঝোলাবো। আর তোমার ছেলেকে বাধ্য করবো আমার টুপি ঝোলানো সেই লাঠিটার সামনে তার মাথা নত করতে।

সে কথা শুনে ছেলে ডেসমণ্ডের বুক কেঁপে উঠল। বলল, - আমার বাবাকে ফাঁসি দেবেন না। বাবা মারা গেলে আমাদের সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। দেশের অনেক ক্ষতি হবে। আমি মারা গেলে কারুর কোন ক্ষতি হবে না। আমাকে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে মেরে ফেলুন।

জেসলার ডেসমণ্ডের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর উইলিয়াম টেল-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, - তোমাকে মুক্তি দিতে রাজী আছি, যদি তুমি একটি কাজ করতে সম্মত হও।

- কি কাজ?

- শুনেছি তুমি খুব ভাল তীরন্দাজ। তোমার বাবাও নাকি তাই ছিলেন। তোমার ছেলের মাথার ওপর আমি একটি আপেল রেখে দেবো। তুমি যদি সেই আপেলকে লক্ষ্যভেদ করতে পারো, তবেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

উইলিয়াম টেল জীবনে অনেক কিছু লক্ষ্যভেদ করেছেন, কিন্তু এরকম লক্ষ্যভেদের কথা কখনো কল্পনাও করতে পারেন নি। এই লক্ষ্যভেদে পুত্রের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

টেল বললেন,- আপনি অন্য যে কোন লক্ষ্যভেদ করতে আদেশ দিন, তা পালন করতে প্রস্তুত আছি।

কিন্তু অত্যাচারী গভর্নর তাঁর আদেশ পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। বললেন, - এই পরীক্ষাই তোমাকে দিতে হবে।

কিছুক্ষণ কি ভাবলেন উইলিয়াম টেল। তারপর বললেন, -আমার ধনুর্বাণ তো আপনার রক্ষীরা কেড়ে নিয়েছে। আমাকে ধনুর্বাণ ফিরিয়ে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক।

জেসলার তীরধনুক টেলকে ফেরত দেবার হুকুম দিলেন। প্রহরী তীরধনুক নিয়ে এল। কিন্তু জেসলার বললেন, মাত্র একটি তীরই তোমাকে দেওয়া হবে। ঐ একটি তীরেই লক্ষ্যভেদ করতে হবে তোমাকে। দুবার সুযোগ দেওয়া হবে না।

উইলিয়াম টেল জবাব দিলেন, - বেশ কিন্তু আর একটি তীর দয়া করে আমাকে দিন। কারণ নিজের একমাত্র ছেলের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি লক্ষ্যভেদ করছি। হাত কাঁপতে পারে, মন চঞ্চল হতে পারে। ছেলে ভয়ে হয়তো মাথা সরিয়েও ফেলতে পারে। তাই আমার এই শেষ অনুরোধ।

জেসলার সম্মত হলেন। ধনুকের সঙ্গে দুটি তীর টেলকে দেওয়া হল।

টেল একটি তীর লক্ষ্যভেদের জন্য রেখে, বাকি তীরটি কোমরে গুঁজে রাখলেন। টেল-এর ছেলে ডেসমণ্ডকে দূরে দাঁড় করিয়ে তার মাথায় একটি আপেল রেখে দেওয়া হল। টেল লক্ষ্যভেদ করার জন্য তীরধনুক নিয়ে তৈরী হলেন। উপস্থিত দর্শকের বুক তখন কাঁপছিল। কি হবে কে জানে! নিষ্পাপ বালকটির জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে।

অনেকে ভয়ে চোখ বন্ধ করল। উইলিয়াম টেল তীর ছুঁড়লেন। অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। ঠিক আপেলটিকে বিদ্ধ করে তীরটি পেছন দিকে ছুটে গেল।

ঘন ঘন করতালি ও হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চারিদিক।

মুক্তি দেওয়া হল উইলিয়াম টেলকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে জেসলার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,-তুমি এত নিপুণ তীরন্দাজ হয়েও দুটি তীর কেন চেয়েছিলে বল তো?

টেল নির্ভীক ভাবে জবাব দিলেন,-যদি কোন কারণে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমার পুত্রের মৃত্যু ঘটাতো, তাহলে বাকি তীরটি আপনার দিকেই ছুঁড়ে দিতাম।

সে কথা শুনে জেসলার ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন,- বটে! এত স্পর্ধা তোমার?

জেসলার বালক ডেসমণ্ডকে মুক্তি দিয়ে উইলিয়াম টেলকে পুনরায় বন্দী করে হ্রদের অপর পারে কারাগারে নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে ডেসমণ্ড বাড়ি চলে গেল।

সরকারী ফৌজ টেলকে বন্দী করে নৌকায় তুলে নিয়ে চলল হ্রদের ওপারে বন্দীশালার দিকে। কিন্তু কারাগারে নিয়ে যাওয়া আর হল না। নৌকা হ্রদের মাঝখানে যেতে না যেতেই টেল লাফিয়ে পড়লেন নৌকা থেকে। ডুব সাঁতারে ফৌজদের বিভ্রান্ত করে পালিয়ে গেলেন।

এর পরের কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা অনেক খুঁজেও উইলিয়াম টেলকে ধরতে পারেনি। তারা টেল-এর বদলে তাঁর ছেলে ডেসমণ্ডকে ধরে নিয়ে এল। জেসলার ডেসমণ্ডকে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার বাবা কোথায়?

ডেসমণ্ড জবাব দিল, জানি না।

—সে রাত্রিবেলা বাড়িতে আসে না, লুকিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে?

—না।

উইলিয়াম টেল কিন্তু মাঝে মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে ধূমকেতুর মত দেখা দিতেন। দিয়ে যেতেন কিছু খাবার। কিছু খবরাখবরও সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন।

জেসলার জিজ্ঞেস করলেন,-তোমার বাবা তাহলে কোথায় পালিয়ে বেড়ায়? কোথায় কোথায় সে যেতে পরে আন্দাজ করতে পার?

ডেসমণ্ডের একই জবাব,-না, কিছুই বলতে পারি না।

তখন জেসলার লোভ দেখাতে শুরু করলেন ডেসমণ্ডকে। বললেন,-তোমাকে অনেক টাকা দেব, তুমি বলে দাও। বাড়িতে তোমরা এত কষ্ঠ করে থাক, ঠিক মতো তোমাদের খাওয়া দাওয়া চলে না। যত টাকা চাও দেব তোমাদের। শুধু তোমার বাবার খবরটা বলে দাও।

জেসলার বুঝতে পারলেন, লোভ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। তখন জানলে নিশ্চয়ই বলতাম।

জেসলার বুঝতে পারলেন,লোভ দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। তখন ডেসমণ্ডের ওপর অত্যাচার করার নির্দেশ দিলেন। সৈন্যরা নির্দয় ভাবে প্রহার করতে লাগল জেসমণ্ডকে । কিন্তু ডেসমণ্ডের মুখ থেকে কোন কথাই প্রকাশ পেল না। প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে অচেতন হয়ে পড়ল।

অবশেষে জেসমণ্ডকে কারাগারে বন্দী করে রাখা হল। নিয়মিত নির্যাতনের ব্যবস্থাও হল তার ওপর। জেসলার ভাবলেন, এই অত্যাচারের কথা জানতে পারলে উইলিয়াম টেল নিজেই এসে ধরা দেবে।

কিন্তু উইলিয়াম টেল ধরা দিলেন না। তিনি ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন নানা রাজ্যে। লোকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। মানুষকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের উপায়।

অনেক কষ্টে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত তিনটি রাজ্যের মানুষকে একত্রিত

করতে সমর্থ হলেন। গঠন করলেন গুপ্ত সেনাবাহিনী। অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন নানা কৌশলে। তারপর তিনটি রাজ্যের মিলিত স্বদেশী সেনাবাহিনী নিয়ে অস্ট্রীয় সৈন্যদলকে আক্রমণ করলেন।

স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষিত সৈন্যদলের কাছে অস্ট্রীয় বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল।

এভাবেই রচিত হয়েছিল সুইটজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ভিত্তি। তারপর একে একে বাইশটি খণ্ড রাষ্ট্র নিয়ে গড়ে উঠল নতুন সুইটজারল্যান্ড ।

বিখ্যাত জার্মান কবি শিলার এই স্বাধীনতার সংগ্রামকে নাটকে রূপদান করলেন। এখনো সেই নাটক গৌরবের সঙ্গে সুইটজারল্যাণ্ডে অভিনীত হয়।

বিদ্রোহীরাই লুসান হ্রদের পাড়ে কারাগার ভেঙে বন্দী কিশোর ডেসমণ্ডকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল। কিশোর ডেসমণ্ডের কাহিনী এখনো দেশবাসীর মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

কিশোরী মেয়ের অমর কীর্তি

ডেস্‌মোইন্স উপত্যকার কোলে ছোট্ট একটি কাঠের বাড়ি। আমেরিকার আইওরা প্রদেশের এই উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি খুব সুন্দর। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

উপত্যকার ঐ বাড়িটি এখন আর দেখতে না পাওয়া গেলেও ঐ অঞ্চলে লোক আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে—ওখানেই ছিল কেট্ শেলীর বাড়ি। একটি ছোট্ট কাঠের বাড়িতে বাস করত কেট্ শেলী, তার বাবা, মা ও ভাইবোনদের নিয়ে।

ঐ উপত্যকারই এক সমতল জায়গায় সামান্য একটু চাষের জমি ছিল শেলীর বাবার। তাতে সংসার চলত না। ছিল দু'তিনটি গাই-বাছুর। কয়েকটা হাঁস মুরগিও ছিল। তাতেই মোটামুটিভাবে সংসার চলে যেত।

একদিন উপত্যকার কোল ঘেঁষে বসল রেলের লাইন। তাতে ঐ অঞ্চলের লোকদের যাতায়াতের সুবিধা হল। শেলীর বাবারও সুবিধা হল খুব।

রেললাইনের ধারে ঐ উপত্যকাতেই একটি ছোট্ট সাব-স্টেশন তৈরি হল। সেই স্টেশনের দেখাশোনার ভার পেয়ে গেল শেলীর বাবা টমসন। সেজন্য মাইনেও পেতেন।

খুব ভোর বেলা একটা গাড়ি যেত ঐ লাইন দিয়ে। গড়িটা অবশ্য সাব-স্টেশনে ভিড়ত না। তবু লাইন-ক্লিয়ারের সংকেত জানাতে হত টমসনকে।

টমসনের হয়তো কোনদিন একটু দেরি হতো ঘুম ভাঙতে। কেট্ শেলী ডেকে তুলতো বাবাকে,-বাবা, বাবা, ওঠো। ইস্টিশনে যাবে না? গাড়ি আসার সময় হয়ে গেল যে।

মেয়ের ডাক শুনে টমসন ধড়মড় করে উঠে বসতেন বিছানার ওপর। মুখ চোখ না ধুয়েই কোন রকমে জামাটা গায়ে দিয়ে বোতাম লাগাতে লাগাতে ছুটে যেতেন স্টেশনের দিকে।

ওদিকে শেলীর মা চা তৈরী করেছে। শেলী বলত,-বাবা, বাবা! চা'টা খেয়ে যাও।

টমসন ছুটে যেতে যেতে বলতেন-না, এখন সময় নেই। ফিরে এসে খাব।

সবুজ নিশান উড়িয়ে ট্রেনটাকে পার করিয়ে দিয়ে টমসন কিছুক্ষণ পর ফিরে আসতেন বাড়ি। তারপর নিশ্চিন্তে বসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খেতেন।

রেলের চাকরির জন্য কিছু বাড়তি টাকা সংসারে আসায় দিন তাদের বেশ সুখেই কাটতো।

কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন তাদের ভাগ্যে সইল না। হঠাৎ একদিন শেলীর বাবা মারা গেলেন। শেলীর ছোট ভাই জনের-ও মৃত্যু হল। পরপর দুটি শোকের আঘাতে শেলীর মায়ের শরীর গেল ভেঙে। আগের মত কাজ করার ক্ষমতা আর তাঁর রইল না।

এরপর থেকে শেলীকে খুবই খাটতে হত। গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগি সব কিছুই দেখাশোনা করতে হত তাকে। বয়স তখন তার মাত্র পনের বছর।

১৮৮১সাল। সে বছর খুবই ঝড়বৃষ্টি হতে লাগল।

একদিন সকাল থেকেই শুরু হল বৃষ্টি। থামবার নাম নেই। তার ওপর সন্ধ্যাবেলা থেকে শুরু হল প্রবল ঝড়। বোঝা গেল প্রচণ্ড দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে।

প্রায় সারাদিন লেপের তলায় ছিল তারা। কিন্তু রাত বাড়তেই ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতও বাড়তে লাগল। তখন শেলী আর স্থির থাকতে পারল না। বিছানার ওপর উঠে বসল।

মা জিজ্ঞেস করলেন,- কি হল, উঠলি কেন?

শেলী জবাব দিল,-গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগিগুলোকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে না?

কোথায় ছেড়ে দিবি?-মা জিজ্ঞেস করলেন।

শেলী বলল,-যে রকম জল হচ্ছে, বন্যা হবে নির্ঘাত। জল কতটা উঠবে কে জানে? গরু-বাছুর বাঁধা থাকলে, হাঁস-মুরগি বাক্স-বন্দী থাকলে ওরা জলে ডুবে মারা যাবে যে। দেখি ওদের ওপরে নিয়ে আসতে পারি কিনা।

মা চুপ করে রইলেন।

ওদের গোয়ালঘর ছিল থাকবার কাঠের বাড়ি থেকে অনেক নিচে। পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে। বাড়িতে জল উঠবার অনেক আগেই সেখানে জল উঠবে। তখন সত্যি বিপদ হবে ঐ সব অবোধ প্রাণীদের।

ঝড়ের বেগ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

শেলী নিচে যাবার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু এই দুর্যোগে মেয়েকে ছেড়ে দিতে মায়ের মন চাইল না। তাই বললেন,-বাইরে যা অবস্থা, গরু, হাঁস, মুরগির জন্য গিয়ে তোর কোনো বিপদ হতে পারে। থাক্ না হয় গরু-বাছুর। উপায় কি? আর একটু দেরি কর্।

শেলী বলল,-না মা, দেরি করলে ওদের আরও কষ্ট হবে। আমি তাড়াতাড়ি ওদের ছেড়ে দিয়ে এখনই চলে আসছি।

মা বললেন,-ওরা যদি অন্য দিকে চলে যায়?

শেলী জবাব দিল,-তবু তো জলে ডুবে মরার হাত থেকে বেঁচে যাবে!

মা আর কিছু বললেন না।

শেলী ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। নেমে যেতে লাগল গোয়াল ঘরের দিকে। কিন্তু বাতাসের এত বেগ যে এগিয়ে যাওয়াও মুশকিল। তার ওপর জলের ঝাপটায় চোখ যাচ্ছিল বন্ধ হয়ে। অতি কষ্টে গোয়াল ঘরে নেমে গেল শেলী। গরু-বাছুর ও হাঁস-মুরগিকে ছেড়ে দিয়ে ওপরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

দুর্যোগের ঐ ভয়ানক অবস্থা বুঝি বুঝতে পারল ঐ সব অবোধ প্রাণীরাও। তারা নিজেরাই তাই ওপরে উঠে আসতে লাগল।

শেলীর মন অনেকটা নিশ্চিন্ত হল এবার। ঘরে ফেরার জন্য পা বাড়াল। কিন্তু হঠাৎ তার কানে গেল রেলের ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ। এটা গাড়ি নয়, খালি ইঞ্জিনটা যাবে পূব দিক থেকে মালগাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে।

রোজই তাই করে ইঞ্জিনটা। কিন্তু আজ কি হবে?

শেলীর হঠাৎ মনে পড়ল, তার বাবার মৃত্যুর পর রেল কোম্পানি থেকে একজন লোককে ঠিক করা হয়েছিল রেল লাইন ও স্টেশন দেখাশোনা করার জন্য। কিন্তু এই দুর্যোগে সে কোথায় গেছে কে জানে!

ইঞ্জিনটা নিশ্চয়ই বিপদের মুখে পড়বে।

শেলী ঘরের দিকে না গিয়ে সেদিকেই ছুটে যেতে লাগল। অন্ধকারে পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। ঝোপে ঝাড়ে শরীরটা আটকে যাচ্ছে। পিচ্ছিল পথে হড়কে যেতে লাগল পা। তবু লাইনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল সে।

ইঞ্জিনটা এগিয়ে আসছে। একটু পরেই কাছে এসে পড়ল। ইঞ্জিনের সামনের বড় আলোটা জোরালোভাবে জ্বলছে। চালক ও তার সহকারী বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে উদ্বিগ্নভাবে। অজানা বিপদের আশঙ্কায় তাদের মন আচ্ছন্ন।

শেলীর মনে পড়ল সামনেই রয়েছে একটি ঝরণা। কিছুদিন আগেও সেটা ছিল ক্ষীণস্রোতা ঝরণা মাত্র। আজ হয় তো তা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। তার উপরের পুরনো পুলটা কেমন আছে কে জানে?

আশঙ্কা ও কৌতূহল নিয়ে শেলী ছুটে কয়েকটা বড় পাথর ডিঙিয়ে ও পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওখান থেকে পুলটা দেখা যায়। কিন্তু আজ আর ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বাজ পড়ল। দেখা গেল ইঞ্জিনটা এসে পড়েছে। ঘন ঘন চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ।

দেখতে দেখতে ইঞ্জিনটা সেতুর ওপর এসে পড়ল।

ক্কড়-ক্কড়-ক্কড়াৎ !!

বিরাট আওয়াজ করে পুলটা ভেঙে পড়ল। সেই সঙ্গে পড়ে গেল ইঞ্জিনটাও। নিচে তখন জলের প্রবল গর্জন। বন্যার জলের সঙ্গে ঝরনার স্রোত মিশে আজ ভয়ঙ্কর রূপ ধরেছে।

আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতেই শেলী দেখতে পেল ইঞ্জিনের চালক আর তার সহকারী ঘূর্ণিতে পাক খেতে খেতে খরস্রোতের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কী মর্মান্তিক দৃশ্য!

অস্ফুট আর্তনাদ করে সেখানেই বসে পড়ল শেলী। কিছুক্ষণ পর কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

কিন্তু দু'পা গিয়েই শেলী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ তার খেয়াল হয়নি যে এখনই পশ্চিম দিক থেকে এক্সপ্রেস ট্রেন এসে পড়বে। সেটাই এই লাইনের সব চেয়ে বড় যাত্রীবাহী গাড়ি। তাতে কামরাও থাকে বেশি। এই খালি ইঞ্জিনটা চলে যাবার আধঘণ্টা পরেই ঐ গাড়িটা আসে। সেই গাড়ির চালক জানতেই পারবে না এই সেতুটা ভেঙে গেছে। সবসুদ্ধ গাড়িটাই নদীতে পড়ে যাবে।

ভাবতেই শেলীর সারা গা শিউরে উঠল। প্রায় হাজার খানেক যাত্রী থাকে সেই ট্রেনে। সেই যাত্রীরা এইসব ঘটনার কথা কিছুই জানে না। জানেনা তাদের সামনে মৃত্যুর ফাঁদ। অনেকেই হয়তো ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

কি করবে এখন শেলী? কাউকে দিয়ে খবর পাঠাবে আগের স্টেশনে? কিন্তু গ্রামে গিয়ে লোক ডেকে তাকে রাজী করাতে করাতে ট্রেন এসে পড়বে। অত সময় কোথায়?

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চিন্তা করল শেলী। তার পরেই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। অন্য কোন উপায় নেই। ঐ নিরীহ লোকগুলিকে রক্ষা করতে হলে. তাকেই তাড়াতাড়ি আগের স্টেশনে ছুটে যেতে হবে।

এই রেল লাইন দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। যদি ট্রেন এসে পড়ে. পথের মাঝেই আটকে দিতে হবে ট্রেনটাকে।

ছুটে চলল শেলী। রেল লাইন ধরেই দৌড়তে লাগল। সামনে আর একটা সেতু আছে। ডেসমোইন্স ব্রীজ। ওটা পেরিয়ে গেলে তার কিছুদূর পরে স্টেশন। সেটাই বড় স্টেশন। যেতে হবে সেখানেই।

ঝড়ের তাণ্ডব তখন প্রবল বেগেই চলছে। বৃষ্টির ঝাপটা এসে লাগছে গায়ে চোখে মুখে। বিঁধছে কাঁটার মত। বিদ্যুৎ চমক চোখকে ঝলসে দিচ্ছে বারবার। তবু সেই আলোতে পথ দেখে দেখে ছুটে চলেছে ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত শেলী। প্রায় এক হাজার লোকের প্রাণ তার হাতে। শরীর যেন ভেঙে পড়ছে, পা চলতে চাইছে না। তবু মন যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে এসে গেল সেই সেতুর কাছে। নদীর ওপর সেতু। লাইনের তলায় ফাঁকে ফাঁকে কাঠের শ্লিপার। পা পিছলে পড়ে গেলেই নিচের গভীর জলে ডুবে যেতে হবে। কোন কিছুকে অবলম্বন করে যে সেতুটা পার হবে তারও ব্যবস্থা সেই। কাঠের শ্লিপারে পা হড়কে যাচ্ছে, তবু থামতে পারছে না।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে মোইনগুলা স্টেশন, আলো জ্বলছে।

শেলী যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়বার ঘন্টা দিয়েছে। এখনই ছেড়ে দেবে ট্রেন। কোন মতে প্ল্যাটফর্মে উঠে এসে ইঞ্জিন চালককে খবরটা দিল শেলী। তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। শুধু মানসিক শক্তির জোরেই সে ছুটে এসেছিল, গায়ে এতটুকু শক্তিও বুঝি অবশিষ্ট ছিল না।

গাড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্টেশনেই। লোকজন শেলীর অচেতন দেহটার চারদিকে ভিড় করল। তখনই শুরু হল অনুসন্ধান। সব খবরই জানা গেল। বন্ধ করে দেওয়া হল ট্রেন চলাচল।

পনের বছরের কিশোরী কেট্ শেলীর এই দুঃসাহসের কাহিনী সারা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। ধন্য কেট্ শেলী, যে নিজের জীবন বিপন্ন করেও হাজার মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে দিল।

এরপর ডেস্‌মেইন্স নদীর ওপর এক নতুন ইস্পাতের সেতু তৈরী হল। তার নাম রাখা হল কেট্ শেলী ব্রীজ। এখনো সেই সেতু দুঃসাহসী এক কিশোরী মেয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রথম মেয়ে যে আকাশে উঠেছিল

আমেরিকার মেয়ে এমিলিয়া ইয়ারহার্ট। শিকাগোর হাইডপার্ক স্কুলে পড়ে। কিন্তু স্কুলে কামাই করে প্রায়ই। মাঝে মাঝেই অসুখে ভোগে। বাবা মা এজন্য খুব চিন্তিত। এই বয়সেই যদি এত অসুখে ভোগে তাহলে লেখাপড়া শিখবে কেমন করে?

অসুখে ভুগলেও মেয়েটির মনে কিন্তু সাহস খুব। দুঃসাহসিক নানা কাজ করার দিকে তার ঝোঁক।

কিন্তু তাকে দমিয়ে দেয় তার অসুখ। তবু নিজের মেধার জোরেই উনিশ বছর বয়সে সে গ্র্যাজুয়েট হল। মনের জোরে নার্সিং-এর কাজ শিখল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। টরেন্টোর হাসপাতালে নার্সের সহকারিণী রূপে কাজ নিয়ে সে চলে গেল। বয়স তখন তার একুশ।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। হাসপাতালের চাকরি হল শেষ। এমিলিয়া তখন শরীরের অসুস্থতাকে জয় করে হয়ে উঠেছেন এক স্বাস্থ্যবতী তরুণী যুবতী।

সেই সময়ে একদিন খবরের কাগজে ছাপা হল একটি সংবাদ। ক্যালিফোর্ণিয়ায় হবে উড়োজাহাজের পাইলটের এক বিচিত্র প্রদর্শনী। পাইলটরা তাতে নানা ধরনের কসরত দেখাবেন। খবরটা পড়েই এমিলিয়ার কৌতূহল জেগে উঠল।

পিতা জর্জ ব্রাউন মেয়েকে নিয়ে গেলেন ক্যালিফোর্ণিয়ায়। সেখানে পাইলটদের বিচিত্র কৌশলের খেলা দেখে এমিলিয়া তাজ্জব।

ঐ খেলাই এমিলিয়ার মনের গতিকে ঘুরিয়ে দিল। তাঁর মনে আগ্রহ জাগল, তিনি বৈমানিক হবেন।

একদিন মনের সেই ইচ্ছার কথা এমিলিয়া জানালেন তাঁর বাবাকে।

জর্জ ব্রাউন অবাক হয়ে বললেন, এ যে বড় দুঃসাহসিক কাজ। পুরুষরাই ভয় পায়, আর তুমি তো মেয়ে। এই ইচ্ছা মন থেকে দূর কর এমিলিয়া।

কিন্তু এমিলিয়া কিছুতেই পিছিয়ে গেলেন না।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় গেলেন এমিলিয়া বিমান শিক্ষার মহড়া নিতে। কিন্তু মেয়ে বলে প্রশিক্ষকরা তাঁকে শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এমিলিয়ার প্রবল ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের হার মানতে হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক বৈমানিক সঙ্ঘ থেকে ১৯২৩ সালে তাঁকে লাইসেন্স দেওয়া হল।

তবু দেখা দিল অনেক বাধা বিপত্তি। কারণ দেশ বিদেশের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার অনুমতি পেলেও বৈমানিক জগতে মেয়েদের প্রবেশের অধিকার ছিল না।

হতাশ হলেন এমিলিয়া, কিন্তু দমলেন না। বৈমানিক হওয়ার পথ অবরুদ্ধ দেখে তিনি আবার কলেজে ভর্তি হলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াশুনা করে চলে গেলেন বোস্টনে। সেখানে সমাজ সেবার কাজে ব্রতী হলেন। সেই সময়েই বিখ্যাত লেখক এবং পুস্তক প্রকাশক জর্জ পামার পুটনাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

জর্জ পামার এমিলিয়ার মনের উচ্চাভিলাষের কথা জানতে পেরে দারুণ খুশি হলেন। উৎসাহ দিতে লাগলেন এমিলিয়াকে।

১৯২৮ সালের বসন্তকাল। হঠাৎ বোস্টন শহরের সমাজসেবার প্রতিষ্ঠানটিতে ফোন বেজে উঠল। এমিলিয়া ফোন ধরলেন, —হ্যালো, কে?

অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন ভেসে এল, মিস এমিলিয়া ইয়ারহার্ট আছেন?

—হ্যাঁ, বলছি, আপনি কে?

—আমি জর্জ পামার। এমিলিয়া, তোমার তো আকাশে বিচরণের খুব ইচ্ছা। প্লেনে তুমি আটলান্টিক পাড়ি দিতে রাজী আছ?

—কি রকম প্লেন?

—মজবুত, তিন ইঞ্জিনওয়ালা ফকার প্লেন। জলে পড়ে গেলেও ভাসবার ব্যবস্থা আছে তাতে। তাছাড়া তাতে থাকবেন দক্ষ পাইলট হিলমার স্টালৎস আর বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার লুই গর্ডন।

—আমি কি হিসাবে যাব?

—প্রথমে যাত্রী হিসেবেই যাবে। তারপর দেখা যাক্ তুমি কি সুযোগ সুবিধা

করতে পারো। তবে এই দীর্ঘ যাত্রার আকাশপথে তুমিই হবে প্রথম মহিলা যাত্রী।

সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন এমিলিয়া। বললেন,—বেশ, আপনিই ব্যবস্থা করে দিন।

জর্জ পামারই সব বন্দোবস্ত করে দিলেন। ফ্রেন্ডশিপ নামে এই বিমানটি কিনেছিলেন মিসেস ফ্রেডারিক গেস্ট নামে এক ধনী মহিলা। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার মতলব ছিল তাঁর। কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের প্রচন্ড বাধায় শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হন মহিলা। সেই আসনে স্থান পেলেন এমিলিয়া।

দীর্ঘ আকাশ পথে প্রথম মহিলা যাত্রী হবার সৌভাগ্যও লেখা ছিল এমিলিয়ার কপালে।

১৯২৮ সালের ১৭ই জুন ফ্রেণ্ডশিপ বিমান যাত্রা করল আটলান্টিকের ওপর দিয়ে। ভাগ্যক্রমে এমিলিয়ার বসবার স্থান হয়েছিল বিমান চালকের পাশেই।

সুদীর্ঘ পথ। চার ঘন্টা চলার পরই বিপদের সম্মুখীন হতে হল। আকাশে জমতে লাগল ঘন কুয়াশা। সামনে পেছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে ও সতর্কতার সঙ্গে বিমান চালাতে হচ্ছিল চালককে।

সেখানেই বিপদের শেষ নয়। আরও পথ অতিক্রম করার পর আকাশে উঠল ঝড়—প্রচন্ড ঝড়। এগিয়েও নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না বিমানকে পাইলটের খুশি মতো।

ঝড়ে দোল খাচ্ছে বিমান। এই বুঝি নিচে পড়ে যাবে। জীবনের শেষক্ষণ ঘনিয়ে আসবে।

কিন্তু পাইলট মনের বল হারান নি। কত রকম কৌশল করে আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিমানের গতিকে সংযত করতে লাগলেন। পাশে বসে সব দেখতে লাগলেন এমিলিয়া। এমন দুঃসাহসী না হলে কি পাইলট হওয়া যায়?

রুদ্ধশ্বাসে কাটতে লাগল সময়। অবশেষে ২০ ঘন্টা ৫০ মিনিট পরে ওয়েলসের বেরিপোর্ট শহরে সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ফ্রেন্ডশিপ বিমান অবতরণ করল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যাত্রীরা। তাঁরা যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন।

এমিলিয়া বাড়ি ফিরে এসে সেই রুদ্ধশ্বাস ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখলেন। বইয়ের নাম দিলেন "Twenty hours fifty minutes"। সেই বই ছেপে প্রকাশ করলেন লেখক ও পুস্তক প্রকাশক জর্জ পামার পুটনাস।

বইটি সেই বছরে বেস্ট সেলার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

এরপর এমিলিয়া হয়ে উঠলেন সংবাদপত্রের একটি শিরোনাম। তখন তাঁকে বিনা বাধায় বৈমানিক জগতে স্থান দেওয়া হল। বৈমানিক হিসাবে তাঁকে দেওয়া হল একটি স্থায়ী চাকরি। কিছুদিন পর তাঁর বিয়ে হল জর্জ পামার পুটনামের সঙ্গে। নতুন জীবনে এমিলিয়াকে সংসারে জড়িয়ে দিলেন না জর্জ পামার। বিমান-চালিকা হিসাবে তাঁর ইচ্ছারও কোন বিরোধিতা করলেন না।

১৯৩২ সালের পর থেকে এমিলিয়া কখনো আটলান্টিকের ওপর দিয়ে, কখনও বা ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে একাকী বিমানে পাড়ি দিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপ থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ার অকল্যান্ডে যে প্রথম মহিলা বৈমানিক ১৯৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিমান চালিয়ে কৃতিত্ব অর্জন করলেন—তিনি হলেন এমিলিয়া। তার সঙ্গে শুধু একজন ন্যাভিগেটর ছিল। সেই বছরেই মে মাসে নিউইয়র্ক থেকে মেক্সিকোতে পাড়ি দিলেন তিনি।

এমিলিয়ার দুঃসাহস আরও বেড়ে গেল। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, গোটা পৃথিবীটা একপাক ঘুরে আসবেন। সেজন্য এবার তৈরি হতে লাগলেন। প্রথম যাত্রা ব্যর্থ হল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে। অনেকটা পথ অতিক্রম করেও তাঁকে ফিরে আসতে হল। তবু হাল ছেড়ে দেবার মেয়ে নন এমিলিয়া। উদ্যোগী হলেন বিশ্বপরিক্রমার জন্য।

ফ্লোরিডার মিয়ামি শহর থেকে ১৯৩৭-এর ১লা জুন, এমিলিয়ার যাত্রা শুরু হল। সঙ্গে নিলেন এবারও একজন ন্যাভিগেটার-নাম তাঁর ফ্রেড পুনাম। ফ্লোরিডা থেকে তাঁরা চললেন দক্ষিণ দিকে। এলেন পুয়োতোরিকোর শহর-সান জুয়ানে। সেখানে অবতরণ না করে ডাচ গায়েনা হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে চলে এলেন।

পথ চলার তবু বিরাম নেই। সেখান থেকে সোজা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এমিলিয়া হাজির হলেন আফ্রিকা মহাদেশে। সেখান থেকে লোহিত সাগর আর আরব সাগরের উপকূল ঘেঁষে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হলেন।

চোখে যাঁর বিশ্বপরিক্রমার স্বপ্ন তিনি কি কোথাও থামতে পারেন? ভারতবর্ষ থেকে এমিলিয়া চললেন ব্রহ্মদেশের দিকে। রেঙ্গুন শহরে এসে পৌঁছলেন। তবু শেষ হয় নি তাঁর পরিক্রমা। রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে যবদ্বীপ, যবদ্বীপ থেকে একেবারে অনেক দূর দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট-ডারুইন শহরে গিয়ে নামলেন। সেখান থেকে গেলেন নিউগিনি দ্বীপের লে শহরে।

ন্যাভিগেটার ফ্রেড পুনাম হিসাব করে দেখলেন, ঐ পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে মোটমাট বাইশ হাজার মাইল উড়ে এসেছেন এমিলিয়া। ফ্রেড পুনাম বললেন, —এবার বাড়ি ফিরে চলুন।

এমিলিয়াও ভাবলেন, হ্যাঁ, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। দিগন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ক্ষুদ্র এক বিন্দুর মত একটুখানি দ্বীপ-হাওয়ার্ড আইল্যান্ড। ঐ দ্বীপটির ওপর চোখ রেখে এমিলিয়া রওনা হলেন লে শহর থেকে। তারিখটা ছিল ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই।

এটাই হল এমিলিয়ার শেষ যাত্রা। পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন বিশ্বের প্রথম মহিলা বৈমানিকের বিশ্বপরিক্রমার দিকে। নানা দেশের খবরের কাগজে এই ব্যাপার নিয়ে প্রতিদিনই নানারকম তথ্য ছাপা হচ্ছিল।

'ইটাস্কা' নামে একটি আমেরিকান জাহাজ হাওল্যান্ড দ্বীপের কাছে এমিলিয়ার বিমান আসে কিনা, গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করছিল।

সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন এমিলিয়ার বিমান থেকে একটা অস্পষ্ট বেতার-বার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বেতার-বার্তার মর্ম কিছুই বুঝতে পারেন নি। তবে অনুমান করতে পেরেছিলেন বিমানটি কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের বিপদ তা জানতে পারেন নি।

সেই বিমানটি কোথায়, কোনদিকে, কতদূরে আছে তাও ধারণা করার কোন উপায় ছিল না।

ইটাস্কা এবং এমিলিয়ার বিমানের বেতারযন্ত্রে শব্দপ্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকাতেই এরূপ দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার ঘটল। এমন একটি মহাপ্রাণ হয়তো বিসর্জিত হল মহাসমুদ্রে অথবা কোন নির্জন অরণ্য পর্বতে।

তবু অনুসন্ধান চলতে লাগল। শুধু ইটাস্কা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জাহাজ এবং বিমানগুলিও এমিলিয়ার সন্ধানে দিনরাত সমুদ্রের বুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে ফেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ। সাতদিন তন্নতন্ন করে খোঁজার পর নিরাশ হয়ে ফিরে গেল সবাই।

কোথায় হারিয়ে গেছেন বিশ্বের এক দুঃসাহসী মেয়ে, কে জানে।

অনেককাল পরে জর্জ পামার পুটনাস প্রকাশ করেছিলেন এমিলিয়ার লেখা 'The Last Flight' নামে বইটি। ছোট ছোট চিঠির টুকরো সংকলিত হয়েছিল সেই বইটিতে। ভ্রাম্যমান অবস্থায় এমিলিয়া সেই চিঠিগুলি পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে।

'The fun of flight' নামেও একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল এমিলিয়ার নানা কাগজ পত্রের মধ্যে, সেটিও জর্জ পামার প্রকাশ করেছিলেন। সেই বইটি পড়ে ছোটরা এবং [illegible] করে কিশোররা খুবই মজা পাবে।

এক ঐতিহাসিক হত্যার বিচিত্র অপরাধী

'আওয়ার আমেরিকান কাজিন' নাটক অভিনয় চলছে ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে।

দর্শকে গমগম করছে সারা হল ঘরটি। মেজর র‍্যাথবোন বিশেষ সংরক্ষিত স্থানে সামরিক কায়দায় ঘোরাফেরা করছেন। এসেছেন অনেক সামরিক কর্মচারী।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কন আজ বিশিষ্টতম দর্শক। তাই এত আয়োজন—এত ঘটা। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একটি সংরক্ষিত বক্সে বসে লিঙ্কন অভিনয় দেখছেন।

অভিনয় জমে উঠেছে। হঠাৎ গুম্ গুম্ শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সমস্ত দর্শক।

দেখা গেল উসকো-খুসকো চুল মাথায় একটি যুবক প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে হাজির হয়েছে প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কনের আসনের সামনে।

হাতে রিভলবার। চোখের নিমেষে রিভলবারের মুখ থেকে গুলী বেরিয়ে এল। লুটিয়ে পড়ল লিঙ্কনের আহত দেহ।

মেজর র‍্যাথবোন আততায়ীকে ধরবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু আততায়ীর অপর হাতের উদ্যত ছুরিকা তাঁকে আহত করল।

দুঃসাহসী যুবক বক্সের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল নিচে। লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পায়ের একটা হাড় ভেঙে গেল। তবু উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলে উঠল— Sic semper tyrannies ভার্জেনিয়ার সঙ্কল্পবাক্য। তারপর মঞ্চে উঠে দৃশ্যপটগুলির পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

রব উঠল—ধর্ ধর্ পালাল।

দেখতে দেখতে পুলিসদল ঘিরে ফেলল রঙ্গালয়ের চারদিক। কিন্তু তার আগেই রঙ্গালয়ের পেছনের দরজায় যে ঘোড়াটি দাঁড়িয়েছিল, তাতে চেপে চোখের নিমেষে আততায়ী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫ সাল। বন্ধ হয়ে গেল 'আওয়ার আমেরিকান কাজিন' অভিনয়। আঁধার যবনিকা নেমে এল মঞ্চের ওপর।

হই চই চিৎকার—তাও কিছুক্ষণের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন তখন অচৈতন্য। তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল থিয়েটার হলের কাছেই একটি বাড়িতে। সেখানেই পরদিন সকালে লিঙ্কন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

অনেকেই চিনতে পেরেছিল আততায়ীকে। তরুণ উদীয়মান অভিনেতা জন উইলকি বুথ। শুধু অভিনেতা নয়, বুথ ভাল খেলোয়াড়ও বটে।

পুলিস ছুটল দিগ্বিদিকে। আততায়ীকে ঘটনাস্থলে ধরা যায়নি। ডিটেকটিভ বিভাগের লোকেরাও ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

দু'দিন তিনদিন পার হয়ে গেল—তবু আততায়ী ধরা পড়ল না। পুলিসের মনে নৈরাশ্য—ডিটেকটিভদের চোখে বিস্ময়। আশ্চর্য! কোথায় পালাল অভিনেতা বুথ!

পুলিসের দল জটলা দেখলেই এগিয়ে যায়। গুপ্তচরেরা ওত পেতে থাকে ঘরের আনাচ-কানাচে।

ধরপাকড় হতে লাগল বেপরোয়া ভাবে। যেন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হল। মানুষের মনে গভীর আতঙ্ক। পুলিস দেখলেই সবাই চুপ করে যায়। অচেনা লোক দেখলে চমকে ওঠে। ১৪ই এপ্রিলের কোন কথাই আর নয়। ১৪ই এপ্রিল চুপ।

তবু অনেক কথা এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ষড়যন্ত্রকারীরা লিঙ্কন ছাড়াও আরও অনেকের মৃত্যু কামনা করেছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট এনড্রু জনসনকেও হত্যার করার কথা ছিল। তা ছাড়া অন্যান্য কয়েকজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর জীবনহানির ষড়যন্ত্র হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানে একই দিনে অনেকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৪ই এপ্রিল।

কিন্তু তাঁরা বেঁচে গেলেন। ধরা পড়ল কয়েকজন আততায়ী। অস্থির মস্তিষ্ক এক কিশোরকে এবং একটি মেয়েকে ফাঁসি দেওয়া হল। কিন্তু লিঙ্কনের হত্যাকারী বুথ! তাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

নিত্য নূতন গুজব, নিত্য নূতন আতঙ্কে ভরে উঠতে লাগল চারদিক। অনেকে পুলিসের অক্ষমতার প্রতিও বিদ্রূপ করতে লাগল। অপদার্থ পুলিস! নিষ্কর্মা পুলিস!

পুলিসও বিব্রত হল কম নয়। পুলিসের বড় কর্তারাও অপ্রস্তুত!

কেটে গেল দশ বারোটা দিন। সবাই ভাবল হত্যাকারীকে ধরা আর পুলিসের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ২১শে এপ্রিল সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল আচমকা এক সংবাদে।

লিঙ্কনের হত্যাকারী বুথ নিহত। সৈনিকদের তাড়া খেয়ে বুথ এক খামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাকে খুঁজে বের করতে না পেরে সৈনিকরা আগুন ধরিয়ে দেয় সেই খামার-বাড়িতে। তখন বুথ ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে সৈনিকরা তাকে গুলী করে হত্যা করে।

এমন মুখরোচক সংবাদে লোকে বিস্মিত হল বটে—কিন্তু অনেকের মনে রয়ে গেল সন্দেহ। বুথের কোন ছবি কেন কোন কাগজে ছাপা হল না?

মানুষের মনে কোন কৌতূহলের অবকাশ যাতে না থাকে সেজন্যই বুঝি পুলিসের পক্ষ থেকে সংবাদ জানানো হল—বুথের মৃতদেহ যথারীতি সমাধিস্থ করা হয়েছে।

চুপ হয়ে গেল ১৪ই এপ্রিল। কিন্তু সত্যই চুপ হল কি?

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে যে নাটকের যবনিকা পড়েছিল—সে নাটকের যবনিকা উঠল প্রায় আটত্রিশ বছর পরে। ১৯০৩ সালের ১৩ই জানুয়ারি।

সংবাদপত্রে একটি খবর প্রকাশিত হল : জন সেণ্ট হেলেন নামে এক ধর্মযাজক আত্মহত্যা করেছেন।

ধর্মযাজকের আত্মহত্যা! সংবাদটির ভিতর নূতনত্ব আছে বটে। এবং নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

কিন্তু আরও আশ্চর্য সংবাদ! মৃত্যুর পূর্বে নাকি ধর্মযাজক করে গেছেন এক চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি! ...'বিবেকের তাড়নায় আমি জর্জরিত...বহুকাল ধরে অশান্ত হৃদয়কে বহন করে নিয়ে চলেছি...আমি ক্লান্ত...আমি অনুতপ্ত। তাই এই জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিলাম। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে আমিই হত্যা করেছিলাম। আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'

ডিটেকটিভ কাহিনীও বুঝি এর চেয়ে রোমাঞ্চকর নয়। এতকাল লোকে জানত লিঙ্কনের হত্যাকারী একজন অভিনেতা। আর বহুকাল আগেই সে নিহত। কিন্তু এই ধর্মযাজক সেণ্ট হেলেন আবার কেমন করে লিঙ্কনের হত্যাকারী হলেন?

সেণ্ট হেলেন চিঠির শেষ ছত্রে সেই ভ্রান্তির নিরসন করেছেন : 'আমিই জন উইলকি বুথ।'

মানুষের মনে এবার কৌতূহলের আলোড়ন জাগল। ১৮৬৫ সালের এপ্রিলে যে উইলকি বুথকে সৈনিকেরা গুলি করে হত্যা করেছিল, সে তবে কে?

সেই সংবাদটি কি তাহলে মিথ্যা ছিল? পুলিস তাদের অক্ষমতা ঢাকবার জন্যই কি করেছিল সেই কাল্পনিক কাহিনী রচনা? জন সেণ্ট হেলেন সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য জনসাধারণ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের এক পল্লীতে টেনিসির অবসরপ্রাপ্ত এটর্নি জেনারেল মিঃ ফিনিস বেটস-এর বাগান-বাড়ি। সেখানেই কুটির বেঁধে বাস করতেন ধর্মযাজক সেণ্ট হেলেন। মিঃ-ফিনিস বেটসই সেই আশ্রমের খরচ চালাতেন।

নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন সেন্ট হেলেন। চলমান সভ্য জগৎ থেকে তাঁর জগৎ ছিল বিচ্ছিন্ন। দরিদ্রের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য, অসহায় আতুর ও অসুস্থদের সেবা, অশিক্ষিতদের শিক্ষাদান এই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত।

চিত্রশিল্পীও ছিলেন সেন্ট হেলেন। নীরবে বসে বসে ছবি আঁকতেন। কারুর সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। তবু বহু গুণগ্রাহী লোকের সমাগম ঘটত সেই আশ্রমে। সকলেই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত।

সেন্ট হেলেনের আত্মহত্যার সংবাদ যখন ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক আসতে লাগল সেই পল্লীর আশ্রমে। কেউ এল তাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, কেউ এল কৌতূহলী হয়ে। বুথকে যাঁরা জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন—সেই লোকও এলেন কিছু কিছু। সেন্ট হেলেনের মৃতদেহ দেখে তাঁদের অনেকে বললেন—হ্যাঁ, বুথের চেহারা অনেকটা এরকমই ছিল বটে। তবে এতদিনে চেহারার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—না, এ বুথের চেহারা নয়।

এটর্নি জেনারেল মিঃ ফিনিস কিন্তু এবিষয়ে নীরব রইলেন। তিনি বললেন—পরোপকারী সাধু ব্যক্তি হিসাবেই আমি সেন্ট হেলেনকে জানতাম। তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল আমার কাছে রহস্যাবৃত। মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত রহস্য প্রকাশ করে একটি চিঠি আমার কাছে লিখে রেখে গেছেন সেন্ট হেলেন।

ক্রমশঃ কাগজওয়ালাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল রহস্যময় ধর্ম যাজকের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে। জন সেন্ট হেলেনের মৃতদেহ সমাধিস্থ করবার আগেই তার বিস্তারিত সংবাদ আগে কে প্রকাশ করবে, ছবি আগে কে ছাপবে—তা নিয়ে পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। সংবাদদাতা আর ফটোগ্রাফারদের পড়ে গেল হুড়োহুড়ি।

এটর্নি জেনারেলের কূটবুদ্ধি এবার মগজে চাড়া দিয়ে উঠল। তিনি তখন ছবি আর সংবাদের জন্য দর হাঁকতে লাগলেন। তাতেই রাজী হল কাগজওয়ালারা। তারপর মিঃ ফিনিস ধীরে ধীরে দর চড়াতে লাগলেন। তাতেও কাগজওয়ালারা পিছিয়ে গেল না।

নতুন করে আবার এক বুদ্ধি বের করলেন এটর্নি জেনারেল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুথের দেহটাকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। তাতে ব্যয় হল অনেক। কিন্তু ভবিষ্যৎ আয়ের পথ হল সুপ্রশস্ত। বহিরের থেকে যে সব দর্শক আসতে লাগল তাদের জন্য দর্শনী ধার্য করলেন।

এক কার্নিভাল কোম্পানি এল উপযাচক হয়ে। লভ্যাংশের ব্যবস্থায় রাজী করিয়ে তারা বুথের দেহটি নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করল। বেশ মোটামুটি অর্থাগম হতে লাগল তাতে।

বুথের মৃতদেহ কার্নিভাল পার্টির সঙ্গে ঘুরতে লাগল। ভিড় বাড়তে লাগল, পয়সাও রোজগার হতে লাগল। পুলিস কিন্তু এ ব্যাপারে মাথা ঘামাল না। আইনত তখন করারও কিছু ছিল না। বরং ব্যাপারটি তারা উপেক্ষার চোখেই দেখল। কারণ নিজেরাই প্রায় চল্লিশ বছর আগে রায় দিয়েছিল—বুথ সৈনিকদের হাতে নিহত হয়েছে।

এরপর একদিন হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেলেন মিঃ বেটস। তখন তাঁর স্ত্রী মিসেস বেটস হলেন সেই ঐতিহাসিক মৃতদেহের মালিক। কিন্তু মিসেস বেটস বেশিদিন ওটাকে নিজের কাছে রাখলেন না। নানা বিপদ আপদ ঘটতে লাগল তাঁর সংসারে—তাই বিক্রি করে দিলেন অন্য এক কার্নিভাল পার্টির কাছে।

কয়েকটি হাত ঘুরে মেক্সিকোর জোসেফ বি হারকিনের হাতে এল সেই মৃতদেহ। মিঃ হারকিন হলেন একজন উল্কী-শিল্পী এবং বিখ্যাত প্রেততত্ত্ববিদ। মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারতেন মিঃ হারকিন। তিনি নাকি বুথের আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনেছিলেন যে, ওটাই আসল মৃতদেহ। তাই বুঝি মোটা টাকার বিনিময়ে বুথের দেহটি হস্তগত করেছিলেন ভূতপূর্ব মালিকের কাছ থেকে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশন থেকেই ঐ মৃতদেহটি দেখিয়ে হারকিন এক মাসে রোজগার করেছিলেন প্রায় এক লক্ষ টাকা। এর পরের কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ আর পাওয়া যায়নি।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে হত্যা করে বুথের দেহ লাভ করেছে ঐতিহাসিক খ্যাতি। এটা তার ঐতিহাসিক প্রায়শ্চিত্তও বটে। আজও সে হয়ে আছে প্রত্নতাত্ত্বিকের এক গবেষণার বস্তু।

চিরকালই হয়ত বুথের কাহিনী রহস্যাবৃত থাকবে।

আব্রাহাম লিঙ্কনকে গুলী করে বুথ যে থিয়েটার হল থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কেউ তাকে ধরতে পারেনি। ঘোড়ায় চড়ে সে ছুটে চলে গিয়েছিল ওয়াশিংটন থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি গ্রামে।

সেখানে বাস করতেন স্যামুয়েল মাড নামে এক ডাক্তার। তিনি রাত্রিবেলা রোগী দেখে বাড়ি ফিরেছেন। ডাক্তারের স্ত্রী সদর দরজা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময় বুথ ঘোড়ায় চড়ে সেখানে গিয়ে হাজির হল। বলল—ডাক্তারবাবুকে একটু তাড়াতাড়ি ডেকে দিন। আমার পায়ে ভয়ানক আঘাত লেগেছে।

ডাক্তারের স্ত্রী ভিতরে গিয়ে খবর দিলেন—রোগী এসেছে।

ডাক্তার এসে চেম্বারে ঢুকলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কনের হত্যার সংবাদ তখনও কিন্তু সেই গ্রামে এসে পৌঁছোয় নি।

ডাক্তার বুথকে পরীক্ষা করে দেখে বললেন—মনে হয় তোমার ডান পা মুচকে গিয়েছে। ব্যাণ্ডেজ করতে হবে। জুতোটা খুলে ফেল।

কিন্তু জুতো খুলতে গেলেই পায়ে ভয়ানক লাগে। তাই সেটা খোলা গেল না। ডাক্তার স্যামুয়েল ছুরি দিয়ে ডান পায়ের জুতো কেটে খুলে ফেললেন। জুতোটা ঘরের এক কোণে পড়ে রইল। ডাক্তার রোগীর পা ব্যাণ্ডেজ করতে লাগলেন।

ডাক্তার স্যামুয়েল সেই অঞ্চলের খুবই পরিচিত ব্যক্তি, তা ছাড়া তিনি খুবই হৃদয়বান। ব্যাণ্ডেজ করতে করতে বুথকে বললেন—মনে হয় তোমার পায়ের চোটটা খুব বেশি। হয়ত হাড় ভেঙ্গে গেছে। এই পা নিয়ে তুমি যাবে কেমন করে? তার চেয়ে আমার এখানে বিশ্রাম কর, পা সারলে যেও।

বুথ বলল—না ডাক্তারবাবু, আপনার এখানে থাকবার কোন উপায় নেই। আমাকে যেতেই হবে। না হলে মহা বিপদে পড়ব। আপনি পাটা এমন করে বেঁধে দিন যাতে অন্ততঃ ঘোড়ায় চড়ে আমি চলে যেতে পারি।

ডাক্তার খুবই যত্ন করে বুথের পাটা বেঁধে দিলেন। তারপর ডাক্তারের কাঁধে ভর দিয়ে বুথ বাড়ির বাইরে এল। তার ঘোড়া বাড়ির গেটে বাঁধা ছিল। ডাক্তারের সাহায্যে সে ঘোড়ার উপর উঠে বসল।

বুথ যখন যাবার উদ্যোগ করছে, ডাক্তার স্যামুয়েল কৌতূহলের বশে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে থাকলে মহা বিপদ হবে কেন বলছিলে?

ডাক্তারের কৌতূহল না মিটিয়ে বুথ শুধু জবাব দিল—বিপদের কারণ আপনি শীঘ্র জানতে পারবেন। এই বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

চিন্তিত মনে ডাক্তার সদর বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে এলেন।

পরদিন তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। হঠাৎ ডাক্তার স্যামুয়েলের বাড়ির সদরে সজোরে কড়া নাড়া ও দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। গুরুতর কোন রোগী আছে ভেবে ডাক্তারের স্ত্রী মিসেস স্যামুয়েল দরজা খুলে দেখেন একদল পুলিসের লোক তাঁদের বাড়ি ঘেরাও করেছে।

খোলা দরজার সামনে মিসেস স্যামুয়েলকে দেখে পুলিসের ইন্সপেক্টর বললেন—আমি আপনাদের বাড়ি তল্লাস করতে এসেছি।

বিস্মিত হয়ে মিসেস স্যামুয়েল বললেন—কেন?

ইন্সপেক্টর রূঢ় স্বরে বললেন—জবাবদিহি পরে করব। এখন চলুন। এই বলে তিনি জোর করে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন।

তল্লাস করতে করতে একটা ঘরে বুথের জুতোটি পাওয়া গেল। ইন্সপেক্টর তাঁর নিকট লিখিত বর্ণনার সঙ্গে জুতোটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বুঝতে পারলেন, হাঁ, এটা বুথের জুতোই বটে।

বুট জুতোটি ডাক্তারকে দেখিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন—এই জুতো এখানে এল কি করে?

ডাক্তার জবাব দিলেন—পা ভাঙ্গা অবস্থায় লোকটি আমার বাড়িতে এসেছিল। আমিই তার পা বেঁধে দিয়েছি। তারপর সে চলে গেছে।

ইন্সপেক্টরের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি ডাক্তারকে বললেন—আপনি তার পা বেঁধে তাকে পালাতে সাহায্য করেছেন।

ডাক্তার অজানা বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এ কথার অর্থ?

ইন্সপেক্টর মনে করলেন, ডাক্তার সব কিছু জেনেও না জানার ভান করছেন। তাই বললেন—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লিঙ্কনের হত্যাকারীকে পালাবার সাহায্য করায় আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

একথা শুনে হতভম্ব হয়ে ডাক্তার আমতা আমতা করে বললেন—লিঙ্কন নিহত! আমি জানি না...জানি না। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ, বিশ্বাস করুন, আমি এসব ঘটনা কিছুই জানতাম না।

ডাক্তারের হাবভাব দেখে ইন্সপেক্টরের মনে সহানুভূতি জাগল। তিনি বললেন—আমি নিরুপায়। আমাকে কর্তব্য পালন করতে হবে। আমার সঙ্গে হাজতে যাওয়ার জন্য তৈরী হোন।

ডাক্তারের স্ত্রী মিসেস স্যামুয়েল কাছেই ছিলেন, সব কথা শুনলেন। তাঁর স্বামী যে না জেনে এক ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছেন, বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। ইন্সপেক্টরকে কাকুতি মিনতি করে বললেন—আমি জানি, আমার স্বামীর কোন দোষ নেই; দয়া করে তাঁকে গ্রেপ্তার করবেন না।

কোন জবাব না দিয়ে ইন্সপেক্টর দাঁড়িয়ে থাকেন। ডাক্তারের বুঝতে বাকি থাকে না তাঁকে থানায় যেতেই হবে। তিনি যাবার জন্য তৈরী হতে থাকেন।

ইন্সপেক্টরও ব্যস্ত হয়ে বললেন—চলুন।

স্ত্রী কাছে বিদায় নিয়ে ডাক্তার বাড়ির বাইরে এলেন। সেখানে পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যে ডাক্তারের বিচার শুরু হল। ডাক্তারের কোন ওজর

আপত্তিই আদালত মেনে নিল না। বিচারে ডাক্তার দোষী প্রমাণিত হলেন। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল।

যে সব কয়েদীদের এরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়া হত তাদের ড্রাইট্রটুগা নামে আমেরিকার এক দ্বীপে পাঠান হত। অতি ভয়ঙ্কর সেই দ্বীপ। তার নাম শুনেও লোকের বুক কাঁপত। সেখানে বন্দীদের রাখা হত খুবই যন্ত্রণার মধ্যে। তাই সে দ্বীপের আর একটি নাম ছিল ডেভিল আইল্যাণ্ড।

হাতে পায়ে শেকল বেঁধে জাহাজে করে ডাক্তার স্যামুয়েলকে ডেভিল আইল্যাণ্ডে আনা হল। দ্বীপের সরকারী কর্তৃপক্ষ ডাক্তারকে দেখে ও তাঁর পরিচয় পেয়ে মন্তব্য করলেন—ডাক্তার বলে বিশেষ কিছু সদয় ব্যবহারের আশা করো না। যারা তোমার মতো হীন চক্রান্ত করতে পারে তারা ঘৃণার পাত্র। উচ্চপদস্থ অফিসার প্রহরীকে আদেশ দিলেন—এই কয়েদীকে খুব ভারী আর কঠিন কাজের ভার দেবে। কোন ব্যতিক্রম দেখলে কষে চাবুক লাগাবে।

অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! গ্রামের মানী ডাক্তার বিনা অপরাধে আজ দোষী। শুধু কি তাই? কি নির্দয় ব্যবহার তিনি পাচ্ছেন।

প্রহরী অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে ডাক্তারকে পাথর কাটার কাজে লাগিয়ে দিল। বয়স হয়েছে তাঁর। এ কাজ করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর। তবু সাধ্যমত তিনি কাজ করে যান। তা সত্ত্বেও ছুঁতোনাতায় প্রহরীর নির্দয় বেত্রাঘাতের হাত থেকে তিনি রেহাই পান না।

চাবুকের আঘাতে ডাক্তার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জ্ঞান হারিয়ে উত্তপ্ত মাঠের উপর শুয়ে পড়েন। অন্যান্য কয়েদীদের মনে দুঃখ হয়। কিন্তু প্রহরীর ভয়ে তারা কেউ ডাক্তারকে শুশ্রূষা করতে এগিয়ে আসে না। কেউ এক ফোঁটা জল এনে ডাক্তারের মুখে দেয় না। বোধহয় বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করার ফলে মানুষের মনুষ্যত্ব-বোধ সে দ্বীপ থেকে বিদায় নিয়েছে।

ক্রমে ক্রমে ডাক্তারের জ্ঞান ফিরে আসে। চাবুকের আঘাতে সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে। তবু অবশ হাতে তাঁকে হাতুড়ী তুলতে হয়। কাজের জন্য নির্ধারিত সময় যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তাঁকে কাজ করতেই হবে। কোন অজুহাত চলবে না।

একদিন এমন ভাবেই নির্যাতিত হয়ে ডাক্তার স্যামুয়েল কাজ করে চলেছেন। হঠাৎ একজন প্রহরীকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসতে দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে কাছে এসে আর এক প্রহরীকে সে বলল—সর্বনাশ, জেলখানায় ইয়োলো ফিভার, দেখা দিয়েছে।

—ইয়োলো ফিভার?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমাদের জেলখানার ডাক্তারবাবু এইমাত্র মারা গেলেন। অনেক পাহারাওয়ালাদেরও ঐ রোগে ধরেছে।

ইয়োলো ফিভার ম্যালেরিয়ার মত একপ্রকার রোগ। কিন্তু আরও মারাত্মক। তখন ইয়োলো ফিভারের প্রতিষেধক কোন ওষুধ বের হয়নি। এই রোগের নাম শুনলে আমেরিকাবাসীর তখন আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে যেত। যম ও ইয়োলো ফিভার প্রায় এক বলেই তারা ভাবত।

ডাক্তার স্যামুয়েলের কানে একথা যেতেই তিনি পাশের কয়েদীকে প্রশ্ন করলেন—কি হয়েছে?

কয়েদী বলল—খুব মজা হয়েছে। পাহারাওয়ালাদের হয়েছে ইয়োলো ফিভার। আমাদের আর পাহারা দেবে কে? পালাবার এই তো মওকা। আরও মজার কথা, জেলের ডাক্তারও মারা গেল।

ডাক্তার স্যামুয়েল কি যেন ভাবতে লাগলেন। হাতের হাতুড়ী থেমে গেল।

পাশের কয়েদীটি বলল—কি ভাই, পালাবার মতলব আঁটছ নাকি?

ডাক্তার সে কথার জবাব না দিয়ে প্রহরীকে ডেকে বললেন—আমি তোমাদের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

পাশের কয়েদীটি ভাবতে লাগল—লোকটা পাগল না আর কিছু?

কারাগারের কর্তা চিন্তিত মনে অফিস ঘরে বসে আছেন। ইয়োলো ফিভারের আর্বিভাবে তাঁর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। এমন সময় প্রহরীর সঙ্গে ডাক্তার স্যামুয়েল এসে ঘরে ঢুকলেন।

অফিসার জিজ্ঞাসু নেত্রে ডাক্তার স্যামুয়েলের দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

ডাক্তার বললেন—শুনলাম ইয়োলো ফিভারে জেলের বহুলোক আক্রান্ত হয়েছে। আমি ডাক্তার। আমি তাদের চিকিৎসা করব। অনুমতি দিন।

অফিসার বললেন—সে কি করে হয়? তুমি কয়েদী। কারাগারে চিকিৎসা করলে তোমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। সে আইন আমাদের নেই।

ডাক্তার ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—চিকিৎসার অভাবে এখানকার লোকগুলিকে মেরে ফেলা উচিত, না কিছুদিনের জন্য আইন মুলতুবি রেখে তাদের প্রাণ বাঁচানো উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তর অফিসার দিতে পারলেন না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে তিনি ডাক্তারকে চিকিৎসা করার অনুমতি দিলেন।

ডাক্তার প্রহরীদের সাহায্যে রোগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। কয়েদী ও প্রহরী যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে সুস্থ লোকদের আলাদাভাবে রাখলেন। ডাক্তার স্যামুয়েল নিজের আহার ও বিশ্রামের কথা ভুলে গেলেন। দিনরাত করতে লাগলেন অক্লান্ত পরিশ্রম। এইভাবে ঐকান্তিক চেষ্টায় রোগ আয়ত্তে এল। মড়কের ভয় দূর হল। কারাগারের কর্মচারী, প্রহরী ও কয়েদীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

কেটে গেল মস্ত বড় বিপদ।

ডাক্তার স্যামুয়েলের নিঃস্বার্থ সেবা ও চিকিৎসায় মুগ্ধ হয়ে জেলের বড়কর্তা তাঁর প্রশংসা করে আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের কাছে এক পত্র পাঠালেন।

এদিকে অমানুষিক পরিশ্রমে ডাক্তার স্যামুয়েলের শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়তে লাগল। রোগ দূর হয়েছে। কিন্তু তাঁর তো ছুটি নেই। আবার তাঁকে ফিরে যেতে হবে সেই পাথর ভাঙ্গার কাজে। কাজে ত্রুটি হলে আবার তাঁর পিঠে পড়বে চাবুক।

ডাক্তার স্যামুয়েল বিষণ্ণ মনে ভাবতে থাকেন—অনেকদিন বাড়ির খবর তিনি জানেন না। তাঁর স্ত্রী কি এখনও বেঁচে আছেন? এখনও তিনি কি আশা করছেন, আবার দেখা হবে তাঁর হতভাগ্য স্বামীর সঙ্গে?

হায়রে, জীবনের একি পরিহাস!

একদিন ডাক্তার স্যামুয়েল ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে অফিসারের সামনে এসে বললেন—আর পারি না স্যার। ক'দিনের জন্য আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন।

অফিসার মৃদু হেসে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থাই হচ্ছে। তারপর ফাইল খুলে একটা চিঠি ডাক্তারের হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন।

সেটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এনড্রু জনসনের স্বাক্ষরিত চিঠি। তাতে লেখা—ডাক্তার স্যামুয়েলকে তাঁর প্রশংসনীয় কাজের জন্য বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হল।



আইফেল টাওয়ারের সেই দুঃসাহসী তরুণটি

বীরু চট্টোপাধ্যায়

ঘটনাটা ঘটলো প্যারিস-এ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে রোববার তারিখে বৃষ্টিভেজা বিকেলে পৃথিবীর অন্যতম 'আশ্চর্য' বস্তু আইফেল টাওয়ারের পাদদেশে ছয় সাত হাজার লোক জমায়েত হয়ে সকৌতূহলে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা হল, সেদিনটি ছিল আইফেল টাওয়ার-এর ৭৫তম জন্মদিবস। এই দিবসটি উদ্‌যাপিত হতে চলেছে, একটি অভিনব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ছয়জন প্রখ্যাত পেশাদার আল্পস্ পর্বতারোহী এই আকাশ-ছোঁয়া ৯৮৪ ফুট উচ্চতার ইস্পাত টাওয়ারের শীর্ষে আরোহণ করবে।

কাঁটায় কাঁটায় ২-৩০ মিঃ দর্শককুল জয়ধ্বনি করে উঠলো। যাত্রা শুরু। পেশাদার পর্বতারোহীরা আইফেল টাওয়ারের গা বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। দড়ি ইত্যাদি থাকলেও এ কাজ বড় সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ। অতএব আরোহীরা কোন ঝুঁকি না নিয়ে অতি সতর্কতা সহকারে ধীর পদে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগলো ৭৬০০ টন ওজনের টাওয়ারে। যাতে আছে ২৫ লক্ষ রিবেট এবং ১৮ হাজার সংখ্যক কড়িবরগা, সবই মজবুত ইস্পাতের।

প্রায় তিনটের সময় তারা গিয়ে উঠল প্রথম পর্যায়ের মঞ্চে অর্থাৎ পয়লা প্ল্যাটফর্মে।

এখানে একটি মুক্তবায়ু রেস্তোরাঁ রয়েছে। ওরা পৌঁছতে সেখানে হইহই চাঞ্চল্য পড়ে গেল। দড়ি বেয়ে দড়ি ধরে যেই পেশাদারেরা উক্ত প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে পৌঁছলো, অমনি কি খদ্দের সাধারণ কি ওয়েটার বয় বেয়ারা

সবাই রেস্তোরাঁ ছেড়ে উঠে এসে রেলিং ধরে উচ্চৈঃস্বরে অভিনন্দিত করলো আরোহীদের। 'ভিভ্ লে আল্‌পিনিস্ট' চিৎকারে চতুর্দিক প্রকম্পিত হতে থাকলো।

নীচে দাঁড়ানো দর্শকরা অবাক্ বিস্ময়ে মাথা উঁচু করে এই আশ্চর্য আরোহণ প্রত্যক্ষ করছিল। এরপর প্রায় দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি দর্শকদের নজর এক জায়গায় আটকে গেল। এবং সেদিকে তাকিয়ে তাদের রক্ত যেন জল হয়ে গেল ভয়ে বিস্ময়ে আতঙ্কে। একজন একলা আরোহী সাপের মত ঘুরে ঘুরে কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য হতে হতে 'টাওয়ার'-এর গা বেয়ে উঠে চলেছে পেশাদার আরোহীদের ২০ গজ পেছন পেছন।

—আরে! ও লোকটা কোত্থেকে এলো? কে একজন চিৎকার করে বলে ওঠে, ও লোকটা কি আত্মহত্যা করবার ফিকিরে আছে নাকি, অ্যাঁ?

নিঃসঙ্গ আরোহী গাছে যেভাবে টিকটিকি গিরগিটি ওঠে তেমনি দু'হাত দু'পায়ে বেয়ে বেয়ে টাওয়ারে উঠে যাচ্ছে। ওর হাতে কোন যন্ত্র নেই, নেই কোন দড়িদড়া। সাধারণ নীল রঙের স্যুট অঙ্গে শোভা পাচ্ছে, পায়ে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জুতো। দেখে অতি সাধারণ একজন লোক মনে হয়।

নীচে দাঁড়ানো বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকরা দেখলো লোকটা ধীর গতিতে উঠছে, উঠে যাচ্ছে ইস্পাতের কড়িবরগার বৃষ্টি পিচ্ছল গা বেয়ে, অনায়াসে, অসম্ভব অকুতোভয়ে।

এই প্রখ্যাত বিস্ময়কর আইফেল টাওয়ার এতাবৎ কোন চ্যালেঞ্জের কাছেই মাথা নোয়ায় নি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অজেয় রয়ে গেছে। তাই প্রায় কিংবদন্তীয় বিস্ময়কে তৈরি করতে এর স্রষ্টা গুস্তেভ আইফেল-এর সময় লেগেছে পাক্কা আড়াই বছর। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে যেদিন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধিত হয় তখন এই টাওয়ার ছিল তদানীন্তন কালে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার।

নিঃসঙ্গ মানুষটা অবিরাম অবিশ্রান্ত ভাবে উঠে উঠে একেবারে পেশাদার আরোহীদের ছুঁই ছুঁই হয়েছে। দূরত্বের জন্য নীচেকার লোকদের কাছে তাকে আর মানুষ বলে মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন একটা মাকড়সা।

লোকটির নাম গিউলা ন্যাগী। হাঙ্গারীয়ান। বয়েস ৩৭ বৎসর। হাঙ্গারী থেকে রাজনৈতিক শরণার্থী হয়ে ফরাসী দেশে আসে। জন্ম বুডাপেস্ট শহরে। সতের বছর বয়সে হাঙ্গারীয়ান আর্মিতে যোগ দেয়, রাশিয়া এসে দেশ দখল করলে রেড আর্মিতে তিন বছর কাজ করতে বাধ্য হয়, পরে এক রাত্রে সীমান্ত পার হয়ে অস্ট্রিয়ায় ঢোকে, পরে জার্মানীতে পদব্রজে। সব শেষে ফরাসী দেশে শরণার্থী হয়।

টাওয়ার-এর ৭৫তম জন্ম দিবসে সে প্যারিসে রাস্তার এক কাফেতে বসে কফির পেয়ালায় অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিচ্ছিল। তখন বেলা ১২-৩০ মিঃ। বৃষ্টি পড়ছিল ঝিরঝির করে। তার সঙ্গী দু'জন বন্ধু আইফেল টাওয়ারে পেশাদারদের আরোহণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল।

কিছুক্ষণ কথাবর্তায় বিরক্তিভাবের একটা আওয়াজ তুলে গিউলা ন্যাগী কফির কাপ ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর খানিকটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে ওঠে, তাহলে ওরা টাওয়ারে উঠছে, কি বল? ছোঃ ঐ সব ড্রেস জুতো দড়িদড়া এসব দেখলে, আমার হাসি পায়। এর চেয়ে ওরা এলিভেটর (লিফ্‌ট)-এ করে উঠলেই পারত। হুঁ, ঠিক আছে, আমি ওদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করে ছাড়ছি।

এই বলে দুই বন্ধুর বিস্মিত দৃষ্টির মাঝখানে সে রাস্তায় নেমে হাত তুলে এক ট্যাক্সিকে থামায়।

ট্যাক্সিতে উঠে চালককে বললে, সাঁজে দ্য মারস্‌-এ চলো।

সাঁজে দ্য মারস হল আইফেল টাওয়ারের সম্মুখবর্তী একটি বৃক্ষশোভিত চতুষ্কোণ পার্ক। এই পার্কে শিশু নিয়ে পরিচারিকারা আসে। মাঝে মাঝে এখানে চরম চাঞ্চল্য জাগে, প্রতি সপ্তাহে টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে কেউ না কেউ আত্মহত্যা করে বা করবার চেষ্টা করে। এই পঁচাত্তর বৎসর সময়ের মধ্যে প্রতি তলায় স্পেশাল গার্ড পাহারায় থাকা সত্ত্বেও ৩৪০ জন নরনারী আত্মাহুতি দিয়েছে টাওয়ার থেকে।

ন্যাগী চেনে 'টাওয়ারকে'। সে তাই সমীহও করে একে। জানে টাওয়ার শীর্ষের কাছাকাছি হল সবচেয়ে ভয়াবহ স্থান আরোহণের পক্ষে। এই জন্যেই চিরকাল নিঃসঙ্গ একলা কোন লোকের পক্ষে শীর্ষে আরোহণ করা সম্ভব হয় নি। নার্ভ ফেল করবেই। এতাবৎকাল তিনজন পুরুষ ও একজন মেয়ে চেষ্টা করেছিল এটা আরোহণ করতে।

মেয়েটি ছিল নর্তকী, নাম বেবি ক্লেয়ার। ভক্তদের জয়ধ্বনির মধ্যে শুরু করে উঠতে। সেটা ছিল ১৯৪৯। জোর করে ওকে নামিয়ে আনে কর্তৃপক্ষ। এরপর জাঁ ডুবই চেষ্টা করে বিফল হয়। ১৯৫২-তে ড্যানিয়েল প্রাগাও অকৃতকার্য হয়। এর পর ১৯৫৪ -তে আলফ্রেড থমাউচ নামক এক জার্মান ট্রাক ড্রাইভার দ্বিতীয় প্লাটফর্ম পেরিয়ে যাবার পর অন্ধকার নামাতে দমকলের লোকেরা ওকে নামিয়ে আনে।

কিন্তু ন্যাগীর কথা আলাদা। ওদের যা ছিল না তা ওর আছে, সেটা হল

আইফেল টাওয়ার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান, দিনের পর দিন সে এতে কাজ করছে। এর প্রতিটি স্থান ওর মুখস্ত। এরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর কারুর ছিল না।

দশ মিনিট বাদে তাই প্যান্টের নীচেটা কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে ন্যাগী সরাসরি উঠতে লেগে গেল 'টাওয়ারে'। তখন বিকেল ৩-৪০ মিনিট। সর্বসাকুল্যে ১৭১৮ টি সিঁড়ির ধাপ আছে আইফেল টাওয়ারে। সিঁড়ি বেয়ে সে প্রথম প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল পেশাদাররা কত দূর উঠেছে।

ওরা বিশ গজ ওপরে। ন্যাগী এবার বাইরে বেরিয়ে দুহাত দুপায়ে আঁকড়ে গিরগিটির মত বেয়ে বেয়ে নিদারুণ বিপজ্জনক আরোহণ কার্য শুরু করলো। প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, বাতাসের কি ঝাপটা। প্রাণপণ শক্তিতে সে আঁকড়ে ধরলো ইস্পাতের কড়িবরগা আর উঁচু উঁচু রিবেটগুলি।

হাওয়ায় প্যান্ট ফুলে উঠছে, কোট ফুলে উঠছে, আছড়ে পড়ছে বুকে। কোন দিকে গ্রাহ্য বা ভ্রূক্ষেপ না করে অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ায় সে অভাবনীয় আরোহণ কার্য চালিয়ে যেতে লাগলো।

অচিরেই সে পেশাদারদের ধরে ফেলে পেছন পেছন উঠতে লাগলো। ক্রমে এক সময় পাশে পাশে চললো। বারেক তেরছা চাউনি হেনে তাচ্ছিল্যভরে পেশাদারদের দেখলো। পরে আরও একটু একস্ট্রা এলেম বাড়িয়ে ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। সযত্নে ওদের দড়িদড়ার ধরা ছোঁয়ার এবং নাগালের বাইরে থেকেই উঠতে থাকলো।

পরম আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে এবার। ফুঃ! দ্যাখ ব্যাটারা মরদ কাকে বলে। এই মনোভাব নিয়ে পেশাদারদের পেছনে ফেলে ন্যাগী বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে চড়াই উঠতে লাগলো।

তৃতীয় প্ল্যাটফর্ম দেখা দিল সহসা। আর কি। এরপর টাওয়ার শীর্ষ আর ৮০ গজ উচ্চতায়। কতক্ষণ আর লাগবে ঐটুকু আরোহণ করতে।

—কেমন, পেশাদার ব্যাটাদের গো-হারান হারিয়ে দিলুম কিনা, ন্যাগী এই স্বগতোক্তি করে, সরবে আত্মতৃপ্তির হাসি হেসে উঠলো।

ঠিক যে মুহূর্তে সে অসীম মনোবল ও অটুট দেহবল নিয়ে তৃতীয় প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছলো, সহসা কানের কাছে একটি কণ্ঠস্বর গর্জে উঠলো ঃ

—এই বেয়াদপ ! খুব হয়েছে, এবার ভেতরে চলে এস এই মুহূর্তেই।

এখানে টাওয়ার ব্যাসে অতি ছোট হয়ে এসেছে। পেছন ফিরে চেয়ে ন্যাগী দেখলো ভেতরে দু'জন পুলিস রিভলবার তাগ করে তৃতীয় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কণ্ঠস্বর তাদেরই একজনের।

ব্যাপারটা এতই আকস্মিক ও বিস্ময়কর যে প্রথম চমকে ন্যাগীর হাতের মুঠি আলগা হয়ে পড়ে যাবার দাখিল হল। কোন মতে সামলে নিল সে অবস্থা। কিন্তু পা ফসকে যাওয়ায় কয়েক মুহূর্ত তাকে দুহাতের ওপর ঝুলে থাকতে হয়েছিল। ফলে দুহাতের চেটো ফেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল।

হাত পা সামলে নিয়ে ন্যাগী হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলো, কেন? কি, ব্যাপার কি?

—ব্যাপার কী? ন্যাকা! টাওয়ারে চড়বার পারমিট আছে তোমার কাছে?

ন্যাগী মাথা নেড়ে জানালে, নেই।

—সেই জন্যেই তো তোমায় গ্রেফতার করলাম।

হাঙ্গেরীয়ান অনুপায় হয়ে ভিজে কড়িবরগার ফাঁক দিয়ে প্রথমে মাথা ও পরে সিক্ত ও কিছুটা কম্পিত দেহ গলিয়ে তৃতীয় প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলো। হায়, আর সামান্য একটু সময় পেলে সে শীর্ষে উঠে কামাল করে দিতে পারত। ইস্ মাত্র ৮০ গজ বাকী ছিল।

পুলিস অফিসারদ্বয় ওকে নিয়ে এলিভেটরে গেল (লিফট-এ) এবং কোথাও না থেমে একটানা নেমে এল নীচে।

টাওয়ার-গেটে আসতে একটা লোক ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, এই তো সেই লোক।

ভিজে কর্দমাক্ত পোশাকসহ ঝড়ো কাকের মত ন্যাগীকে নিয়ে ওরা অপেক্ষাকৃত একটি পেট্রল-কার-এ উঠলো।

তিক্ত কণ্ঠে ন্যাগী পুলিশ অফিসারদের পানে তাকিয়ে বলে ওঠে, ছি ছি কী সাংঘাতিক ক্ষতি করলেন আপনারা। এতক্ষণে আমি টাওয়ার শীর্ষে উঠে যাবার গৌরব অর্জন করতাম। যাকগে, তবে এটা আপনাদের স্বীকার করতেই হবে যে সর্বাধিক কঠিন স্তরে আমি ঐ পেশাদার পর্বতারোহীদের হারিয়ে দিয়ে ছাড়িয়ে গেছি, এটা কম কৃতিত্ব নয়।

ঘন্টা দুই বাদে পুলিস সেল-এ বসে ন্যাগী শুনতে পেল দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টার অসীম পরিশ্রমে, নানা সরঞ্জাম সাজসজ্জা ও দড়িদড়া রক্ষিত হয়ে আল্পস পর্বতারোহী পেশাদারেরা টাওয়ার শীর্ষে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে।

শীর্ষে তাদের অভিনন্দন জানানো হয় এবং দেশের জনৈকা বিউটি-কুইন তাদের কফি পান করায়।

শুনে ক্ষুব্ধ আক্রোশের কণ্ঠে ন্যাগী বলে ওঠে, কেন, ওদের ২১ বার তোপধ্বনি করে সম্মান জানালেই পারতো, ছোঃ।

যদিও অনুমতি ব্যতিরেকে টাওয়ারে ওঠা নিষিদ্ধ তবু এর বিধি লঙ্ঘনকারীদের জন্য আইনে কোন দণ্ড বিধান নেই, তাই এ পর্যন্ত কেউ দণ্ডিতও হয় নি। অতএব ন্যাগীকেও পুলিস সন্ধ্যের সময় বিনাশর্তে মুক্তি দিয়ে দিল।

পরদিন সারা প্যারিসে সে হিরো বনে গেল।

শুধু ফরাসী দেশ নয়, কদিন ধরে ইতালী, বেলজিয়াম, জার্মানী থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশংসা অভিনন্দনবাহী অজস্র পত্র আসতে লাগলো ওর নামে।

দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সরকারী রেডিও ওর এই দুঃসাহসিক টাওয়ার আরোহণের চাঞ্চল্যকর সংবাদ দিকবিদিকে ছড়িয়ে দিল। 'প্রান্স সইর' নামক সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক তার সমস্ত প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে ওরই সংবাদ ছাপলো। জনৈক ফটোগ্রাফার ওর আরোহণকালীন রোমাঞ্চকর একটি ফটো তুলেছিল, সেটিও বিরাট আকারে ছাপা হল। অতএব নগণ্য অজ্ঞাত এই গীউলা ন্যাগী নামক তরুণ রাতারাতি সারা দেশে প্রখ্যাত হয়ে গেল।

কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই সে প্যারিস ছেড়ে তার কাজের জায়গা ব্রিটেনি-তে চলে গেল ইলেকট্রিক পোল রং করতে।

—তুমি আইফেল টাওয়ার চড়তে গিয়েছিলে কেন? টাকার জন্য?

এর জবাবে সে বলে পয়সার পরোয়া আমি করি না। শুধু দেখাতে চেয়েছি যে টাওয়ারে উঠতে গেলে অতশত ভড়ং আর ফুটুনির প্রয়োজন হয় না। ক্ষমতা থাকলে শুধু হাতেই ওঠা যায়।

—তুমি আরেকবার ট্রাই নেবে নাকি টাওয়ারে ওঠবার?

—উহুঃ, ন্যাগী হেসে জবাব দেয়। এরপর আমার লক্ষ্য হল মার্কিন দেশের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং চড়া। দেখি যদি সুযোগ সুবিধে হয় এ জীবনে ওদেশে যাবার, তাহলে অবশ্যই আকাশ ছোওয়া ঐ অট্টালিকা আমি খালি হাতে আরোহণ করবোই।

বলে ন্যাগী হাতে ব্রাশ ও কোমরের বেল্ট-এ রঙের বালতি নিয়ে বাঁদরের মত অনায়াস ভঙ্গিতে সুউচ্চ ইলেকট্রিক পোল বেয়ে উঠে গেল।

প্রশ্নকর্তা অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো অদ্ভুত খেয়ালী নিদারুণ দৃঢ়মন সম্পন্ন বেপরোয়া মানুষ এই হাঙ্গেরীয়ান শরণার্থীর চড়াই-এ চলমান আকৃতির দিকে।



কোরিয়ার বীর বালক

নিখিল সেন

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল কি সেক্‌ পোক।

কতটুকু বা বয়স। এখনো পুঁচকে ছেলেমানুষ। দু'গাল বেয়ে তার চোখের জল ঝরতে লাগল দরদর ধারায়।

ঘরে লাকড়ি ছিল না। কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল সে বনে। কিন্তু বনে কাঠ কুড়ানও অপরাধ! দেশের শত্রু লি সিউঙ ম্যানের পুলিস তাকে ধরে তাই মেরেছে নিষ্ঠুরের মত।

ভাঙা কুঁড়েটার দাওয়ায় বসে ঠাকুরমা ছটফট করছিলেন নাতির জন্যে। বুড়ী আবার চোখে পায় না দেখতে।

নাতির পায়ের শব্দ শুনে ঠাকুরমা বলে উঠলেন, 'কি দাদা, কাঠ পেলি?'

কি সোক্‌ পোক তখন কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনাটা বললে ঠাকুরমাকে।

বুড়ী ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর চুপি চুপি বলল, 'ছাড়া পেলে শেয়ালগুলো অমন দাঁত খিঁচোয় বই কি! মেরে ফেলতে যখন পারবি নে, ওদের পেছন না নিলেই পারিস!'

'আমি নাই বা পারলাম,' ফোঁস করে উঠল কি সেক্‌ পোক। চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ইল এন-দা মেরে কত সাবাড় করে দিলে।'

ইল এন কি সেক্‌ পোকের বড় ভাই, সে গেরিলা যোদ্ধা। ঘরে থাকে না। মিশমিশে অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে কোনদিন হয়ত বা এল। আপাদমস্তক বর্ষাতিতে তার ঢাকা। পায়ে বুট, গায়ে খাকি সামরিক পোশাক। পিঠে ঝুলান

টমিগান। হাতে থাকে বাঁধাকফি বা শালগম, কোন দিন হয়ত বা পাহাড়ী নদী থেকে ধরা মাছ। ইল এন এসে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে, ঠাকুরমাও ফেটে পড়েন খুশিতে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে ইল এন এসে শোয় তাঁর পাশে 'ক্যানের' মধ্যে, আর বলতে থাকে গেরিলাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা—দেশদ্রোহী লি সিউঙ ম্যানের ফৌজ আর পুলিসের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ান দেশভক্তদের অসীম দুঃসাহসের গল্প।...

কি সেক্ পোক কান খাড়া করে শোনে। শুনতে শুনতে বুক তার গর্বে ফুলে ওঠে, দম আসে বন্ধ হয়ে। দুঃখও হয়। সে যদি দাদাদের মত বড় হোত। প্রতিশোধ নিত সেও পিতৃহত্যার। লি সিউঙ ম্যানের সেপাইরা ঠিক যমদূতের মত এসে বাপকে তার নিয়ে গিয়েছিল ধরে। তারপর এক গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দিয়েছিল। সে প্রায় বছর খানেক হল।

সেদিনকার কথা এখনো তার মনে আছে। চোখের উপর ভেসে ওঠে অদ্ভুত পোশাক-পরা লম্বা সেই লোকটার হিংস্র মুখখানা। ওই তো তার বাবাকে ফাঁসি দিতে হুকুম দিয়েছিল। তাদের কোরীয় ভাষা লোকটা জানে না। গাছতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসির দড়িটা যখন তার বাপের গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল, তখন লোকটা কি যেন সব বললে বিদেশী ভাষায়। দোভাষী তা গাঁয়ের সবাইকে বুঝিয়ে দিলে ; বললে, 'গেরিলাদের যারা সাহায্য করবে, এমনি করে তাদের মরতে হবে।'

বুড়ী ঠাকুরমা তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিলেন। বিদেশী ওই অফিসারটার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে অনুনয় করেছিলেন, এবারকার মত বাবাকে যেন প্রাণে রেহাই দেয়। কিন্তু লোকটা এমন করে পা ছুঁড়লে, ঠাকুরমা ছিটকে পড়লেন দূরে। বিদেশী অফিসারটার হাতে ছিল রূপোমোড়া একটা ছড়ি। ছড়িটা সে ঠাকুমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। সাঁ করে গিয়ে লাগল ঠাকুরমার চোখে। চোখ ফেটে ঠাকুমার ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই থেকে তিনি দেখতে পান না চোখে, অন্ধ হয়ে গেছেন।

বিদেশী সেই অফিসারটার বাজখাঁই গলা এখনও তার কানে লেগে আছে। ওই তো জল্লাদকে হুকুম দিয়েছিল তার বাপকে ফাঁসি দিতে। ছড়ির খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল তার ঠাকুরমাকে।

সে তা ভুলে কি করে? সে কি ভুলবার মত ঘটনা!

একদিন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, গাঁয়ে এমন সময় খবর এল ঃ লি সিউঙ

ম্যানের সৈন্যরা সব যুদ্ধে হেরে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার বীর যোদ্ধারা ওদের তাড়া করেছে দক্ষিণমুখো। কথাটা কি সেক্ পোকও শুনল। সে তখন ছুটে গিয়ে বাপের বাঁশের ছড়িটা নিয়ে এল। ছড়িটাকে সে ভেঙে সমান দু' টুকরো করে নিলে। ঠাকুরমার কাছ থেকে এক টুকরো লাল সিল্কের ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে সে ছোট ছোট দুটি লাল ঝাণ্ডা বানালে।

উত্তর কোরিয়ার গণ-বাহিনীর প্রথম পল্টনকে যখন মার্চ করে আসতে দেখা গেল, কি সেক্ পোক তখন করল কি, সে তাদের কুঁড়ের চালায় উঠে ছোট ছোট সেই লাল ঝাণ্ডা দুখানা দোলাতে লাগল, আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করতে লাগল—'ম্যানসু মুগ্যান কিম্ ইল্ সুঙ্!'* লক্ষ বছর বেঁচে থাক কিম্ ইল সুঙ্ (উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী)।

গণ-বাহিনী এসে পড়ার কিছুদিন পর কি সেক্ পোকের দাদা ইল এন গাঁয়ে ফিরে এল। সে কৃষক-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হল। কৃষকদের মধ্যে সে যখন জমি বিলির তদারক করত, কি সেক্ পোকের ছোট বুকখানা তখন আনন্দে নেচে উঠত। দাদাকে তার গাঁয়ের সবাই কত মান্য করে, ভালবাসে। জমি বিলির ব্যাপারে তার দাদার ন্যায়-বিচারের কত তারিফ করে সবাই।

বুড়া ঠাকুরমা চোখে দেখতে পান না। তবু তিনি আপন মনে বিড়-বিড় করতে থাকেন, 'আমার চোখ নেই রে, তবু দেখতে পাচ্ছি, গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে কি সুখ-শান্তিই না ফিরে এসেছে!'

কিন্তু বেশি দিন এই সুখ-শান্তিতে থাকা গেল না। আবার সাম্রাজ্যবাদী বর্গীরা এসে বাদ সাধল। লি সিউঙ ম্যান এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ওরা লেলিয়ে দিলে উত্তর কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে। সারা দুনিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও করলে : আসল আক্রমণকারী হল উত্তর কোরিয়া। আর ওদের ঠেকাতে বিদেশী যুদ্ধবাজরা উত্তর কোরিয়ায় পাঠাতে লাগল লাখে লাখে সৈন্য-সামন্ত, বোমারু বিমান আর তাদের সেরা নৌ-বহর। তাদের কোপানলে পড়ে কোরিয়ার কত শত গ্রাম-নগর বোমার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত অসহায় শিশু প্রাণ হারাল—কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধরণীর বুক থেকে! চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার!

কি সেকম পোকের গাঁয়েও পিটুনী পুলিস এসে তাঁবু গাড়ল। গ্রামবাসীদের সবাইকে ওরা ধরপাকড় করতে লাগল। এনে জড়ো করতে লাগল পুরানো সেই গাছটার নীচে যার ডালে কি সেক পোকের বাপকে একদিন ওরা ফাঁসি

দিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির। তাদের লক্ষ্য করে ঢেঙা মত একজন অফিসার বলে উঠল, 'কমিউনিস্টদের কে কে তোমরা অভিনন্দন করেছিলে, বল। কই, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

সবাই চুপ। কোনো কথা নেই কারো মুখে। লি সিউঙ ম্যানের এক প্রাক্তন পুলিস তখন এগিয়ে এল। ইতিপূর্বে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসেছে। বিদেশীরা ওই দেশদ্রোহীটাকে মোড়ল করে দিয়েছে গাঁয়ের। ওরই কথামত সেপাইরা গ্রামবাসীদের গুলি করে মারে।

পুঁচকে কি সেক্ পোককেও ওরা পাকড়ে এনেছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে সে কটমট করে তাকাচ্ছিল ওই মোড়লটার দিকে। মোড়লের চোখ গিয়ে পড়ল তার উপর। ইল এন-এর কথাও তার মনে পড়ে গেল। ইল এন তার প্রকাণ্ড বাড়িখানাকে দখল করে তাদের কৃষক-সমিতির সদর দপ্তর বানিয়ে তুলেছিল। জমিগুলো তার দিয়েছিল বাজেয়াপ্ত করে আর জোয়ান জোয়ান তার দশটা বলদ ধরে নিয়ে গিয়েছিল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে।

মোড়ল তা ভোলেনি। কি সেক্ পোকের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রতিহিংসার কুটিল হাসি হাসলে।

'হুজুর, এই ছোঁড়াটার ভাই এখানকার সব কমিউনিস্টদের নেতা।' বলে হাতের ছড়িটা দিয়ে সে কি সেক্ পোককে দেখিয়ে দিলে অফিসারকে। আরও বললে, 'ওই তো প্রথম কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, হুজুর।'

'তাই নাকি?' অফিসারটা তাকাল কি সেক্ পোকের দিকে। তারপর গর্জে উঠল, 'এই ছোঁড়া, এদিকে আয়!'

কি সেক্ পোকের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ভয়ে কচি মুখখানা হয়ে গেল সাদা ফ্যাকাশে। সে একবার ইতস্ততঃ করলে। তারপর দৃঢ়পদে অফিসারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মাথা উঁচু করে।

'লাল ঝাণ্ডা তুই কেমন করে ওড়ালি দেখা তো?' অফিসারটা তাকে শুধালে। মুখে ঠোঁটে তার কুটিল হাসি।

কি সেক্ পোক অমনি দিলে এক ছুট্। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বাড়ি এসে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা লাল ঝাণ্ডা দুটো কুড়িয়ে নিলে। তারপর তা নিয়ে অফিসারটার সামনে এসে হাজির হল। বললে, 'এমনি করে উড়িয়েছিলাম।'...

লাল ঝাণ্ডা দুটো সে মাথার উপর তুলে ধরলে। তারপর ফুসফুস্ ফুলিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ম্যানসু মুগ্যান কিম্ ইল্ সুঙ্!'

ভীড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা আর্তনাদ্ শোনা গেল। বোকা ছোঁড়াটার পরিণাম ভেবে সবাই হায় হায় করে উঠল।

অফিসারটা চাপা ক্রোধে ঠোঁট কামড়ালে ; বললে, 'এ দুটো ছাড়া লাল ঝাণ্ডা আর নেই এ তল্লাটে? আমি এ দুখানার ব্যবস্থা করছি।'

অফিসারটা সৈন্যদের দিকে ফিরে দাঁড়ালে। আদেশ দিলে, 'ছোঁড়াটার হাত দুখানা কটে নাও!'

এটি উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ৪ঠা অক্টোবরের কথা। ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর কোরিয়ার ছুনছুন এলাকায়।

সূর্য তখন মুঠি মুঠি সোনালি রোদ ছড়াচ্ছিল ; বনের গাছপালাগুলো মর্মরিত হচ্ছে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ; পাহাড়ী নদীটি কুল-কুল করে বয়ে চলেছে আপন মনে। আর তারই পাশে গাছের একটা গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা বছর নয়েকের একটা ছোট ছেলে। নিঃসাড় মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার বুকের উপর। কনুই পর্যন্ত হাত দুখানা তার কাটা। চুইয়ে চুইয়ে তখনও রক্ত ঝরছে নীচে—বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দুটি লাল ঝাণ্ডার ঠিক উপরটায়!



মৃত্যুহীন প্রাণ

রাহুল মজুমদার

ওই তো চলেছে ওরা। সূর্যের প্রখর কিরণে বিশাল একখণ্ড হীরের মতো ঝলসাচ্ছে এভারেস্টের শিখর। তার শ্বেতশুভ্র শরীরে দুটো চলন্ত কালো বিন্দু। ধীরে ধীরে উঠছে ওপরের দিকে। শিখর আর সাত-আটশো ফুট দূরেও নয়। খুব বেশি হলে আর এক ঘণ্টা লাগবে ওদের শিখর জয় করতে। আহ্-এতদিন বাদে এভারেস্টের সমস্ত প্রতিরোধের প্রতিকূলতা পরাজিত হবে। ঘড়ির দিকে তাকালো ওডেল—দুটো বাজে। পাঁচটা বাজার আগেই তাহলে ওরা ফিরে আসতে পারবে ষষ্ঠ শিবিরে। এতো রোদ থাকা সত্ত্বেও তাপমাত্র শূন্যের অনেক নিচে; ওডেল তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে আরেক প্রস্থ গরম জামা চাপিয়ে নিলো গায়ে। বাইরে এসে আবার ঘাড় তুলে শিখরের দিকে তাকালো। প্রায় এক সপ্তাহ ২৫,৫০০ ফুট ওপরে এই পঞ্চম শিবিরে অসহ্য ঠাণ্ডা সহ্য করেও এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছে ওডেল। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকতে চায় ও। কিন্তু বিধি বাম, কোত্থেকে একখণ্ড কালো মেঘ এসে আটকে দাঁড়ালো ওর দৃষ্টিপথ। কাটতে লাগলো মিনিটের পর মিনিট। দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা কেটে গেল, মেঘ তো সরলোই না, উল্টে আকাশটা ঢেকে ফেলতে লাগলো দ্রুত। ঐ মেঘের আড়ালে ঘটতে চলেছে পৃথিবীর সবথেকে উত্তেজনাময় ঘটনা; পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট-চো মো লাঙমা-সাগরমাথা হতে চলেছে মানুষের পদানত। যে দুজন এই দুঃসাহসিক প্রায় অচিন্ত্যনীয় অঘটনটি ঘটাতে চলেছে, তারা ছাড়া একমাত্র যে মানুষটা এই উত্তেজনাকর মুহূর্তটার সাক্ষী হতে পারতো, সেই ওডেল অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে লাগলো প্রকৃতির করুণায়। হায়, মেঘ সরলো না। ঘণ্টা দেড়েক

অপেক্ষা করে তাঁবুতে ঢুকলো ওডেল, যোগাযোগ করলো দলনেতা নর্টনের সঙ্গে—'হ্যালো, হ্যালো—দারুণ খবর, দারুণ খবর-এভারেস্ট পরাজিত—'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। মেঘ সরে মুহূর্তের জন্য উঁকি মারলো এভারেস্ট শিখর। সেখানে কোনো কালো বিন্দু নেই। এর মানে শিখরজয়ের পর ওরা ফিরে এসেছে বা আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের বা ম্যাগনেসিয়াম তারের আলোর সংকেত দেখা যাবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামলো। আর বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তাপমাত্রা নামছে হু হু করে। বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ঢুকলো ওডেল। ওরা কি তবে একেবারে এই পঞ্চম শিবিরে নেমে আসছে? তাঁবুর পর্দাটা ফেললো না ওডেল। হু হু করে হিমশীতল হাওয়া তুষারকণা নিয়ে ঢুকছে। স্লীপিং ব্যাগের ভেতরেও হাত-পা জমে যেতে চাইছে, তবু খোলা পর্দার সামনে চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুয়ে রইলো ও। একটা অশুভ চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে ওর মনে—কোনো বিপদ হয়নি তো ওদের!

এভারেস্টের রোষ বড় ভয়ানক। আজ পর্যন্ত সে কাউকে তার মাথায় উঠতে দেয়নি। বারবার তুষার-ঝড় আর তুষার-ধ্বসের অস্ত্র হেনেছে, প্রাণ নিয়েছে কতো দুঃসাহসীর!

তবে ওদের দুজনের একজন প্রবাদপ্রতিম ম্যালোরি, এভারেস্টকে যাঁর থেকে ভালো আর কেউ চেনেন না ; বাইশ বছরের তরুণ সঙ্গী আরভিনকে নিশ্চয়ই তিনি সামলে নিয়ে গেছেন সাফল্যের পথে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম এভারেস্ট অভিযান হয়, তখন ম্যালোরিই ১৯,১০০ ফুট উঁচুতে উঠে আবিষ্কার করেন এভারেস্টের শিখর অঞ্চলে প্রবেশের দুই পথ—নর্থ আর সাউথ কল।

১৯২২-এর দ্বিতীয় অভিযানে ২৬শে মে তারিখে ২৭,৩০০ ফুট উঁচুতে উঠে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এক নতুন নজির স্থাপন করেন। সেবার ৬ই জুন এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ছেদ টেনে দিলো অভিযানে। তুষার-ধ্বসে প্রাণ হারালো সাতজন শেরপা।

তারপর এই ১৯২৪-এর অভিযান। দুর্ভাগ্য এবারও যেন সঙ্গ ছাড়েনি। গত অভিযানের নেতা ব্রুসই ছিলেন এই অভিযানেরও নেতা। কিন্তু অভিযানের শুরুতেই তিনি হয়ে পড়লেন অসুস্থ। দলের ভার তুলে নিলেন নর্টন। তৃতীয় শিবির পর্যন্ত আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপরই এভারেস্ট ধরলো তার রুদ্র রূপ—পাঁচ দিন ধরে টানা তুষার-ঝড় চললো। অসুস্থ হয়ে পড়লো দলের প্রায় সবাই—কেউ-বা আক্রান্ত হলো তুষার-অন্ধত্বে, কারো হলো তুষার-ক্ষত, কয়েকজনকে ধরলো নিউমোনিয়ায়। শেরপা মানবাহাদুরের তুষার-ক্ষতে পচন

ধরলো। কিছুতেই কিছু হলো না। মারা গেল মানবাহাদুর। আরেকজন শেরপা শমশের তো কোনো সুযোগই দিলো না, মগজে রক্ত জমাট বেঁধে, দলের প্রায় ভেঙেপড়া মনোবলকে আরেকটু নড়িয়ে দিয়ে চলে গেল একবেলায়।

ঝড় থামতে বিধ্বস্ত পুরো দলটা নেমে এলো রঙবুকে। সেখানকার বৌদ্ধমঠের লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ আর মনোবল আহরণ করে আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো এভারেস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে তিন মাস, সময় কমে এসেছে। বর্ষা এসে গেলে সব আশা শেষ হয়ে যাবে। ২১শে মে এভারেস্ট আবার ফুঁসে উঠলো। তৃতীয় শিবিরে বেশ উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা। বারোজন শেরপার চতুর্থ শিবির স্থাপন করে নেমে আসার কথা তৃতীয় শিবিরে। বেলা গড়াতেই চারদিক আঁধার করে উঠলো তুষার-ঝড়। শেরপারা ফিরলো না। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো দলনেতা নর্টনের ; সকলের ভালোমন্দের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু তিনি অসহায়। ২১ তারিখ পেরিয়ে ২২ তারিখ এলো। তুষার-ঝড় সমানে চলেছে। বাইরে তাপমাত্র এখন—২৫°সে.। বেলা বাড়ছে, সেটা বোঝার উপায় শুধু ঘড়ি দেখে—বাইরে তুষার-ঝড়ের তাণ্ডবে চারদিক প্রায় অন্ধকার। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো কতগুলো বিধ্বস্ত মনুষ্যমূর্তি ; শেরপারা ফিরে এসেছে! আনন্দের ঢেউ খেলে গেল শিবিরে।

'এ কী! তোমরা তো দেখছি আটজন', প্রায় চীৎকার করে উঠলেন নর্টন, 'বাকী চারজন কোথায়?'

'ওরা পথের মাঝে তাঁবুতে, মরণাপন্ন'। কোনোমতে জবাব দিলো একজন।

'সে কী!'

'হ্যাঁ। কাল আমরা মাঝপথে ঝড়ের কবলে পড়ি। একটা তাঁবুতে কোনোমতে বারোজন গাদাগাদি করে রাত কাটিয়েছি, তবু ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাইনি। দয়া করে ওদের বাঁচান সাব।'

'নিশ্চয়ই—এ আর বলতে হয়!'

—২৫°-র কামড়, তুষার ঝড়, আর পথ হারাবার ভয়কে তুচ্ছ করে কয়েকজন শেরপাকে সঙ্গে নিয়ে ম্যালোরি আর সামারভেলের সঙ্গে নর্টন বেরিয়ে পড়লেন তাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। উদ্ধারপর্ব সম্পন্ন করে ফিরলেন যখন সকলে, তখন রাত নেমেছে।

ঝড় চললো টানা আট দিন।

ঝড় থামলো, কিন্তু বর্ষা এসে গেল দোরগোড়ায়। ঠিক হলো, ছোটো ছোটো দলে দ্রুত শিখরজয়ের চেষ্টা হবে। ১লা জুন বেরোলেন ম্যালোরি আর জিওফ্রে ব্রুস। কিন্তু পঞ্চম শিবিরে পৌঁছবার আগেই শুরু হলো মহাপ্রলয়। দিকদিগন্ত

কাঁপানো মেঘের ডাক আর মুহুর্মুহু তুষার-ধসের গর্জন বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিলো। কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরলেন ওঁরা। দুর্যোগ চললো দুদিন ধরে।

এবার পালা নর্টন আর সামারভেলের। পঞ্চম শিবিরে পৌছবার আগেই অসুস্থ হয়ে ফিরে এলো সামারভেল। তিনজন শেরপা নাপবুজিমে, শেখ চুম্বে আর লাকপা ছেদিকে নিয়ে নর্টন ২৬,৮০০ ফুটে স্থাপন করলেন ষষ্ঠ শিবির। পরদিন শুরু হলো শিখর অভিযান। আবহাওয়া পরিষ্কার। কিন্তু হায়-তুষার-অন্ধত্বে আক্রান্ত হয়ে ২৮,১৫০ ফুট থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন নর্টন।

ম্যালোরি দেখলেন এভারেস্ট যেন উদ্ধত মাথা তুলে সদম্ভে অট্টহাস্য করছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো ম্যালোরির। তিনি মনে মনে বললেন, 'ঠিক আছে, চো মো লাঙমা, তোমার ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমি।'

৬ই জুন আরভিন আর ওডেনকে নিয়ে পঞ্চম শিবিরে উঠে এলেন ম্যালোরি। সেখানে ওডেলকে রেখে পরদিন ম্যালোরি আর আরভিন উঠে গেলেন ষষ্ঠ শিবিরে। চিঠি পাঠালেন ওডেলকে—'আবহাওয়া পরিষ্কার। কম্পাসটা পঞ্চম শিবিরে ফেলে এসেছি, যত্ন করে রেখো।'

ভাবতে ভাবতে রাত ফুরিয়ে এলো। উঠে পড়লো ওডেল। নাঃ, ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না, নিজেই উঠে যাবে ষষ্ঠ শিবিরে। এভারেস্ট-বিজয়ীরা এটুকু সম্মান আশা করতেই পারে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়লো ও। উত্তেজনায় ছ ঘণ্টার পথ সাড়ে চার ঘণ্টায় উঠে এলো। ঐ তো তুষারের মাঝে তাঁবুটা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

দূর থেকেই হাঁক দিলো ওডেল, 'ম্যালোরি...আরভিন...'

প্রত্যুত্তরে এবারও নিস্তব্ধতা।

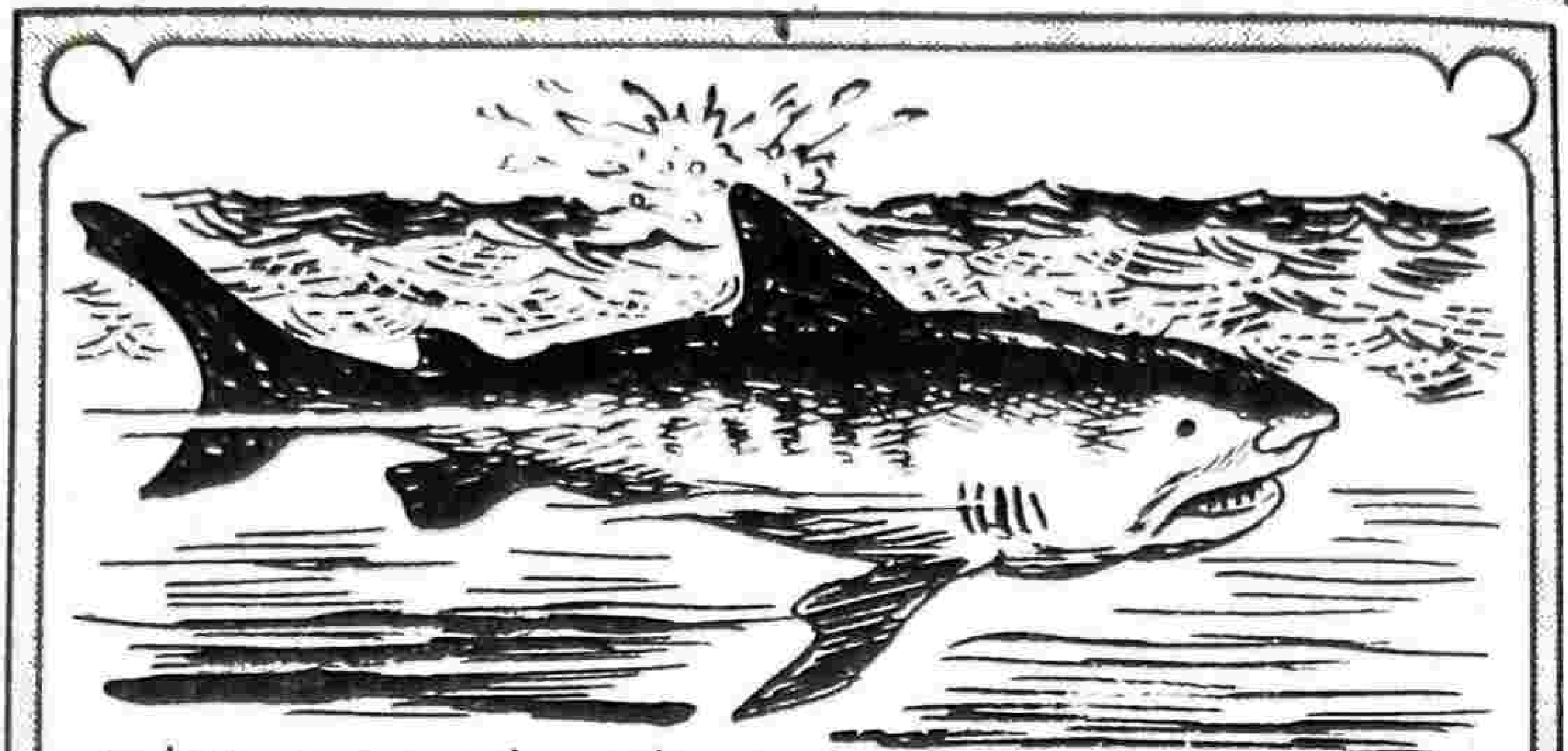
বুক কেঁপে উঠলো ওডেলের। ছুটে গিয়ে তাঁবুর পর্দা সরালো—কেউ নেই। তাঁবুর ভেতর মৃত্যুপুরীর শূন্যতা।

ভোরের এভারেস্টের মতোই শীতল, নিস্তব্ধ, নির্জন ষষ্ঠ শিবির। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো ওডেল। ও বুঝতে পারছে এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা আর নিস্তব্ধতার অর্থ—ম্যালোরি আর আরভিন হারিয়ে গেছেন এভারেস্টের বুকে চিরকালের মতো।

রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ম্যালোরি আর আরভিন আজও পর্বতপ্রেমীদের কাছে এক ধাঁধা—কোথায় গেলেন ওঁরা? ম্যালোরির তুষার কাটার গাঁইতিটা ছাড়া তো আজ অবধি কিছু পাওয়া যায়নি!

এভারেস্ট কি ওঁদের পদানত হয়েছিলো?

এই প্রশ্নের মতো এই দুই মহাবীরও পর্বতপ্রেমী মানুষের মনে আজও অমর।



হাঙরের মুখ থেকে

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

হাঙরের মতো পেটুক দুনিয়ায় নেই।

খাবার দেখতে পেলেই হলো। যতক্ষণ না সেটা পেটে পুরতে পারে ততক্ষণই ছটফট করে যাবে। খাবার বলতে মাছ-মাংস-চর্বি হলে তো খুবই ভালো, না হলে ইঁট-কাঠ টিন কোনো কিছুতেই তাদের আপত্তি নেই।

নাবিকদের পক্ষে তাই হাঙর ধরা খুবই সোজা। শুধু মোটা নাইলন দড়িতে বঁড়শির কায়দায় বাঁকানো একটা লোহার হুক বেঁধে, সেই হুকে কিছু মাংস আর চর্বি গেঁথে জলে ফেলে দিলেই হলো। যত দূরেই থাক হাঙর, ঠিক খাবাবের গন্ধ পবে, আর গন্ধ পেলেই হুমড়ি খেয়ে সেই হুকটা মুখে পুরে দেবে। তখন নাবিক মশাই করবেন কী হেঁই মারো, মারো টান বলে হুকের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ধরে হাঙর-সুদ্ধ টেনে তুলে ফেলবেন জাহাজের ডেকের ওপর।

যা বলছিলাম, হাঙর একটু মাছ মাংস খেতে ভালোবাসে। হাঙরের জ্বালায় তাই মাছেরা তটস্থ। হাঙর দেখলে ইয়া বড়ো বড়ো রাক্ষুসে মাছেরা অবধি পালাতে পথ পায় না। তবে, একটা ব্যাপার আছে। হাঙরের মাথা আর পিঠের ওপর পাইলট মাছ নামে এক ধরনের ছোট-ছোট মাছ সব সময়েই থাকে। ঝাঁক বেঁধে থাকে। হাঙর শিকারের ওপর ঝাঁপ দিতে গেলেই, এরা যেন কেমন করে টের পায় আর হাঙর ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাক বেঁধে বসে যায় তার চোখের ওপর। ব্যস, শিকার যায় ফসকে!

তাই বলে সব হাঙরই কিন্তু এমন গোবর-গণেশ নয়। এক ধরনের 'খুনে

হাঙর' আছে, যাদের সামনে পড়লে, বেঁচে পালানো শক্ত। কমপক্ষে বারো থেকে চোদ্দ ফুট লম্বায়, এই সব খুনে হাঙর এক একটা আস্ত রাক্ষসের মতো। এদের গায়ের রঙ ধব ধবে ফর্সা। তামাটে কিংবা ধূসর রঙ হাঙরেরা মানুষ-টানুষকে বড়ো একটা ঘাঁটায় না। ওদের যতো দৌরাত্ম্য মাছেদের ওপর। কিন্তু খুনে হাঙর হলে মাছ তো বটেই, তার চেয়ে বেশি নজর দেয় মানুষের ওপর। যাকে বলে, নেকনজর।

এই রকমই এক খুনে হাঙরের পাল্লায় পড়েছিল রডনি ফক্স। বাড়ি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডিলেডে। বয়েস তেইশ। রডনির বেজায় নেশা স্কিন ডাইভিং -এ। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া স্কিন ডাইভিং প্রতিযোগিতায় একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরের বছরে রানার্স আপ। ১৯৬৩-৬৪'র প্রতিযোগিতার জন্যে রডনি দারুণভাবে প্র্যাকটিস করে গেছে।

এই প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে, প্রতিযোগীরা ডুবুরীর পোশাক পরে জলের নিচে নেমে যাবে। কিন্তু, অকসিজেন ছাড়াই তাদের জলে নামতে হবে। এবং এইভাবেই যে যতো মাছ ধরতে পারবে, তারই ওপর চ্যামপিয়ন খেতাব পাওয়া যাবে। অথাৎ পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে দম ও ক্ষমতার ওপর। রডনি ৩০ মিটার অথবা ১০০ ফিট নিচে ডুব দিয়ে, দু এক মিনিট থেকে যাতে উঠে আসতে পারে, এইরকম ভাবেই প্র্যাকটিস করেছিল।

হাঙর যাতে সাঁতারুদের ওপর হামলা না করে-তার জন্যে জলের ওপর একটা বিরাট জায়গা ঘিরে মোটর লঞ্চগুলো ঘোরাফেরা করে। লঞ্চগুলোতে থাকে বাঘা-বাঘা হাঙর শিকারী। আগেই বলেছি, ছোটখাটো হাঙর,অথবা তামাটে কিংবা ধূসর হাঙর মানুষদের বড়ো একটা ঘাঁটায় না। স্রেফ মাছকে ধাওয়া করে। আর,খুনে হাঙরগুলো মানুষ-জনের কাছে চট করে ভেড়ে না। তবুও, ওদের মেজাজ-মর্জি তো বোঝা ভার। যার জন্যে,অন্তত চল্লিশজন জেলে জলের নিচে ও ওপরে শালতি ভাসিয়ে অনবরত ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা করে লম্বা সড়কি কিংবা বল্লম—আর লম্বা একটা দড়ি ঝোলানো থাকে তাদের শালতি থেকে। শালতির দড়ির শেষের দিকটা আবার জেলেদের কোমরে বাঁধা থাকে। যাতে জলের নিচে গেলেও তাদের টেনে তোলা যায়। বড়ো কোনো মাছ সড়কি দিয়ে গাঁথলেই তারা দড়ি দিয়ে মাছটাকে শালতিতে টেনে নেয়। কেননা, মাছের রক্ত জলে পড়লেই হাঙর ঝাঁক বেঁধে চলে আসতে পারে। শুধু জেলে নয়, প্রতিযোগীদেরও একটা করে শালতি থাকে। শালতির দড়ি কোমরে বাঁধা থাকে, যথারীতি।

যাক, সেদিন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে সকাল নটার সময়। জায়গাটা হলো আলডিংগা রিফ। সমুদ্রে নীল জল টলটল করছে। দুপুরের দিকে, প্রতিযোগিতা শেষ হতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি, রডনি জল থেকে উঠে,তার শালতিটা ঠেলতে ঠেলতে কিনারার দিকে এগিয়ে গেল। উদ্দেশ্য, মাছগুলো বালির ওপর রেখে আসবে। সকাল থেকে সে অন্তত ২৭ কিলোগ্রাম মাছ ধরেছে। নানা ধরনের, নানা মাপের মাছ। প্যারট, স্নোরেক, স্ন্যাপার, ম্যগপাই। এতো মাছ বোধ হয় আর কেউ ধরতে পারেনি।

বালির ওপর মাছের ডাঁই রেখে, সে আবার সমুদ্রে ফিরে এলো। আরও বড়ো মাছের খোঁজে ঘুরতে লাগল। মাইল খানেক সাঁতরাবার পর তার হঠাৎ মনে পড়ল, সকালের দিকে মাছ রাখতে এসে, বিদঘুটে ধাঁচের একটা শিলাখণ্ড চোখে পড়েছিল। শিলাটার কাছে বেশ কিছু মোরং মাছ ছিল। একটু খুঁজতেই, শিলাটা দেখতে পেল সে। একটা মোরং মাছ তখনও আছে!

মাছটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রডনি ঝুপ করে জলে ডুব দিল। মতলব, শিলাটার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে মাছটাকে কায়দা করবে। অতএব, খুব সন্তর্পণে, একটুও আওয়াজ না করে সে শিলাটার একপাশ দিয়ে এগোতে লাগল। মাছটা তখনও টের পায়নি। দিব্যি আরামে সে সবুজ শ্যাওলা ঠুকরে যাচ্ছিল। এই মাছটা ধরতে পারলে রডনির চ্যামপিয়নশিপ আর কে আটকায়!

এই ভেবে সে স্পিয়ার গান (যা থেকে সড়কির ফলা বুলেটের মতো ছুটে যায়) মাছটার ওপর তাগ করে ছুঁড়তে যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় জল তোলপাড় করে একটা কিছু তার দিকে ছুটে এলো। বাঁ কাঁধে একটা প্রচণ্ড ঝাপটা,মনে হলো কাঁধটা বুঝি এখুনই ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। তারপরই প্রচণ্ড গতিতে রডনিকে সেটা টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের গভীরে।

ঝাপটার ধাক্কায় মুখের মাস্কটা আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল। হাত থেকে স্পিয়ার গান কোথায় ছিটকে পড়েছিল, কে জানে। রডনির মনে হলো তার শরীরটা কেউ যেন হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ক্রমশ চেপে ধরছে শক্ত করে, যেন তাকে পিষে মেরে ফেলতে চাইছে। ভয়ে রডনির গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র, সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী সাদা হাঙর তাকে ধরেছে।

হাঙরটা নিশ্চয়ই তাকে এতোক্ষণ অনুসরণ করে করে এসেছে সমুদ্রের নিচ থেকে। তারপর, সময় বুঝে আচমকা আক্রমণ করেছে। এখন উপায়?

রডনির বাঁ কাঁধটা হাঙরের গলার মধ্যে। জোরালো এক- জোড়া চোয়ালের ফাঁকে হাঙর তার বুক পিঠ শক্ত করে চেপে ধরেছে। রডনি ফকস এবার মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে হাঙরটাকে পাল্টা আক্রমণ করার চেষ্টা করল। ডান হাত দিয়ে সে এক প্রচণ্ড ঘুষি মারল হাঙরটার মাথায়, তারপর আঙুল দিয়ে তার চোখ উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আচমকা ঘা খেয়ে হাঙরটার চোয়াল একটু শিথিল হতেই, রডনি হাতের জোরে চট করে বেরিয়ে এলো তার চোয়াল থেকে, তারপর দ্রুত উপরে ওঠার চেষ্টা করল। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে, হাঙরটা এবার ব্রেডের মতো ধারালো দাঁত দিয়ে রডনির ডান হাতটা চেপে ধরল। রডনি তখন পাগলের মতো হাত ছুঁড়ে, লাথিমেরে, কোনোক্রমে হাতটা ছাড়িয়ে আবার বেরিয়ে এলো তার নাগাল থেকে। জলের ওপর দিকে যেতে যেতে সে টের পেল তার কাঁধ আর হাত থেকে টপটপ করে ঝরে পড়ছে রক্ত। রক্তের সেই দাগ ধরে হাঙরটা এগিয়ে আসছে। যাতে, তার চোয়ালের মধ্যে না পড়তে হয় আবার, এই ভেবে রডনি আঁকাবাঁকা কায়দায় সাঁতরাতে লাগল ওপরের দিকে।

জলের ওপর উঠে এসে রডনি বুক ভরে নিশ্বাস নিল। তারপরই সে দেখতে পেল হাঙরটার ডানা জল কেটে তার দিকে আবার এগিয়ে আসছে। আক্রমণের জন্যে হাঙরটা এবার ডুব দিল। তার শক্ত শরীরটা রডনির শরীরের সঙ্গে ঘষে গেল। বোঝা যাচ্ছে, সহজে ছেড়ে দেবে না। হাঙরটা ঘুরে গিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টা করতেই রডনি সাঁ করে ডুব দিল হাঙরটাকে এড়াবার জন্য, কিন্তু পারল না। তবে, হাঙরটা কিছু করার আগেই রডনি তার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাত ও পা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

জলের গভীরে নেমে যেতে যেতে, হাঙরটা বার কয়েক প্রচন্ড জোরে ঝাপটা মারল যাতে রডনি পড়ে যায়। এদিকে তেষ্টায় রডনির ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। সে হাঙরটাকে ছেড়ে দিয়ে আবার ওপর দিকে সাঁতরে উঠতে লাগল। জলের ওপর উঠে আসতে সে দেখতে পেল আশপাশের জল লাল হয়ে গেছে তারই গায়ের রক্তে। খুনে হাঙরটা এবার যেন রাগে অন্ধ হয়ে আক্রমণ করার জন্যে তৈরি হচ্ছে। রডনি কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। রক্তক্ষয়ে শরীরটা এমনিই দুর্বল হয়ে গেছে। এই খুনেটার সঙ্গে আর পেরে উঠবে বলে মনে হচ্ছে না।

হাঙরটা রডনির শালতি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিতেই, শালতিটা গেল উলটে, আর দড়িতে জড়িয়ে গিয়ে হাঙরটা শালতিসুদ্ধু ক্রমশ নিচের দিকে চলে যেতে

লাগল দ্রুত। রডনির কোমরে বেল্টের সঙ্গে সালতির দড়িটা বাঁধা। শালতি আর হাঙরের সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে যেতে যেতে রডনি প্রাণপণে চেষ্টা করল বেল্ট খুলে ফেলতে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারল না। সর্বনাশ, শেষ অবধি কি ডুবে মরতে হবে?

তারপর, প্রায় আচমকা হাঙরের ল্যাজ ঝাপটানির চোটে দড়িটা ছিঁড়ে গেল। রডনি পড়ি-মরি করে উঠে এলো জলের ওপর। চেঁচিয়ে উঠল ঃ হাঙর! হাঙর!

রডনির চিৎকার শুনেই পাহারায় থাকা লঞ্চগুলো ছুটে আসতে লাগল। রডনি মনে মনে প্রার্থনা করল, হে ভগবান—হাঙরটা যেন এখন আর না আসে, আগে আমাকে লঞ্চে তুলে দাও—

লঞ্চগুলো ততক্ষণে রডনির কাছে সে তাকে জল থেকে তুলে ফেলেছে। হাঙরের দাঁত লেগে ওর ডান হাত আর কাঁধের অনেক জায়গার মাংস এমনভাবে উঠে গেছে যে, হাড় দেখা যাচ্ছে। পাঁজরের হাড় অবধি বেরিয়ে পড়েছে। ডুবুরীর পোশাকটাই ওর ছিন্ন শরীরটাকে আটকে রেখেছে কোনোক্রমে। সঙ্গে সঙ্গে, একটা এ্যামবুলেনসের ব্যবস্থা করে রডনিকে ওরা আলডিংগা থেকে ৩৪ মাইল দূরে এ্যাডিলেড হাসপাতালে নিয়ে গেল।

রডনি এখনও বেঁচে আছে। তবে, শরীর থেকে খুনে হাঙরের আক্রমণের চিহ্ন মিলিয়ে যায়নি। দাগগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট। পাঁচ মাস হাসপাতালে থাকার পর সে সুস্থ হয়ে ফিরেছিল।

ডুবুরীর পোশাক পরে এখনও সে জলের নিচে সাঁতরে যায় ডুব-সাঁতার দিয়ে, কিন্তু হাঙর দেখলে সে তল্লাটে আর থাকে না।



হারমাদ

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

"হারমাদ, হারমাদ!"

আকাশ বাতাস উঠল দুলে। একটা আর্ত চিৎকার! চমকে ফিরে তাকালাম, না, কই কোথায় কে! কোথায় হারমাদ! একটা দুরন্ত হাওয়া গঙ্গার উপর দিয়ে এসে আছড়ে পড়ল। সন্ধ্যা নামছে উঁচু গীর্জাটার মাথায়। ছাদ ঘেঁসে। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে দূর আকাশ, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ। ছায়া ছায়া পৃথিবী, থমথমে —অশরীরী অনুভূতি। ঐ কে যেন কাঁদছে। হ্যাঁ, অনেকে— অনেক লোক। প্রকান্ড আকাশচুম্বী গম্বুজটার মাথায় বড় ঘন্টাটা দুলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই সামনেই দেবীমূর্তি হাসছে। তলায় লেখা—নৌ যাত্রার দেবী— দুপাশে দুটো জ্বলন্ত মোমবাতি।

—বাবু সন্ধে হয়ে এল। রিকসাওলা তাড়া দিল।

—হ্যাঁ চল। যাই।

আস্তে আস্তে নেমে এলাম, ঢুকলাম উপাসনা-গৃহে। দুপাশে দেওয়ালে আঁকা ছবি—যীশুর জীবনকথা। সামনে মেরী মাতার মূর্তি। বড় মোমবাতি জ্বলছে। খৃষ্ট বালকরা সারি সারি দাঁড়িয়ে, সবুজ গাউন পরনে, রুমাল মাথায় মেয়েরা। সামনে যাজক, হাতে বাইবেল, উপাসনা পরিচালনা করছেন। জমকালো কারুকার্য করা পোশাক ঝিলিক মারছে, সৌম্য, শান্ত মূর্তি।

—ঠিক যেন দাক্রুজ সাহেব।

– দাক্রুজ সাহেব—সে কে?

—সে এক বেত্তান্ত বাবু। আমি শুনেছি আমার ঠাকুর বাবার কাছে। তেনি শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুর বাবার কাছে। পেটের দায়ে বাবু রেকসা চালাচ্ছি, নইলে আমার বাপ-ঠাকুর্দা ছিলেন নায়ের মাঝি। শক্ত হাতে তাঁরা দাঁড় বাইতেন।

তারিণীর হাত দুটো হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। কি শক্ত চেহারা, কে বলবে ৬০ বছর বয়স। সন্ধ্যার আবছা আলোয় প্রদীপ্ত তারিণী বলে চলেছে গল্প, আর আমি শুনছি।

সন্ধ্যা হয় হয়। রসিক কুন্ডুর নৌকা তিরপুনির ঘাটে এসে লাগল। তিরপুনির ঘাট, জল থই থই করছে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যুক্ত বেণী এখানে হয়েছে মুক্ত। রসিক কুন্ডু চলেছেন বিশাল বজরা নিয়ে। ভরতি বেনেতি মাল। সঙ্গে লোক, লস্কর, লাঠি, সড়কি।।

—হুজুর তিরপুনির ঘাট।

—উজিয়ে চল। কাল ভোরের আগেই পৌঁছুতে হবে।

ছপ্ ছপ্ ছপ্। বজরা চলেছে। চলেছে সপ্তডিঙ্গা মধুকর। হঠাৎ সর্দার মাঝি উঠে দাঁড়াল, হাত দুটো বেঁকিয়ে চোখের সামনে ধরল, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে কি যেন দেখল সামনে। তারপর ফিসফিস করে বলল—হুজুর, সামনে মনে হচ্ছে হারমাদী নাও।

—হারমাদ!

শক্ত হয়ে উঠল রসিক কুন্ডুর দেহ।

—দিন দিন ওদের অনাচার বেড়েই চলেছে। হাতিয়ার তৈরী রাখ।

বজরায় একটা সোরগোল উঠল—সামাল ভাই, সামাল। হুঁশিয়ার। সামনে দুশমন। তৈয়ার। সবাই তৈরী। রসিক কুন্ডু নিজে বজরার মাথায়। হাতে অস্ত্র। দূরে—একটা প্রকান্ড ছায়া—ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, এক প্রকান্ড রাক্ষসের মতো। ক্রমে ক্রমে সে ছায়া তখন কাছে এসেছে। বিশাল এক জাহাজ পাল তুলে এগিয়ে আসছে।

—কার নাও?

প্রশ্ন আসে জাহাজ থেকে। দেশী মাল্লার গলা।

—তোর বাবা, রসিক কুন্ডুর। কেন, তোর কি চাই?

গুম্—গুম্—গুম্।

উত্তরটা ফিরে এল।

হারমাদ! হারমাদ! আকাশ বাতাস উঠল ভরে। নদীর জল লাল হয়ে উঠল

তাজা রক্তে। দুপক্ষের বন্দুকের শব্দ, আর্তের চিৎকারে বাতাস হয়ে উঠল ভারী। রসিক কুন্ডু নিজে আহত হয়েও বন্দুক ছুঁড়তে লাগলেন। বার বার ধ্বনি উঠছে—হারমাদ। হারমাদ।

রাতের অন্ধকারে সেদিন রসিক কুন্ডুর বজরার অনেকে হল নিহত, অনেকে আহত। দুজাহাজের দূরত্ব গেল কমে। হারমাদী জাহাজ আরো এগিয়ে এল। দস্যুরা লাফ দিয়ে পড়ল বজরায়। তখন শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। রসিক মুক্ত তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেউ কম যায় না। কিন্তু দস্যুরা সংখ্যায় বেশী। যারা নিহত হল, তারা রেহাই পেয়ে গেল। জীবিতরা হল বন্দী।

রসিক আর ক'জন জীবিত বন্দী হলেন।

রসিক কুন্ডু বন্দী হলেন, পর্তুগীজরা তাঁকে নিয়ে গেল ; বজরার যা কিছু ছিল লুঠ করল। তারপর বজরা ডুবিয়ে দিল।

বন্দী শিবির।

সারি সারি বন্দীরা দাঁড়িয়ে। হাতে পায়ে শিকল বাঁধা। বন্দীদের হাতের পাতায় ছিদ্র করে তার ভেতর সরু বেত দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। এক একজন বন্দী চিৎকার করছে আর ওরা উৎকট আনন্দে অট্টহাস্য করে উঠছে। এত জনের মাঝে একজন শুধু শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তিনি রসিক কুণ্ডু।

পর্তুগীজ দস্যু রড্রিডা এসে দাঁড়াল তার সামনে।

—কি চাও?

—হাঃ-হাঃ-হাঃ। কি চাই? হাঃ-হাঃ-হাঃ।

—শয়তান।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ। শয়তান? ভোরের আগেই তোকে বিক্রি করব—তমলুকে। বাকীগুলোকে বেচে দেব বজবজে।

কি একটা বলতে গেলেন রসিক। রড্রিডা সজোরে মারল এক লাথি। সহ্য করতে পারলেন না রসিক, চেতনা শূন্য হয়ে পড়লেন।

ছোট্ট গ্রামটি, কিন্তু সুন্দর—শোভাময়। গ্রামে বেশ কয়েক ঘর গৃহস্থের বাস। তাদের গোলায় ধান, পুকুরে মাছ, আঙিনায় খেলে বেড়ায় ফুটফুটে ছেলে মেয়ে। গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন রসিক কুন্ডু।

সন্ধ্যার শাঁখ বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগে, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িতে কর্ত্রী বসে আছেন, কর্তা এখন ফেরেন নি অথচ ফেরার কথা দুদিন আগে। এককোণে প্রদীপটি জ্বলছে। ছোট ছেলে ভীষণ ঘর বার করছে। কখন বাবা ফেরেন—

জ্ঞান হতে রসিক উঠে বসলেন। সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা। কোন রকমে ঘসে ঘসে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসলেন। ওদিকে দস্যুরা গোল হয়ে বসে রাতের খাবার খাচ্ছে। হঠাৎ একজন এসে কি বলতেই—ওরা উৎকট উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। নেচে উঠল হাতের উলঙ্গ তরবারি। হেসে উঠল—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

উঠে দাঁড়াল রড্রিডা—আজই, হ্যাঁ আজই। তোমরা সকলে তৈরী হয়ে নাও।

—কিন্তু অনেক পথ—

কত পথ? গ্রাম লুঠ করে ফিরে আসবো—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

তখনো রাত শেষ হয়নি। ভূষণের চোখে ঘুম এসেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—শুনছ, শুনছ, ওঠো। হারমাদ! ধড়ফড় করে ভূষণ উঠে পড়ল। বাইরে তখন প্রচন্ড কোলাহল। জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে দেখল—দক্ষিণ দিকের বারান্দার চালাটা দাউদাউ করে জ্বলছে। লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে দেওয়াল থেকে খুলে নিল তলোয়ারখানা। বাইরে দরজায় অনেকগুলো পা একসঙ্গে পড়ল। ভূষণকে চেপে ধরল ওর স্ত্রী। "—তুমি। যেওনা।" ওকে আর যেতে হলনা, দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল একদল পর্তুগীজ। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। বাধা দিতে এগিয়ে গেল ভূষণ, কিন্তু পারবে কেন একলা অতজনের সঙ্গে? রসিক কুন্ডুর বাড়ি সেদিন লুণ্ঠিত হল! বাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করল, পুরুষ-স্ত্রী সকলকে বন্দী করল, শুধু ওদেরই নয়, আশপাশের সকলেরই এক অবস্থা হল। রাতের অন্ধকারে সমস্ত পাড়াটি হল শ্মশান।

রসিক কুন্ডুর বৃদ্ধা মার গলায় পা দিয়ে মেরে হা-হা করে হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল। তখনো কাক ডাকেনি, রয়েছে রাতের কালো।

সে আজ অনেক দিন আগেকার কথা। সমুদ্র-নদীকূলবর্তী মানুষ—সে কি দরিদ্র, কি ধনী, ভীত চকিত অন্তরে নিশি যাপন করত। মায়ের কোলে নিদ্রিত শিশু চমকে উঠত বুক ভাঙা সেই চিৎকার শুনে—হারমাদ, হারমাদ!

বাংলার স্বর্ণখনির সন্ধানে সেদিন ছুটে এসেছিল সপ্ত সাগর পার হয়ে দুরন্ত পর্তুগীজ-ওলন্দাজ।

সমুদ্রের জলরাশির বুকে পাল তোলা জাহাজ নিয়ে তারা নেচে বেড়াত। সেদিন তাদের হাতের তরবারির আঘাতে কত সংসার যে শ্মশান হয়েছে তার ঠিক নেই।

হাট-বাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে লোকেদের ক্রীতদাস করবার জন্য বন্দী করে নিয়ে যেত। নিম্নবঙ্গের কত গ্রাম যে তারা এভাবে লুঠ করেছে তার ঠিক নেই। নৌকা নিয়ে চারপাশ ঘিরে লুঠ করত বেনেতি জাহাজ, কখনো পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল গিয়ে জনমুখর গ্রাম বা উৎসবমুখর বাড়িতে হত্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করত। এ সব তো ইতিহাস।

সে এক বিভীষিকা।

সারাটা সকাল কিভাবে কেটে গেছে মনে নেই, তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, একদল লোক টানতে টানতে বন্দীর দলকে নিয়ে দাঁড় করাল বাইরের উঠানে। রসিক চোখ খুলে দেখলেন সেখানে সার সার দাঁড় করানো হয়েছে তাদের বাড়ির, পাড়ার মানুষদের, একজন বিকট আকার মানুষ সকলের অঙ্গ পরীক্ষা করে দাম হাঁকছে। একজন লোক মস্ত ধামায় কি যেন নামিয়ে দিয়ে গেল। লোকটি ধামা থেকে চাল নিয়ে যেমন পাখিদের ছিটিয়ে দেয় সেই ভাবেই ছিটিয়ে দিল। আর একজন প্রকান্ড বেত নিয়ে সমস্ত জায়গাটায় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ দস্যুদের মধ্য একটা গুঞ্জন উঠল—দাক্রুজ, দাক্রুজ! রসিক দেখলেন একজন বিদেশী। বুক অবধি সাদা দাড়ি, চোখে ক্ষমা, হাতে কতগুলি সেঁকা রুটি। সেগুলো একটি একটি করে বন্দীদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

রসিক সেঁকা রুটিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, দুচোখ বেয়ে নেমে এল জল।

গীর্জার ধারে এক কোণে, নিরালায় নির্জনে নিবাস দাক্রুজের। নিরীহ মানুষ জোর করে ধর্মান্তরিত করেন না, নিজের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। মেরী মাতার কাছে বলেন—মা, ক্ষমা ক'রো আমার দেশের জন্তুগুলোকে। অন্য যাজকরা যখন ধর্মান্তরিত করবার জন্য জোর করে, দাক্রুজ তখন প্রেম বিলোন। রসিকের চোখে জল, দাক্রুজের চোখেও। বন্দী অবস্থায়ই রসিক তাঁকে প্রণাম করলেন। এগিয়ে আসে রড্রিডা—দাক্রুজকে সেও অবহেলা করতে পারে না। দাক্রুজ ওর দিকে তাকায়—বিড়বিড় করে বলে—"হে মা, এদের প্রবৃত্তির উপশম হোক"।

দাক্রুজ চলে গেলেন। পরদিন সমস্ত বন্দীদের ছাগল গরুর মত জাহাজে তোলা হল, তারপর—তাদের যে কোথায় পাঠান হল কেউ জানতেও পারলনা, হারিয়ে গেল রসিক কুন্ডু।

সমস্ত গ্রামটা শ্মশান। একটিও যুবক যুবতী নেই, আছে কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধা। দিনরাত তারা থাকে ভয়ে ভয়ে। অস্ত্র ধরার সামর্থ্য নেই, কি করে, দিন রাত

চলে শলা পরামর্শ। হঠাৎ বুড়ো নসু মাঝির নজর পড়ে ঘরের কোণে বস্তা বস্তা লংকার দিকে। দীপ্তিহীন চোখদুটোও ঝক্‌ঝক্‌ করে ওঠে। ফোক্‌লা দাঁতের ফাঁকে ফোটে হাসি।

সেদিন নদীতীরবর্তী মৎস্যজীবীরা সবাই এক হল। যার ঘরে যত লাঠি, বাঁশ যা ছিল জড়ো করল। নসুর বুড়ো হাড়ে যেন ভেল্কি লেগেছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে দুটো একটা করে বস্তা।

সেদিন যখন এল দস্যুরা—সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল। হোক দেহ অশক্ত, কিন্তু মন ভরা শক্তি, কেউ নিল লাঠি, কেউ বাঁশ। কারও মাথা ভাঙল, কারও পা। হঠাৎ ধুলোর বাতাসের মত উড়ে আসতে লাগল কিসের গুঁড়ো। মুঠো মুঠো লঙ্কার গুঁড়ো দস্যুদের চোখে এসে পড়তে লাগল। যেমন ভাবে হোলির দিন ফাগ ওড়ে। এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ—অপরিচিত অস্ত্র। টিকতে পারল না দস্যুরা। জ্বালার চোটে চোখ রগড়াতে রগড়াতে পালাল।

দস্যুরা সেবার তো পালাল, কিন্তু তারপর? বুড়োর দল আবার বসল—কি করা যায়!

এদের দস্যুতা তো আর আজকের নয়। সম্রাট আকবরের সময় থেকে মগ আর পর্তুগীজ জলদস্যুরা জল পথে এসে বাংলা লুঠ করত। হিন্দু-মুসলমান, স্ত্রী-পুরুষ সকলকে বন্দী করত, বন্দীদের সঙ্গে ব্যবহার করত পশুর মত। এত কষ্ট পেয়েও যারা বেঁচে থাকত তাদের চাষ-আবাদের কাজে লাগাত বা দক্ষিণ ভারতের নানান্‌ বন্দরে বিক্রি করত। ব্যান্ডেলের হাট দিয়ে ব্যবসায়ীরা গেলে জোর করে মাশুল আদায় করত।

এ সবই বুড়োরা জানত। তবু কিছু তো করতে হবে। কিন্তু কিই বা করে? হুগলী তো পর্তুগীজদের অধীনে, তারা দুর্গ গড়ে, সৈন্য সাজায়, যেন ছোট খাট রাজা। বাদশাহকে তারা মানতেই চায় না। তারা প্রজার ওপর করে অত্যাচার, নানা পণ্যের সঙ্গে করে মানুষ কেনা বেচা, পাঠায় তমলুক, বালেশ্বর, আখড়া, বজবজ।

কথাটা যে ভাবেই হোক দরবারে পৌঁছয়। নানা দিক থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়। কিন্তু কে শোনে? রড্রিডা, গঞ্জালেসরা হা হা করে হেসে সব উড়িয়ে দেয়!

তবুও বুড়োর দল আবেদন পাঠায়, সম্রাটের প্রতিনিধি সুবাদারের কাছে, এলো দলে দলে মানুষ—রক্ষা কর, রক্ষা কর।

এ দিকে ব্যান্ডেলের কুঠী হয়ে উঠেছে দুর্গ। গীর্জার ধারে এক কোণে নিরালায় বাস দাক্রুজের। দাক্রুজ সব দেখেন, মেরী মাতার কাছে প্রার্থনা করেন—মা এদের মতি ফিরিয়ে দাও। কিন্তু মতি এদের ফেরেনা। দুর্মদ, দুরন্ত হারমাদ। তলোয়ারের ঘায়ে রক্তের বন্যা বহায়। আর হাসে—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হুগলীর আকাশে বাতাসে বারুদের গন্ধ। সেনাপতি কাশেমের তোপের আওয়াজে কেঁপে উঠেছে গীর্জার থামগুলো, একটা একটা করে ভেঙে পড়ছে। দেখেন দাক্রুজ জ্বলছে গীর্জা। বুকে জড়িয়ে ধরেন মেরী মাতার মূর্তি। বেরিয়ে পড়েন গীর্জা থেকে। কিন্তু কোথায় যাবেন? শুধু অন্ধকার আর তোপের শব্দ। পা টিপে টিপে এসে ওঠেন ঘাটে। ঐ তো নৌকা। বুড়ো নসু মাঝি না। হ্যাঁ।

—সাহেব, তুমি। এই সময়? কোথায় যাবে?

—তাতো জানি না—মেরী, মেরী মাতা জানেন।

—তাই তো সায়েব! বেশ, চল।

সুবাদার ওদিকে তিন দিক্ দিয়ে হুগলী ঘিরে ফেলেছে। শ্রীরামপুরের কাছে সেতু বন্ধ করে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। দুর্গের সামনেই এক পরিখা, তার জল ছেঁচে ভরে দিয়েছে বারুদ।

হঠাৎ—উঃ, কানে যেন তালা ধরে গেল। নসুর হাত থেকে পড়ে গেল বৈঠা। বারুদ দিয়ে দুর্গের পরিখাটি ভরে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কাশেম।—

তারিণী চুপ করল।

নসু তার পূর্ব পুরুষ।

তবু, তারপর কি হল সে জানে না। সে জানে ইতিহাস। তারিণীর গল্প থামতেই ইতিহাস সরব হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, তারিণীর কথা ঠিক। কাশিম বারুদে দুর্গের পাঁচিল উড়িয়ে দিল। ভাঙা পথে বন্যার জলের মতো মোগলরা ঢুকল। প্রায় এক হাজার দস্যু নিহত। চুয়াল্লিশ শ' হল বন্দী। যুবকদের মুসলমান করা হল।

—আর দাক্রুজ?

—হাঁ দাক্রুজ। এটা হয়তো ইতিহাস বা কিংবদন্তী।

—তা হোক বল—

যারা যারা পারল আগেই পালাল।

রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে এগিয়ে চলেছে এক সার নৌকা। ছপ্-ছপ্-ছপ্, হচ্ছে দাঁড় ফেলার শব্দ। খুব ধীরে। সন্তর্পণে। একটা নৌকায় দাক্রুজ দু-চোখের জলে নাইছেন আর বলছেন—মা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

চোখ এড়াল না কাশেমের। তোপের গোলা বর্ষার ধারার মত এসে নৌকাগুলোকে আক্রমণ করল। কিছু ডুবল, কিছু পালাল। বাকীগুলোকে ঘেরাও করল মোগল বহর। নিয়ে চলল দরবারে, বিচার হতে।

বন্দী হলেন দাক্রুজ। মেরী মাতার মূর্তি হারিয়ে গেল।

ভক্ত দাক্রুজকে মুক্তি দিলেন বাদশাহ। হুকুম দিলেন আবার গীর্জা গড়ার।

চোখ দুটো ভরে উঠল জলে।

দাক্রুজ ফিরে এসে, গীর্জা গড়লো। মেরী মার কাছে প্রার্থনা জানালো—মা ফিরে এস। মা ফিরে এস। কি ভাবে তা জানিনা, তবে মা ফিরে এল। দাক্রুজ হু-হু-করে কেঁদে উঠলো।

নসু ও আর সবাই ফিরল—কিন্তু রসিক কুন্ডু—?

নসুর দুচোখ বেয়ে জল নেমে এল। না, রসিক কুন্ডুরা ফিরল না।—

দাক্রুজ আজ আর নেই, নেই হারমাদরা। জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খাঁ ছিলেন বাংলার সুবাদার। সেসময় ফিরিঙ্গী-মগ জলদস্যুদের সাহায্যে আরাকান রাজ বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ বার বার আক্রমণ করে লন্ড ভন্ড করে দিলে ইসলাম খাঁ রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় নিয়ে এলেন।

শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার হয়ে পর্তুগীজ-মগদের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ বাংলাকে রক্ষা করেন।



দেশপ্রেমিক ও দুঃসাহসিক জলদস্যু

কুমার মিত্র

উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেদিনকার আমেরিকার কোথাও তেমন মিল ছিল না। সবেমাত্র অনেকগুলি রাজ্য আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা অনেকটাই স্বাধীন। মার্কিনী আধিপত্য তেমন শেকড় গেড়ে বসতে পারেনি সে সব রাজ্যে। এমনই একটি প্রদেশ হল লুইজিয়ানা। মাত্র দশ বছর আগে এটি আমেরিকার দখলে আসে। এখানকার লোকেরা তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বদেশ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বাসিন্দারা বেশির ভাগই ফরাসী আর স্প্যানিশদের বংশধর, যারা সাধারণভাবে ক্রিয়োল নামে অভিহিত। এদের না ছিল ফ্রান্স বা স্পেনের প্রতি আনুগত্য, না নিজেদের আমেরিকাবাসী বলে ভাববার অভ্যাস। স্বতন্ত্র একটা জাত বললেই ঠিক হবে।

এহেন লুইজিয়ানা প্রদেশের গভর্ণর হয়ে এলেন উইলিয়ম ক্লেবোর্ন নামে একজন আমেরিকান। লুইজিয়ানায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকার প্রতি এখান কার অধিবাসীদের বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলার গুরু দায়িত্ব নিয়েই এলেন তিনি।

কিন্তু এসে অবিলম্বে বুঝতে পারলেন সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজটি তাঁকে করতে হবে তা হল জলদস্যু জাঁ লাফিৎকে শায়েস্তা করা। জাঁ লাফিৎ অভিজাত বংশের সন্তান, এক ফরাসী সামন্তের পুত্র। তাঁর চেহারা ও আচার-আচরণে জন্ম-আভিজাত্যের লক্ষণ এমনই পরিস্ফুট যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, সুশ্রী চেহারা, নরম আর বিনয়পূর্ণ কথাবার্তায় সকলকে সে মুহূর্তে বশ করে। নিউ অর্লিন্স তখন

লুইজিয়ানার উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর। সেখানকার অভিজাত সমাজে লাফিত্তের কদরের শেষ নেই। নিউ অর্লিন্সের রয়াল স্ট্রীটের জমকালো বিপণিগুলোয় যেসব বহুমূল্য রেশম-ভেলভেট, রুপোর পাত্র, মণিরত্ন আর দুর্লভ সুপেয় ব্র্যান্ডি পাওয়া যায় সেগুলোর সরবরাহকারী যে খোদ লাফিৎ সেকথা শহরের শিশুরা পর্যন্ত জানত। তবে শহরবাসীরা সব জেনেও চোখ বুজে থাকত। হুল্লোড়প্রিয় মানুষগুলো বিলাস-ব্যসনের উপকরণ পেয়েই খুশি। তার যোগান কিভাবে ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তারা বোধ করত না। প্রশাসনকে জানানোর কর্তব্যপালন তো অনেক দূরের কথা। উল্টে তারা যেন লাফিতের কাছে খানিকটা কৃতজ্ঞ। সে লাফিৎ নিউ অর্লিন্সে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত এই সাগর-সন্ত্রাস দস্যুরা ডাঙায় নিষ্কন্টক নয়, শত্রুপক্ষ থাকেই। মজার কথা, লাফিৎ তার ঘাঁটি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে, বিশেষ করে নিউ অর্লিন্সে প্রায় সকলের সম্মানের পাত্র।

গভর্নর ক্লেবোর্ন এসব যত দেখেন শোনেন ততই তাঁর রাগের মাত্রা চড়তে থাকে। চরিত্রে মানুষটা খাঁটি ঔপনিবেশিক, দেহের প্রতিটি ইঙ্গিতে শাসকের দম্ভ। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা তখনকার আমেরিকায় কোন নিরীহ লোককে দিয়ে গভর্নরের কাজ চলত না। যাই হোক, লাফিৎকে ধরবার প্রথম চেষ্টা হিসেবে ক্লেবোর্ন একটি নিরীহ পদ্ধতিই গ্রহণ করলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর নিউ অর্লিন্সের রাস্তায় রাস্তায় একটি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা দেখা গেল। তাতে ঘোষণা করা হয়েছে লাফিৎকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে ৫০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে সরকারের তরফ থেকে। বিজ্ঞপ্তির নিচে স্বয়ং গভর্নরের স্বাক্ষর।

মানুষ মাত্রেরই মিত্র এবং শত্রু থাকে। ক্লেবোর্ন ভেবেছিলেন মোটা অঙ্কের পুরস্কারের লোভে কেউ না কেউ টোপ গিলবে। পাঁচশো ডলারে কিন্তু কোন ফসলই ফলাল না। বরং বিজ্ঞপ্তির প্রচারের তিনদিন পরে এমন বিচিত্র একটি ঘটনা ঘটল তা গভর্নরের সম্মানের প্রতি একটা মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। গভর্নর নিজের চোখেই দেখলেন তাঁর দেওয়া বিজ্ঞপ্তির ওপর একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি সাঁটা হয়েছে যাতে লেখা, "গভর্নর উইলিয়ম ক্লেবোর্নকে যে ব্যক্তি লাফিতের কর্মকেন্দ্র গ্র্যান্ড আইলে সমর্পণ করতে পারবে তাকে ১৫০০ ডলার উৎকোচ দেওয়া হবে।"

কান্ডটা যে লাফিতেরই তাতে সন্দেহ রইল না গভর্নরের। জলদস্যুর ঘৃণ্য দুঃসাহস ও ধৃষ্টতায় ক্লেবোর্ন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কল্পনানেত্রে দেখতে পেলেন এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিউ অর্লিন্সবাসীদের ঠোঁটগুলোয় কৌতুকের হাসি উপচে পড়ছে। স্বাভাবিক। তারা তো এরকমটাই চায়।

বিজ্ঞপ্তির মধ্যে যে গ্র্যান্ড আইলের কথা ছিল সেটাই ছিল লাফিতের মূল ঘাঁটি। বারাটারিয়া উপসাগরের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ওই গ্র্যান্ড আইল। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত স্থানটি জলদস্যুদের আস্তানা হিসেবে একেবারে আদর্শ। সামনেই অসীম সমুদ্রের বিস্তার যা আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনীয়, ব্রিটিশ আর আমেরিকান পণ্যবাহী জাহাজগুলোর নিয়মিত এখান দিয়ে আনাগোণা। লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে লাফিতেরও কোন বাছ-বিচার নেই, মার্কিন জাহাজকেও ছেড়ে কথা কয় না। গভীর দরিয়া থেকে অজস্র খাঁড়ি আর লেগুনের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট নৌকাযোগে লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্র্যান্ড আইলে আনাই তার পদ্ধতি। পদ্ধতিটায় চাতুর্য নেই, তার দরকারও নেই। সারা পথটাই খাঁড়ি আর হ্রদের এমন গোলকধাঁধা যে তার রহস্য উদ্ধার কেবল ঝুণো জলদস্যুরাই করতে পারে। গোটা গ্র্যান্ড আইল ঢেকে আছে বেত লতাপাতা এবং সাইপ্রেস গাছের দুর্ভেদ্য ঝোপে। এর মধ্যে লুঠের জিনিস গোপন রাখাও সহজ কাজ। তারপর সেসব সামগ্রী চড়া দামে কালোবাজারি করার স্বর্গরাজ্য নিউ অর্লিন্সে পাঠিয়ে দিতে কতক্ষণ!

জাঁ লাফিৎ পণ্য দ্রব্য হিসেবে আফ্রিকার কালো মানুষদেরও রেহাই দিত না। মার্কিন সরকার তখন আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। ফলে বাগিচা অঞ্চলে শ্রমিক ঘাটতির সমস্যা প্রবল। লাফিৎ এ সুযোগ ছাড়ে কেন? স্পেনের বাণিজ্য তরীগুলোয় নিগ্রো দাসেরা কাজ করত। এরকম একটা জাহাজ কব্জা করতে পারলে মোটা মুনাফা। কালো একটি শরীরের দাম ছিল পাউন্ড প্রতি এক ডলার। সুতরাং একটা দশাসই নিগ্রোর দাম দেড়শো থেকে দুশো ডলার। এই অভিনব পশরার চাহিদা তখন আমেরিকায় প্রচুর।

বিশেষ করে এই মানুষপণ্যের ব্যবসার জন্য জাঁ লাফিতের ওপর সৎ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নর ক্লেবোর্ণের ঘৃণার অন্ত ছিলনা। কিন্তু প্রশাসন তো শুধু গভর্নরকে দিয়ে গড়া নয়। তাঁর কর্মচারীদের মনস্তত্ত্ব যে আলাদা। হয়তো একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে সদলবলে পাঠানো হল জাঁ লাফিৎকে ধরতে। অফিসার লাফিতের বিলাসবহুল আপ্যায়ন আর বিপুল উপঢৌকনে তৃপ্ত হয়ে শূন্যহাতে ফিরে এলেন, আর এসে বললেন, 'জলদস্যু কোথায়, লাফিৎ তো পারফেক্ট জেন্টলম্যান। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ওর গায়ে হাত তোলার কথা ভাবাই যায় না গভর্নর!

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং ভাল ভাল খানাপিনা খেয়ে আর খাইয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল লাফিতের। ক্লেবোর্ণের মত দক্ষ প্রশাসকও ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছিলেন না। এমন সময় বিশেষ একটি ঘটনা ওর গতানুগতিক জীবনে কিছুটা পালা বদল ঘটাল।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। সালটা ১৮১২,

যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ। ইংরেজদের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। এই সময় একদিন ব্রিটিশ সম্রাটের যুদ্ধ জাহাজ 'সোফিয়া' নীল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত গ্র্যান্ড আইলের তটরেখায়। নোঙর করল জাঁ লাফিতের ঘাঁটিতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লাফিৎকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাফিৎ, তুমি একজন পাইরেট হলেও তোমার সাহস এবং বীরত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি আমি। ইংরেজ সরকার তোমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চায়। আমরা নিউ অলিন্স বন্দর থেকে মার্কিন আধিপত্য উচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক। আমাদের সম্রাটের পক্ষে তুমি যদি যোগ দাও তবে উচ্চ রাজকীয় সম্মান আর সামরিক পদ পাবে। অন্যথায় তোমার এই ঘাঁটি কামান দেগে উড়িয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। কোনটা চাও বল।'

লাফিৎ মৃদু হেসে নরম গলায় বলল, 'অধমের ওপর মহামান্য ইংলন্ডেশ্বরের অসীম দয়া। কিন্তু একটু ভেবে দেখতে সময় দিতে হবে। দলের লোকজনদের সঙ্গেও আলোচনা করা দরকার।'

ক্যাপ্টেন উদারভাবে হাসলেন, 'সে ঠিক কথা। তবে বেশি সময় তো দেওয়া যাবে না।'

লাফিৎও সৌজন্যসূচক হাসি হাসল, 'বেশি সময় নেবোও না আমি।' ওর হাসিটা যে ক্রমশঃ বাঁকা হাসিতে পরিণত হল সেটা বোধহয় লক্ষ্যও করলেন না আত্মতুষ্ট ইরেজ ক্যাপ্টেন।

লাফিৎ নিলও না বেশি সময়। ওর একটি গোপন পত্র নিয়ে একখানা দুরন্তগতি নৌকা কখন যে গভর্নর ক্লেবোর্ণের কুঠিতে বিশেষ সংবাদ পৌছে দিতে ধেয়ে গেল 'সোফিয়ার'-র ক্যাপ্টেন তা টেরও পেলেন না। ক্যাপ্টেন মহোদয় যখন পা দোলাতে দোলাতে হাভানা চুরুটে সুখটান দিচ্ছেন ততক্ষণে গভর্নর ক্লেবোর্ণ লাফিতের দূতের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে জানতে পেরে গিয়েছেন ইংরেজদের আক্রমণ পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি। চিঠিতে এটাও পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে আমেরিকা আর ইংলন্ডের বিবাদে লাফিৎ আমেরিকার পক্ষেই অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।

লাফিতের এই অপ্রত্যাশিত উদারতায় গভর্নর ক্লেবোর্ণের মুগ্ধ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ক্লেবোর্ণ মানুষটার চরিত্রের কাঠামো অন্য ধরণের। লাফিতের পত্রের যে উত্তর গভর্নরের কাছ থেকে প্রেরিত হল তা হল আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত একটি নৌবহর। আইন অমান্যকারীর সাহায্য নিতে আদৌ প্রস্তুত নন তিনি। ক্লেবোর্ণের নৌসেনা লাফিতের ঘাঁটি তছনছ করে দিল আগুন এবং বুলেটে।

মেজর জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন তখন নিউ অরলিন্সের প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত। সব ঘটনা শুনে তিনি গভর্নরকে বললেন, 'আইন ভঙ্গকারীদের সঙ্গে কোন রফা নয়। লাফিতের সঙ্গে সঙ্গত ব্যবহারই করেছেন আপনি।'

তা বলুন, এদিকে তখন আন্ড্রু জ্যাকসনের সময়ও ভাল যাচ্ছে না। নিউ অর্লিন্সের প্রতিরক্ষায় সুবন্দোবস্ত তেমন করে উঠতে পারেন নি তিনি। প্রয়োজনীয় সমরোপকরণের অভাব, অভাব গোলন্দাজ সৈন্যের। সুগঠিত ইংরেজ নৌবহরের তুলনায় আমেরিকার নৌসেনা বড়ই দুর্বল। নিউ অর্লিন্সের পতন অনিবার্য। এদিকে খবর এসেছে দুর্ধর্ষ নৌ-সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড পাকেনহাম সুশিক্ষিত চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে লুইজিয়ানা দখল করতে বেরিয়ে পড়েছেন।

শিবিরে বসে জেনারেল জ্যাকসন ক্রোধে ক্ষোভে অসহায়তার যন্ত্রণায় মাটির পাইপ কামড়ে গুঁড়ো করার উপক্রম করছেন অথচ ইংরেজদের মোকাবেলা করার কোন উপায় বের করতে পারছেন না, এমনি সময়ে একদিন প্রহরী খবর নিয়ে এল এই মুহূর্তেই একজন আগন্তুক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, খুবই নাকি জরুরী দরকার।

দরকারটা কার? তার, না আমার?' জেনারেলের ভ্রূ কুঞ্চিত, স্পষ্টতই বিরক্ত তিনি। প্রহরী সবিনয়ে জবাব দিল, 'লোকটা বলছে দরকার আপনার।'

'বলে দাও দেখা হবে না।' নিজের দুশ্চিন্তায় পাগল জেনারেল এই বলে ব্যাপারটার ওখানেই নিস্পত্তি ঘটাবার তালে আছেন এমন সময় সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিই শিবিরে ঢুকে পড়ল সামরিক আইনের তোয়াক্কা না করে। ছ' ফুটের ওপর লম্বা, ঋজু ইস্পাত-কঠোর শরীর, রোদপোড়া রঙ সত্ত্বেও সুন্দর আভিজাত্যমন্ডিত মুখ। পরনে জলপাই রঙের পোশাক। মাথায় চামড়ার তৈরী কপাল ঢাকা টুপি। সব মিলিয়ে আগন্তুক বেশ আকর্ষণীয়। লোকটির ভাবভঙ্গি যে কোন ব্যারণ বা কাউন্টের মত। মার্জিত অথচ উদ্ধত। একজন জেনারেলও তার চোখে যেন সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

নবাগতের ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে জ্যাকসন শুধোলেন, 'তুমি জানো এভাবে বে-আইনী ঢুকে পড়ার জন্যে তোমাকে শাস্তি দেওয়া চলে?'

আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, 'চলে। আর সেটা জানি না তাও নয়। তবে জরুরি অবস্থায় এতসব নিয়ম মানতে গেলে চলে না, কাজের ক্ষতি হয়। আপনি আমায় তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন, নয় কি?'

উদ্যত ক্রোধ দমন করে জ্যাকসন বললেন, 'কাজটা কি তা বলো। তার আগে বলো তোমার পরিচয় কি?'

আগন্তুকের মুখের একটা রহস্যময় কৌতুকহাসি ফুটে উঠল, 'আমাকে আপনার চেনা উচিত ছিল মিঃ জ্যাকসন। গভর্নর ক্লেবোর্ণ আমারই মাথার দাম ঘোষণা করেছিলেন পাঁচশো ডলার।'

অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মুখে যুগপৎ মেঘ আর রোদের খেলা খেলে গেল, 'জাঁ লাফিৎ?'

আগন্তুক মাথা থেকে টুপি নামাল, 'সশরীরে।'

জ্যাকসনের পাইপে তার ঝকঝকে দাঁতের সারি চেপে বসল কঠিনভাবে, 'তুমি জানো এখান থেকে পালানোর উপায় নেই তোমার। গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে কয়েক সেকেন্ড খরচ হবে না।'

জাঁ লাফিৎ অসহিষ্ণুভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, 'আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন জেনারেল। স্বেচ্ছায় ধরা দেবার বাসনা নিয়ে আসি নি এখানে। আমেরিকার দুর্দিনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এখানে আসা। নৌযুদ্ধে আমার চেয়ে ভাল সাহায্য কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। আমেরিকান না হলেও এখন থেকে আমেরিকাই আমার স্বদেশ। আমার সব অস্ত্র-শস্ত্র, জাহাজ, লোকজন আমেরিকার সেবার জন্যে প্রস্তুত। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমার গ্রেপ্তারের কথা বলছিলেন, সেটা যে শর্তে সম্ভব হতে পারে সেটা আপনার জীবনদান। আমি বন্দী হতে পারি, কিন্তু আপনিও বেঁচে থাকবেন না। কিন্তু দেশের সঙ্কটকালে আমরা উভয়েই সুবিবেচনার পরিচয় দিলে ভাল হয় নাকি?

জেনারেল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গীতে বললেন, 'তোমার কোন শর্ত আছে?'

'না। আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। এই সেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমা কিংবা সামরিক পদমর্যাদা কিছুই চাই না।'

'গভর্নর ক্রেবোর্ণ তোমার ঘাঁটির ক্ষতি করেছেন। এরপরও সাহায্য করতে চাও আমাদের?'

'গভর্নর কামান দেগে ঘাঁটি উড়িয়ে দিলেও তাই চাইতাম।'

জেনারেলের নীল ধূসর চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নরম হয়ে এল, 'বেশ তাই হবে। তোমার সাহায্য নেবো আমরা।'

আমেরিকার চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য নিয়েও ইংরেজরা সেবার হেরেছিল। তার মূলে জাঁ লাফিৎ আর তার দলবলের কৃতিত্ব কতখানি সেটা আমেরিকার ইতিহাসে সসম্মানে লিখিত হয়েছে। লাফিৎ আর তার ভাই পিয়ের, দলের ডোমিনিক ইউ, গ্যাম্বী রেণে বেল্যুঁশ ইত্যাদিরা নৌযুদ্ধ এবং গোলন্দাজী যুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে আমেরিকার ভাগ্যের চাকা বেমালুম ঘুরিয়ে দিল। ইংরেজরা জাঁ লাফিৎকে দলে টানার জন্যে যে ঐশ্বর্য দিতে চেয়েছিল তাতে সে বাকি জীবনটা দাঙ্গাবাজি না করে কুবেরের মহিমায় কাটাতে পারত। কিন্তু লাফিৎ তাদের উৎকোচের হাতটাকে সবলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। এখানে বলা দরকার যে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পামারস্টোনসহ ১৪০০ ইংরেজ নিহত হয়েছিল, অপর পক্ষে আমেরিকার মাত্র ১৩ জন। সামুদ্রিক লড়াইয়ে লাফিতের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাই এর কারণ।

বিনিময়ে লাফিৎ ও তার দলবল পেল গভর্নরের ক্ষমা এবং বিজয়োৎসবে পূর্ণ মর্যাদায় যোগদানের অধিকার। এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন

রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় হিসেবে লাফিৎ ও তার সঙ্গীদের ওপর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমাও প্রদর্শন করলেন।

এই ঘটনার পর লাফিতের ভাগ্যের ধারা বদলে যেতে পারত, সে ফিরে আসতে পারত ভদ্র নাগরিক জীবনে। কিন্তু বিধাতা যেভাবে তাকে গড়েছেন সে তো আসলে তাই। নীল দরিয়ার ডাক আর পণ্যবাহী জাহাজগুলির ইশারা অগ্রাহ্য করার সাধ্য কোথায় তার? আবার তার মাথার খুলি আঁকা পতাকা ওড়ানো ক্ষুদে ক্ষিপ্র জাহাজগুলো ভেসে গেল দূর সমুদ্রপানে, শুরু হল অবাধ লুঠতরাজ।

এদিকে তখন সাগর-সন্ত্রাস দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে সমুদ্রবাণিজ্য নিষ্কন্টক করার জন্য স্পেন ইংলন্ড এবং আমেরিকা সংঘবদ্ধ হয়েছে। বারাটরিয়া উপসাগরের গ্র্যান্ড আইল আক্রান্ত হল। প্রিয় বাসভূমি ত্যাগ করে লাফিৎ পালাল এবং উপনিবেশ স্থাপন করল গ্যালভেস্টন দ্বীপে। সেখানেও হামলা চালাল আমেরিকান জাহাজ 'লিঙ্কস'। লাফিৎকে স্থান ত্যাগের আদেশ দেওয়া হল। লাফিৎ তা মেনে নিল, কারণ দেশদ্রোহী সে হবে না কিছুতেই। তারপর নিজের হাতে গ্যালভেস্টন জ্বালিয়ে দিয়ে ভেসে পড়ল অকূল সাগরে।

পেছনে পড়ে রইল কিছু গল্প আর কিংবদন্তী যা জলদস্যুদের জড়িয়ে চিরকালই থাকে। গ্র্যান্ড আইলের বেত আর সাইপ্রেস ঝোপের গভীর নিম্নে যদি জমে থাকে বহু বর্ষ ধরে গড়ে তোলা রত্ন-সম্পদের ভান্ডার তো তা পাহারা দেবার জন্যে রইল কিছু সামুদ্রিক লিলিফুল এবং সিন্ধুশকুনের ঝাঁক। আর জাঁ লাফিতের কীর্তিগাথা প্রচারের ভার নিল সাগরের অশান্ত বাতাস এবং দুর্দম তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

গ্যালভেস্টন ত্যাগের পরবর্তীকালে লাফিতের গতিবিধি সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার চিরকালের মত গ্রাস করেছিল তাকে। কিন্তু আমেরিকাবাসীর স্মৃতিপটে আজো সে মুখর বৃত্তান্ত। কারণ এমন একটা কাজ এই আইনবিরোধী দুর্বৃত্ত করেছিল যা জলদস্যু পরিচয়ধারী পাষন্ডরা সাধারণত করে না। সেটা হল তার দেশপ্রেম। নিউ অর্লিন্সের যাদুঘর লাফিৎকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তার তরবারিটিকে স্মারক হিসেবে রক্ষা করে। এটি সে ব্যবহার করেছিল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে।

জলদস্যুতার দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক নামই নানা কারণে অমর হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ড্রেক কিংবা ভাস্কো-ডা-গামার মত অনেক সমুদ্র-অভিযাত্রীই ছিলেন মূলত জলদস্যু। বিশ্বে তারা বিশ্রুত নামা। সে হিসেবে জাঁ লাফিৎ প্রসিদ্ধি পান নি। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে তার স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা আছে। দেশপ্রেমিক ও দুঃসাহসী জলদস্যু হিসেবে সে প্রবাদ-পুরুষ। উঁচু দরের গ্রন্থেও বহুল আলোচিত।



মরণের কবল হ'তে সোনার খনিতে

সত্যব্রত ভঞ্জ চৌধুরী

উত্তর আমেরিকার সুবিশাল প্রান্তর শত শত মাইল বিস্তৃত, আয়তন তার বিরাট, নাম প্রেইরী। এখন এর পূব অংশে কলের লাঙ্গলে গমের চাষ হয়, কিন্তু পশ্চিমভাগে কোন চাষ-বাস হয় না। সেখানে বৃষ্টি অল্প, সেজন্য বড় গাছ জন্মায় না, শুধু ঘাস আর ছোট ছোট ঝোপ। অসংখ্য গরু বাছুর দিগন্তব্যাপী ফাঁকা মাঠে চরে বেড়ায় আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাখালরা তাদের সঙ্গে দিনের পর দিন শত শত মাইল ঘুরে বেড়ায়, কোন গ্রাম নেই, গোয়াল নেই, যেখানে রাত হয়, সেখানেই তাঁবু খাটিয়ে তারা ঘুমায়। বছরে একবার, বাছুর জন্মাবার সময়ের ঠিক পরেই মালিকরা গরুগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে নিজ নিজ চিহ্ন নতুন বাছুরদের গায়ে দেয়। তারপর মোটা-সোটা কিছু গরু বাছাই করে শহরে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু কোন সময়েই দুধ দোয়া হয় না।

এক একটি বিরাট এলাকা নিয়ে এক একজন মালিকের গোচারণ মাঠ। সে সকল মাঠের সীমানায় কোন বেড়া নেই, কোন পাহারা নেই। কিছু জমিতে চাষ করে নিজেদের প্রয়োজন মতো ফসল ফলানো হয়, বিক্রি করার জন্য নয়। এই এলাকায় কোন শহর, গ্রাম বা লোকবসতি নেই। সেই সামান্য চাষের জমির লাগোয়াই খামারবাড়ি, সেখানেই মালিক সপরিবারে বাস করেন। খামারবাড়ি, গোচারণ-মাঠ ও গরুর পাল সবসুদ্ধকে বলা হয় 'র‍্যাঞ্চ'। খামারবাড়িতে মুরগীও পালন করা হয়।

অনেক দিন আগে, যখন ইউরোপীয়রা সবেমাত্র এই সুবিশাল প্রান্তের পূব সীমানায় বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল, সমস্ত দেশটা যখন আবিস্কৃত হয়

নি. আর রেড ইণ্ডিয়ানরা যখন দলে দলে এখানে ওখানে বাস করত. তখন ছল মার্লে নামে একটি ছেলে তার বাবা-মার সঙ্গে নিজেদের র‍্যাঞ্চে বাস করত। তাদের র‍্যাঞ্চটি ছিল একেবারে শেষ প্রান্তে. তার পরেই ছিল অজানা প্রেইরী. সেখানে তখনও কোন সভ্যলোক যায় নি।

সামারী নামে তাদের এক প্রতিবেশী রেড ইণ্ডিয়ান সেই অজানা পশ্চিম অঞ্চল থেকে একটি প্রকাণ্ড বুনো ঘোড়া ধ'রে এনেছিল। ঘোড়াটিকে দেখে মার্লের খুব পছন্দ হল। সে তার বাবাকে অনুরোধ ক'রল ঘোড়াটি কেনার জন্য। কিন্তু তিনি বললেন, "বাজার বড় মন্দা. দামী ঘোড়া কেনার মতো অবস্থা এখন আমাদের নয়।" তবুও মার্লে আশা ত্যাগ ক'রল না।

একদিন সে সামারীর বাড়িতে সেই সুন্দর ঘোড়াটিকে দেখতে গেল। তার আগ্রহ দেখে সামারী জিজ্ঞাসা করল. "তুমি কি ঘোড়াটি কিনতে চাও?" সে বিষণ্ণভাবে বলল. "না. বাবার কাছ হতে টাকা বার করা আজকাল বড় সহজ নয়। বিশেষ ক'রে তুমি যে চড়া দাম চাচ্ছ. সে দাম কোন বুনো ঘোড়ার হতে পারে না। কিন্তু যদি তুমি আমাকে ঘোড়াটি চড়তে দাও, এবং যদি ঘোড়াটি আমার পোষ মানে, তখন আমি তাকে আমাদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখাতে পারি। বাবার পছন্দ হলে তিনি তোমার সঙ্গে দর-দামের কথা কইবেন।"

একটু ইতস্ততঃ ক'রে রেড-ইণ্ডিয়ানটি বলল, "খুব সাংঘাতিক বুনো জানোয়ার। আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ এর পিঠে চড়ে নি।"

যা হোক্ ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল যে, ছোট্ট একটি টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে মার্লে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, তার হাতে একটি লম্বা দড়ি, তাতে বাঁধা আছে বুনো ঘোড়াটি। ঘোড়াটি ফোঁস্ ফোঁস্ করে নাক ফুলিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছিল আর পাগলের মতো চোখ বড় বড় করে ঘোরাচ্ছিল। ক্রমে সে একটু শান্ত হয়ে এল, যেন ছেলেটির সঙ্গে তার বেশ পরিচয় হয়ে গেছে।

লোকালয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে, চারদিকে ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু জমি, তারই মাঝে একটু নিচু সমতল জায়গায় মার্লে থামল ও নিজের টাট্টু ঘোড়াটির গা চাপড়ে আদর করতে করতে মিষ্টি সুরে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। থলে হতে কিছু মুখরোচক ও সুগন্ধি খাবার বা'র করে তাকে খাওয়াতে লাগল। তার সুগন্ধ বুনো ঘোড়াটির নাকে লাগল, সে এগিয়ে এল। একটু পরে সে ভীতভাবে ছেলেটির হাত হতে খাবার ছিনিয়ে নিল। কিন্তু

মার্লে তার নাকে আদর করে হাত দিতেই সে ফোঁস ফোঁস করে পিছিয়ে গেল।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, শান্ত ও দৃঢ়ভাবে ছেলেটি তাকে পোষ মানাবার চেষ্টা চালিয়ে গেল। শেষে বুনো ঘোড়াটি তার মাথায় হাত বুলাতে দিল, ছুঁলেই যে সে চমকে যেত সে ভাব তার চলে গেল। এমন কি ছেলেটির হাত হতে সে ধীরে সুস্থে খাবার খেতে লাগল। প্রথম দিনেই তার ভয় কিছুটা ভেঙ্গে গেল। সন্ধ্যায় তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে এল।

এরপর হতে দিনেরপর দিন মার্লে ঘোড়াটিকে সেখানে নিয়ে যেত। তিন সপ্তাহ পরে সামারী দেখল যে, ঘোড়াটি আপনা আপনিই মার্লের পিছন পিছন যাচ্ছে ; দড়ি দিয়ে সে বাঁধা নেই। সামারী অবাক হয়ে গেল, কিন্তু আরও অবাক হল সে মার্লের কথা শুনে। মার্লে বলল, "আগামীকাল আমি ঘোড়াটিতে চড়ব।"

পরদিন মার্লে, মৃদুভাবে কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে নিজের টাট্টু ঘোড়ার পিঠের জিন হতে বুনো ঘোড়ার খালি পিঠের উপর চড়ে ব'সল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল, তারপর হঠাৎ পিঠটি ধনুকের মতো বেঁকিয়ে, চার পা এক সঙ্গে তুলে লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠে, পিছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে, নানান কায়দায় মার্লেকে মাটিতে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল ও নাকে বিশ্রী আওয়াজ করতে লাগল।' পাথরের মেঝের উপর কাঁচের গুলি যেমন লাফায়, সেও তেমনি লাফাতে লাগল। জিন্ নেই, লাগাম নেই, তবুও ছেলেটি পড়ল না। তারপর চিৎকার করে ঘোড়াটি মাটিতে গড়াগড়ি খেল। ঘোড়াটি খুবই চটপটে বটে, ছেলেটি কিন্তু আরো বেশী। চট্ করে লাফিয়ে পড়ে মার্লে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ঘোড়টি গড়াগড়ি খেয়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সেও আবার তার পিঠে চেপে বসল। তারপর মাইলের পর মাইল অশান্ত ঘোড়াটি তাকে নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চল্‌ল।

ভাল ঘোড়ারা কখনই সহজে পোষ মানে না। এরপর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় তাদের দু'জনকে অতি ক্লান্ত হয়ে সামারীর আস্তাবলে ফিরতে দেখা যেত। কিন্তু মার্লে কখনই নিজের ইচ্ছামতো ঘোড়াটিকে ছোটাত না, তারই ইচ্ছা মত তাকে যেতে দিত। ফলে, মার্লের ডাকে সে সাড়া দিত, কাছে আসত। মার্লে নিজে ছিল স্বাধীনতা প্রিয়, সেজন্য সে বুঝ্‌তে পারত ঘোড়াটির মনের কথা। সীমাহীন বিশাল প্রান্তরে যে জন্মেছে, খেয়াল খুশীমতো ঘুরে বেড়িয়েছে, তাকে কি তার ইচ্ছামতো চলতে দেওয়া উচিত নয়?

ঘোড়াটিকে কেনার জন্য মার্লে আবার তার বাবাকে অনুরোধ ক'রল কিন্তু এবারও তিনি অমত করলেন।

ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে সামারী বুনো ঘোড়াটি চড়ে প্রেইরীতে অতি দীর্ঘ পথ ঘুরে আসত। রেড ইণ্ডিয়ানরা ঘোড়ার কিছু বোঝে না, তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার ক'রে থাকে, সামারীও তাই ক'রত।

একদিন মার্লে তার ছোট্ট টাট্টুঘোড়ায় চড়ে বাড়ি থেকে বহু দূরে গিয়ে জনমানবহীন ঢেউখেলানো প্রান্তরে ঘোড়াসমেত পড়ে গেল। টাট্টুটি মারা গেল। কিন্তু মার্লের আঘাত লাগল সামান্যই। ক্রমে রাত হয়ে আসতে লাগল, বাড়ি ফেরার পথ খোঁজার জন্য এদিক ওদিক চলতে চলতে সে হঠাৎ সামারীকে মাটিতে মরে পড়ে থাকতে দেখ্‌ল। আর দেখ্‌ল ঘোড়ার খুরের দাগ। দেখল রেড-ইণ্ডিয়ানটার গায়েও ঘোড়ার খুরের রক্তাক্ত আঘাতের চিহ্ন। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে, সামারীকে ফেলে দিয়ে বুনো ঘোড়াটি পালিয়েছে।

সেখান থেকে সে চলে যাচ্ছিল, এমন সময়ে হঠাৎ শুনতে পেল উচ্চ আর্তনাদ। তার মনে হ'ল সারা ত্রিভুবন যেন সেই আর্তনাদে ভরে গেল। তার ভিতর থেকে কে যেন বলল, 'শুনছ না? নেকড়ের দল চিৎকার করছে। তারা তোমার গায়ের গন্ধ পেয়েছে, তোমাকে শিকার করার জন্য তোমাকে খুঁজছে! আর রক্ষা নেই!'

মার্লে চারদিক তাকিয়ে দেখল, সত্যই কোন উপায় নেই! নেকড়েরা এসে পড়লে রিভলবার দিয়ে বড়জোর কয়েকটিকে মাত্র সে মারতেপারে,তারপর? শেষ পরিণতি তো বোঝাই যাচ্ছে! দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরে এখানে ওখানে ছোট ছোট সামান্য ঝোপ-ঝাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। চারদিক শূন্য, কেউ কোথাও নেই! তার জীবনের এখন আর কি মূল্য আছে!

হঠাৎ এ কিসের আওয়াজ পাওয়া গেল! তবলার চাঁটির মতো দ্রুত তালের আওয়াজ! ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ না! হাঁ, এবার সে ভালভাবে বুঝ্‌তে পারল। মনে পড়ল যে, ছোটবেলায় সে শুনেছিল, সওয়ারী মরে গেলে ঘোড়া তাকে পথে ফেলে একা বাড়ি ফেরে না। এমন কি যদিও সে সওয়ারীটিকে ঘোর অপছন্দ ক'রে, তবুও না। সে সেই জায়গার আশেপাশে ঘুরতে থাকে। একসঙ্গে বাড়ি ফেরার অভ্যাস তার এমন বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তার ফলে একা ফিরতে সে সাহস করে না। একা ফেরার কি কারণ? কি কৈফিয়ত সে দেবে?

মার্লে বুনো ঘোড়াটিকে আদর করে 'রাজা' বলে ডাক'ত। এখন সে হাতভালি দিয়ে 'রাজা, রাজা' ব'লে খুব চিৎকার ক'রে সুর ক'রে ডাক্‌তে লাগ্‌ল যেমন করে সে আগে ডাক্‌ত। আবার সে নেকড়েদলের গর্জন শুনতে পেল, ভাবল তারা রাজার পিছনেই ধাওয়া করেছে। এমন তেজী বুনো ঘোড়াকে তাড়া ক'রে কোন কালেই যে তারা তাকে ধরতে পারবে না, একথা মনে করে এত দুঃখের মধ্যেও তার হাসি পেল। এই অন্তহীন ফাঁকা মাঠে এমন তেজী ঘোড়াকে তাড়িয়ে ধরা তো একেবারেই অসম্ভব।

সে বার বার ঘোড়াটিকে ডাকতে লাগ্‌ল। তার মনে হল তাকে যেন পূবদিকের ঝোপের আড়ালে মুহূর্তের জন্য দেখা গেল। তারপর ক্রমে তাকে এগিয়ে আস্‌তে দেখা গেল। হাওয়ায় তার কেশর ও লেজ যেন উড়ছে। নেকড়েদের চিৎকার সেও নিশ্চয়ই শুনছে, কিন্তু সে তো তাদের গ্রাহ্য করে না, ঝড়ের বেগে চল্‌বার নিজ শক্তিতে তার বিশ্বাস আছে, নেকড়েরা তাকে ছুঁতেও পারবে না। সে সোজা মার্লের কাছে এল, তাতে মনে হয়, সে তার ডাক শুনেই এসেছে। এবার সে মার্লের চারদিকে ঘুরতে লাগ্‌ল, আর ভয়াবহ নেকড়েদলের চিৎকার এগিয়ে আসতে লাগ্‌ল।

হাত বাড়িয়ে ছেলেটি, 'রাজা, রাজা' বলে বারবার ডাক্‌তে লাগ্‌ল। হতাশায় পাগল হয়ে হয়তো সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটিকে ধরার চেষ্টা ক'রত ; কিন্তু তার খেয়াল হ'ল যে বুনো ঘোড়াটি তাতে ভয়ে চমকে গিয়ে পালাতে পারে। সে নিজে এসে ধরা না দিলে তাকে ধরা তো মানুষের সাধ্যের বাইরে।

মার্লে ভাবল, 'ঘোড়াটির ভাব দেখে কি মনে হয়? সে কি আমার বিপদের কথা টের পেয়েছে?' যেদিক থেকে সেই ভয়ঙ্কর গর্জন আস্‌ছিল, সেদিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ ঘোড়াটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মার্লে শান্তভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে, সবলে তার ঘাড়ের কেশর ধরে ফেলল, আর মুহূর্তমধ্যে তার পিঠে চড়ে ব'সল। ঝড়ের বেগে তারা চলতে লাগ্‌ল, তাদের পিছনে ধূলার মেঘ উড়তে থাকল, নেকড়ের দল পেছিয়ে পড়ল কোথায়!

সারারাত ধরে তারা চলল। দারুণ ক্লান্ত হলেও সে কোনরকমে ঘোড়ার পিঠে বসে রইল। ভোরবেলা একটি ছোট নদীর ধারে নেমে পড়ে সে মুখ ধুয়ে ও জল খেয়ে সুস্থ হল।

এ অঞ্চলটি তার একেবারেই অচেনা, কোথাও মানুষের বসবাসের বা চলাচলের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু ধূ-ধূ করছে মাঠ আর ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়।

সারারাত ধরে তারা যে কোন্ দিক্ পানে ছুটে এসেছে তা সে আন্দাজ করতে পারল না। যতদূর পথ হারানো যায়, তা সে হারিয়েছে।

সে ভাবল, ঘোড়ায় চড়ে চলতে থাকা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। তাতেই যদি ভাগ্যক্রমে কোন উপায় হয়, লোকালয়ে ফেরার। কিন্তু সে আশা খুব কম, কারণ তাদের নিজেদের র‍্যাঞ্চ থেকে ত্রিশ মাইলের মধ্যে আর কোন র‍্যাঞ্চ ছিল না ; আর তাদের র‍্যাঞ্চটিই হ'ল সবচেয়ে পশ্চিমে, আর তার পশ্চিমে সীমাহীন অজানা প্রেইরী।

দুপুরের দিকে তার মনে হ'ল ঘোড়াটি যেন কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থলে চল্‌ছে : হয়তো তার আপন দেশে, জন্মভূমিতে, যেখানে তার আপনজনরা বুনো অবস্থায় দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে। যে জায়গাটা হয়তো লোকালয় হতে বহু, বহু দূরে। তার বলার কিছুই ছিল না, কেননা সে নিজে তো আর পথ চিনতে পারছে না।

সন্ধ্যার সময় মার্লে যখন ক্লান্তিতে ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার মতো হল তখন ঘোড়াটি একটি ছোট্ট নদীর ধারে এসে থামল। সামনেই নদীর পাড়ে একটি রেড ইণ্ডিয়ানদের কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরটি যে রেড ইণ্ডিয়ানদের তা সে বুঝল ঘর তৈরির কায়দা দেখে। তারা ঘরের তিন দিকের দেওয়াল তৈরি করে, আর এমন জায়গায় ঘরটি করে যে চতুর্থ দেওয়ালটি তৈরি করার কোন দরকার হয় না, সে দিকে থাকে উঁচু নদীর পাড়। এতক্ষণে বোঝা গেল, এখানে আসার জন্যই ঘোড়াটি দিবারাত্র চলেছিল।

ঘোড়া থেকে নেমে সে দরজার কড়া নাড়তে লাগ্‌ল। কারোর সাড়া নেই। দরজার কাছে বালিভরতি একটি প্যান দেখতে পেয়ে সেটিকে সে তুলল। বেজায় ভার। দেখে সে তো অবাক। দেখে বালি কোথায়? এ যে হল্‌দে গুঁড়ো সোনা!

সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। মাত্র বিশ হাত দূরে ছোট্ট নদী, আর সেখান থেকেই বালি ধুয়ে এই সোনা পাওয়া গেছে। সে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল, দেখল, গম ও অন্যান্য খাবার জিনিস সাজানো আছে। সজারুর কাঁটা সাজানো একটি বেল্ট দেখে সে চিনতে পারল, সেটি সামারীর। সামারীর একটি শিকার করার ছোরাও সে চিন্‌তে পার্‌ল।

তা হলে সামারীই কি এখানে আস্‌ত? এটা কি তা হলে সামারীর কুঁড়ে, সে যে কখনও সপ্তাহের পর সপ্তাহের জন্য উধাও হয়ে যেত, সে কি তবে এখানে আসার জন্য? এই ছোট্ট নদীতে যে সোনা পাওয়া যায়, একথা কি

সে একাই জানত? সকলে বলাবলি করত, সামারীর অগাধ ঐশ্বর্য ছিল, এ কথা সে এতদিন গুজব মনে করত, এখন বুঝা গেল, কোথা হতে তার আয় হ'ত। ও! অজানা স্বর্ণখনি!

সামারী তো মরে গেছে, খনির আর কোন দাবিদারও নেই। কেউ কখনও এই সোনার খনিটি আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করে নি, এখন যে সোনার খনি খুঁজে পাবে, তারই হবে। মার্লে পেয়েছে, অতএব এটা মার্লের। কপাল-জোরে সে যে শুধু সামারীর ঘোড়াটি পেয়েছে তা নয়, সামারীর সোনার খনিও পেল। খনিটি কত বিরাট তা দেখার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তখনই তা না করে সে বুদ্ধিমানের মতো ভর-পেট খেয়ে সারারাত ঘুমাল। অবশ্য ঘোড়াটিকেও সে যত্ন করে খাইয়ে কুঁড়েঘরের পাশের ছাওয়া-জায়গায় রাখল।

মার্লে ভাবল যে, ঘোড়াটি যখন পথ চিনে এখানে এসেছে, তখন পথ চিনে সে বাড়ি ফিরতে পারবে। এ পর্যন্ত ঘোড়াটির একমাত্র কাজ ছিল সামারীর বাড়ি হতে এখানে যাতায়াত করা।

ভালভাবে সোনার খোঁজ করে সে কয়েক জায়গার নমুনা নিল আর নিল তিন চার দিনের মতো খাবার। তারপর তারা রওনা হ'ল।

একদিন একরাত চলার পর মার্লে পরিচিত এলাকায় পৌছে গেল। তার বাবাকে সে সব কথা বলল, আর জিজ্ঞাসা করল, "সামারী তো মারা গেছে, এখন ঘোড়াটি কি আমি নিতে পারি, না দাম দিতে হবে?" তার বাবা উত্তর দিলেন, "একটা বুনো ঘোড়া বা তার দামে কি এসে যায়? তুমি যে কি বিরাট আবিষ্কার করেছ, তার মূল্য যে কত তা কি জান?"



ভয়ঙ্কর সাতান্নটা দিন

ঘটনাটা ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ঘটিয়েছিল জার্মানীর নাৎসী রাষ্ট্রপ্রধান—অ্যাড্‌লফ হিটলার। চেয়েছিল লন্ডনের আভিজাত্য, চাকচিক্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি করতে—যার খ্যাতি তখন বিশ্বজোড়া। আর লন্ডনবাসীর জীবনপ্রবাহকে স্তব্ধ করে দিতে। প্রথম দুটোয় সফল হলেও, তৃতীয়টা হিটলার পারেনি। লন্ডনের মানুষ হিটলারের চোখরাঙানিকে পাত্তা দেয় নি।

কিন্তু কেমন অবস্থা হয়েছিল গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী-লন্ডনের, ঐ ভয়ঙ্কর সাতান্নটা দিনে? লন্ডনবাসীরাই বা কেমনভাবে কাটিয়েছিলেন, সেই দুঃস্বপ্নে ভরা দু'টি মাস?

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগীর মুখ থেকেই শোনা যাক। ভদ্রলোকের নাম ক্যামেরণ থমাস। তিনি একজন লেখক, বর্তমানে থাকেন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সিডনিতে। ১৯৭৯ সালে 'টরেন্টে টেলিভিশন' থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

১৯৪০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যের কিছুটা আগে জার্মান বোমারু বিমানের বিশাল ঝাঁকটা এসে প্রথম যখন লন্ডনের ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে, তখন থমাস নিতান্তই কিশোর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্য শুরু হয়ে গেছে তার কিছুদিন আগেই। হিটলারের নাৎসী বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়ামের মতো

ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলোর একের পর এক পতন ঘটছে। স্বাভাবিক কারণেই হিটলারের প্রতিপক্ষদের মধ্যে প্রধান—গ্রেট ব্রিটেন গম্ভীর চিন্তামগ্ন। তারও সমরাস্ত্র কিছু কম নেই, মিত্রপক্ষের সম্মিলিত শক্তিও কিছু কম নয়, তবু চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে।

পৃথিবীর প্রায় সর্বপ্রান্তেই ব্রিটিশ উপনিবেশ। লোকে কথায় বলতো, পৃথিবীতে ব্রিটিশ-সূর্য অস্ত যায় না। সুতরাং বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর তাপটা তার গায়েই সব থেকে বেশি লাগছে।

পাশাপাশি হিটলারও মরিয়া। যেভাবেই হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ খতম করো। রাজধানী লন্ডনকে গুঁড়িয়ে দাও। জলযুদ্ধে ওদের সহজে কাবু করা যাবে না। অতএব চালাও একনাগাড়ে বোমাবর্ষণ। বিশেষ করে বন্দরগুলোর ওপরে।

হিটলারের নির্দেশে নাৎসী বাহিনীর র‍্যাপিড এয়ার ফোর্স (RAF) ঝাঁপিয়ে পড়লো লন্ডনের ওপরে।

প্রথম দিনটার কথা ভাবলে আজও ক্যামেরন থমাস-এর গায়ে কাঁটা দেয়।

—বেলহাম স্টেশনের কাছে, স্টেশন রোডের ধারে আমাদের ড্রাই ফিসের দোকান ছিল। মাকে দোকানে রেখে আমি আর ভাই একটা কফি কর্ণারে গিয়েছিলুম কফি খেতে।

কফি কর্ণারে খদ্দের বেশি ছিল না—সাকুল্যে পাঁচ-ছয় জন। আমরা গল্প করতে করতে কফি খাচ্ছিলুম। হঠাৎ কানে এলো কিরকম একটা গুড় গুড় শব্দ। যেন রানওয়ে থেকে অনেকগুলো জেট প্লেন সবে আকাশে ওড়া শুরু করেছে।

কান খাড়া করে শব্দটাকে বোঝার চেষ্টা করছি, এমন সময়-'গুম্' 'গুম্', 'গুম্'...

কফি-কর্ণারের জানলার কাঁচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। আলো নিভে গেল। গরম বাতাসের ঝাপটায় যেন ঝলসে গেল শরীর।

চেয়ার থেকে উঠে জানলার কাছে যেতে মনে হলো কাছাকাছি কোথাও আগুন ধরে গেছে। আগুন দেখতে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু তার প্রজ্বলিত প্রভায় চোখের সামনেটা লালে লাল।

অন্ধকারের মধ্যে চাপা গলায় ভাইয়ের নাম ধরে ডাকলুম—পেট্, পেট্... তুই কোথায়?

—এই যে আমি এখানে, আমি এখানে...

হাতড়াতে হাতড়াতে ভাইকে কাছে পেয়ে, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে গেলুম দরজার দিকে।

ঠিক বেরুবার মুখেই সিলিং থেকে ধপাস্ করে খসে পড়লো একটা কংক্রিটের চাপড়া। ভাগ্যিস মাথায় পড়ে নি!

রাস্তায় বেরিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে ছুটলুম আমাদের দোকানের দিকে। মা'র কি অবস্থা কে জানে! আতঙ্কে সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

হঠাৎ গুম্ গুম্ করে আবার দুটো বোমা পড়লো। আধ মাইল তফাতে। এক হ্যাঁচকায় ভাইকে টেনে নিয়ে একটা ডাস্টবিনের আড়ালে গিয়ে বসলুম। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

ওর মধ্যেই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছিলুম। সারা আকাশ জুড়ে যেন অসংখ্য চিল। ডানা ছড়িয়ে পাশাপাশি ভেসে যাচ্ছে।

খুব কপাল ভালো, আমাদের মতোই আমাদের দোকানটাও অক্ষত। মা আমাদের দু'ভাইকে দেখে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল। মা আশাই করতে পারেনি যে আমরা বেঁচে আছি।

কিন্তু ওটা কান্নাকাটির সময় নয়। পুলিস প্রচণ্ড তৎপরতায় আমাদের মতো অনেককেই ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছিলো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে। কোনো কিছু ভাবার অবকাশ নেই—আগে প্রাণ বাঁচাও।

নাৎসী বাহিনীর সেই প্রথম দিনের বোমাবর্ষণই ব্রিটিশ প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলো।

হিটলারের নিজের হাতে তৈরি র‍্যাপিড এয়ার ফোর্সের প্রায় তিনশো বিমান সেদিন বোমাবর্ষণে অংশ নিয়েছিলো! ঐ বোমারু বিমানগুলোকে ঘিরে ছিল প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ফাইটার। ওরা বোমা ফেলেছিল টেমস নদীর ধারে দীর্ঘ বন্দর এলাকা জুড়ে উপর্যুপরি। এবং প্রায় সারা রাত ধরে।

পুরো বন্দর এলাকায় প্রায় পাঁচশো জাহাজ ছিলো লক্ষ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে। মাঝনদীতে কিছু জাহাজ ছিল নোঙর বাঁধার অপেক্ষায়। শেষ রাতে দেখা গেল একটা জাহাজও অক্ষত নেই। বেশির ভাগই আগুনে জ্বলছে। কিছু কিছু জাহাজ জ্বলতে জ্বলতে ডুবে যাচ্ছে। আগুনের লেলিহান শিখায় অন্ধকার আকাশ টকটকে লাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটা একটা বিরলতম দৃশ্য।

১৯৪০ সালের ১৪ই অক্টোবর, আমরা আমাদের বসতবাড়িটা হারিয়েছিলাম। ওটা ছিল বোমাবর্ষণের ৩৮ তম দিন।

আমরা দু'ভাই তখন স্কুলে। স্কুল ছুটির একটু আগেই ছাদের ওপর বিপদসঙ্কেত বেজে উঠলো। আমরা সবাই ক্লাসরুম থেকে হুড়োহুড়ি করে নেমে এসে একতলায় কোণার দিকে তিনটে ঘরে আশ্রয় নিলুম।

একটু পরেই কানে আসতে শুরু করলো বোমা পড়ার শব্দ। কখনো মনে হচ্ছে কাছাকাছি কোথাও, আবার কখনো মনে হচ্ছে দূরে।

সারাটা রাত স্কুলেই কাটাতে হয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনো ছেলেকেই বাইরে বেরুতে দেয়নি।

পবদিন খুব ভোরে আমরা দু-ভাই বাড়ির সামনে এসে দেখি, ইট, কাঠ, লোহার ভগ্নস্তূপ। বাড়ির কোন অস্তিত্বই নেই। একটা দেওয়াল শুধু দাঁড়িয়ে আছে। সেই দেওয়ালের র‍্যাকে দেখতে পেলুম কাঁচের বাহারি ফুলদানিটা। কোন্ ঐশ্বরিক শক্তিতে ওটা অক্ষত ছিল—কে জানে!

সারা শরীর তখন আমার থর থর করে কাঁপছে। আমার মা? মা কোথায়?

অনেকক্ষণ অবধি সেই ভগ্নস্তূপের ওপর বসে চোখের জল ফেলেছি, কিন্তু উত্তর পাইনি।

এবার আমরা কোথায় যাবো?

মাইলখানেক দূরে কাকার বাড়ি। সেটা কি অক্ষত আছে, না সেটারও এই অবস্থা?

ভাইয়ের পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। ও হাঁটতে পারছে না। ওকে কাঁধে তুলে নিলুম।

শুধু আমরাই নয়। দীর্ঘ সাতান্ন দিনের বোমাবর্ষণে লন্ডনের প্রায় প্রতিটি পরিবারই অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর Their Finest Hour বইতে লিখেছেন—'ইতিপূর্বে কোনোদিন বোমাবর্ষণের আওতায় এত গৃহস্থ বাড়ি পড়েনি, বা এত পরিবার একসঙ্গে সমস্যা এবং আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায় নি।'

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, এরকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যেও লন্ডনবাসী কিন্তু তাদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলেনি।

এরকম দৃশ্য রোজই দেখা গেছে—দুধওলা ভগ্নস্তূপের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুধের বোতল নিয়ে, বাজারে খরিদ্দারের ভিড়, ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে স্কুল যাচ্ছে, বস্ত্রবিপণীর সামনে ক্রেতা—যেন কিছু হয়নি এমনভাবে জামা-টামা পছন্দ করছে। শুধু কান খাড়া রাখছে, কখন সাইরেন বেজে ওঠে।

বিপদসঙ্কেত শুনলেই ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনে গিয়ে সেলটার নিচ্ছে। যেখানে সে সুযোগ নেই, সেখানে বাঙ্কারের আড়ালে।

একটা ঘটনা আমার এখনো মনে আছে। একদিন ঐরকম একটা স্টেশনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছি, আমার পাশে এসে বসলো নতুন ফ্রক পরা এক কিশোরী, আর তার মা। বসার সঙ্গে সঙ্গেই সেন্টের গন্ধ পেলুম। মা'র হাতে একটা কেকের বাক্স। বেশ গুছিয়ে বসে মা কেকের বাক্সটা খুলে ধরলো মেয়ের সামনে। আমি বোধ হয় কৌতূহলী চোখে তাকিয়েছিলুম। কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না। কিশোরীটি নিজের থেকেই বললো,—কাকু, আজ আমার জন্মদিন, তুমি কেক খাও।

প্রতিটা রাতেই ভূগর্ভস্থ স্টেশনগুলো এরকম এক একটা পরিবার হয়ে যেতো।

সত্যি কথা বলতে কি, অনেকেরই তো বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যাদের হয়নি তারাও অন্ধকার হয়ে গেলেই বাড়িতে তালা দিয়ে চলে আসতো আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে। একসঙ্গে খেতো, শুতো, কেউ কেউ গানও গাইতো।

তাই আজও ভাবি, হিটলার কি পেরেছিলো মানুষের মন ভেঙে দিতে? বরং মানুষ আরো মানুষের কাছাকাছি চলে এসেছিলো। উল্টে হিটলারই চলে গিয়েছিলো মানুষের থেকে অনেক দূরে। পাতালপুরীর অন্ধকারে।

হীরক দ্যুতি

মেজর রীড। সাউথ আফ্রিকান ফোর্সের দক্ষ সেনানী। বুয়র যুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে মেজর পদটা পেয়েছেন। যেমন বুদ্ধি, তেমনি অভ্রান্ত রাইফেলের নিশানা। তবে অনেকেই জানে না, মেজর রীড-এর চরিত্রের আর একটা দিক আছে। তিনি একজন হীরে-বিশেষজ্ঞ। ভূতাত্ত্বিক হিসেবে ইতিমধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

এই কাহিনী মেজর রীড-এর ঐ দ্বিতীয় সত্তাটিকে নিয়ে।

সেটা ১৮৭১ সালের মাঝামাঝি। কিম্বার্লির খনির অদূরে একটা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে, রীড নাসিব মরুভূমির সংলগ্ন বেন জঙ্গলে, নিজের কোম্পানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

শুধু মাত্র একটা রিভলবার সম্বল করে ঐ বিপদসঙ্কুল অরণ্যে তিনি পনেরোটা দিন কাটান।

শেষে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন তাঁবুতে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলেন, তখন দেখলেন সতীর্থরা ধরে নিয়েছে, তিনি বিদ্রোহীদের হাতে মারা গেছেন।

খিদেয় তেষ্টায় ক্লান্তিতে, তখন তাঁর শরীর অবসন্ন। ঐ চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কিভাবে এতদিন একা একা বেঁচে রইলেন, সেটাই বিস্ময়ের।

যাই হোক, মেজরকে ফিরে পেয়ে কোম্পানীর সবাই তখন খুশিতে উদ্বেল।

সঙ্গীদের সেবা শুশ্রূষায় খানিকটা চাঙ্গা হয়ে রীড ক্যাম্প-খাটের ওপর উঠে বসলেন। সবার চোখে মুখে তখন কৌতূহলের বন্যা।

এখন নয়, পরে বলবো।—সবাইকে শান্ত করে, দলের খোঁজখবর নিয়ে রীড নিজের ক্যাম্পে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মোটামুটি রাত হয়েছে। সবাই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। রীডের কিন্তু দু-চোখে ঘুম নেই। তিনি উঠে পড়ে ক্যাম্পের এক ধারে গিয়ে আলো জ্বাললেন। তারপর পকেট থেকে বের করলেন দুটো পাথর। মৃদু আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন পাথরদুটোকে।

জঙ্গলে ঘোরার সময় প্রতি মুহূর্তে বিপদ। একটু অন্যমনস্ক হলেই হিংস্র জীবজন্তুর হাতে প্রাণ যেতে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও রীড এই পাথরগুলো সংগ্রহ করতে ভুল করেন নি। তাঁর অভিজ্ঞ চোখ বলেছে, এগুলো অন্য কিছু নয়—ভালো জাতের আসল হীরে।

সেই সাউথ আফ্রিকান ফোর্সের মধ্যে একজন বুশম্যান সৈনিক ছিল রীডের খুবই অনুরাগী। নাম, উম্‌জাট। সে একটু আলাদাভাবে সাহেবের খোঁজখবর নিতে ঐ রাতেই চুপি চুপি রীডের ক্যাম্পে এসে হাজির। মেজরকে ঐভাবে আলো জেলে দুটো পাথর নিয়ে বিভোর হয়ে থাকতে দেখে, সে তো হতভম্ব! বড় বড় চোখে সে বলে,—বাওয়ানা! এত রাতে জেগে জেগে কী করছেন? ...ওগুলো কী?

তুই'ও বুঝি ঘুমোস নি?—মুখে একটা পাতলা হাসি ছড়িয়ে দিয়ে শান্তভাবে রীড বলেন ঃ এগুলো খুব দামী জিনিস রে। এর কয়েকটার মালিক হতে পারলেই তোর আর কোনো অভাব থাকবে না।

উম্‌জাট তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সেগুলো দেখে। তারপর অবহেলার সঙ্গে বলে,—বাওয়ানা, আপনি দুটো পাথর পেয়েই ওরকম করছেন? আমি একটা জায়গা জানি, যেখানে এরকম পাথর চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

চমকে উঠলেন মেজর রীড,—তাই নাকি? কোথায়?

—এই নাসিব মরুভূমির মধ্যেই। ওখানকার ছেলেমেয়েরা এইরকম পাথর নিয়ে খেলা করে। ঢিল ছোঁড়ে।...জায়গাটাকে আমরা সবাই বলি বুশম্যানদের স্বর্গ।

—তুই চিনিস সেই জায়গাটা?

—কী যে বলেন বাওয়ানা! চিনবো না? ওটাই তো আমাদের দেশ।

—আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?

—খুব পারি। তবে আপনার খুব কষ্ট হবে। তাছাড়া...

—তাছাড়া কি?...যতই কষ্ট হোক আমি যাবো। তুই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ উম্‌জাট।

একটু কিন্তু কিন্তু ভাব নিয়ে উম্‌জাট বলে,—বাওয়ানা, সাদা চামড়ার কোনো মানুষকে কিন্তু বুশম্যানরা তাদের স্বর্গে ঢুকতে দেয় না। গাছ-টাছের আড়ালে তীর ধনুক নিয়ে লুকিয়ে থাকে। সাদা চামড়ার মানুষ দেখলেই, বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে মারে। তবে আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো...

উম্‌জাটের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রীড সাগ্রহে বলেন,—তাহলে আর চিন্তা কিসের?

সমস্ত শারীরিক ক্লান্তি উপেক্ষা করে সেই রাতেই উম্‌জাটকে সঙ্গে নিয়ে রীড বুশম্যানদের স্বর্গের দিকে পা বাড়ালেন। সম্পূর্ণ সকলের অজান্তে।

চাঁদের আলোয় তাঁবু ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই সামনে পড়লো অরেঞ্জ নদী। নদীর ধার দিয়ে দিয়ে এখন উত্তরমুখো হাঁটা। পাশেই ঘন জঙ্গল।

দিনের বেলা তবু একরকম, রাত হলেই চিন্তা। বন্য প্রাণীরা এইসময় নদীতে জল খেতে আসে। অন্ধকার হলেই তাই দুজনে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখে উঠে পড়েন। অযথা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি? এখনো অনেক পথ।

চার দিন চার রাত এইভাবে কেটে গেল। সঙ্গে কিছু শুকনো খাবার ছিল। কিন্তু ওগুলো এখন খেয়ে ফেললে চলবে না। সামনেই পড়ে রয়েছে বিশাল মরুভূমি। ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় থাক।

রীড উম্‌জাটকে সঙ্গে নিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকলেন। কয়েকটা বুনো খরগোশ শিকার করে আগুনে ঝলসে, তারপর উদরপূর্তি।

রীডের শরীরে তখন নতুন উদ্দীপনা। তিনি যেন এক অন্য মানুষ। হাঁটছেন, ছুটছেন, খুশিতে গান গাইছেন, দু চোখে অদ্ভুত দীপ্তি। কোথায়? কোথায় সেই বুশম্যানদের স্বর্গ? যেখানে অযুতদীপ্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে শয়ে শয়ে হীরে।

এইভাবেই একসময় পার হলেন বিপদসঙ্কুল অগরাবি জলপ্রপাত। দূরে দেখা যাচ্ছে সোনালি রঙের শুধু বালি আর বালি। সেদিকে আঙুল তুলে উমজাট বললো,—এখন আমাদের ওদিকেই যেতে হবে। ঐ মরুভূমির বুকেই বুশম্যানদের স্বর্গ।

রীডের বুক আনন্দে দুলে ওঠে। সঙ্গে যে কটা পাত্র ছিল, সব ঠাণ্ডা জলে ভরে নেন।

মাথার ওপরে গণগণে সূর্য, পায়ের নিচে ঢেউ খেলানো তপ্ত বালির সমুদ্র। মাঝে মাঝে চোখে-মুখে গরম ধুলোর ঝাপ্টা। কিন্তু কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই রীডের। নতুন উদ্যমে তিনি এগিয়ে চলেন। কে বলবে, এই মানুষটা গত বিশ দিনে হয়তো একসঙ্গে বিশ ঘন্টাও ঘুমোতে পারেন নি।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎ একটা অচেনা সুগন্ধ নাকে এলো। সেই সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস। শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল।

উম্‌জাট বললো,—বাওয়ানা, একটা অন্যরকমের গন্ধ পাচ্ছেন?

রীড জোরে নিঃশ্বাস নেন,—হুঁ, বেশ ভালো গন্ধ!

উম্‌জাট এবার দুম করে বলে,—আপনার চোখ-দুটো কিন্তু একবার বাঁধবো বাওয়ানা।...বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

বাঁধবি?...বাঁধ।—রীড আপত্তি করেন না।

চোখ বাঁধা অবস্থায় ঘন্টাখানেক নিয়ে যাবার পর, চোখের বাঁধন খুলে দেয় উম্‌জাট। গন্ধটা এখন আরো তীব্র। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় সেই গন্ধে।

এ গন্ধটা কিসের উম্‌জাট?—রীডের কণ্ঠে কৌতূহল।

—আপনি যে গাছটার তলায় বসে আছেন, সেই মিমোসা গাছের। এরকম গাছ এখানে অনেক আছে।...কিন্তু বাওয়ানা, এখন যে কিছু খেতে হয়! মনে হচ্ছে আপনারও খুব খিদে পেয়েছে। হাজার হোক, এখন আপনি আমার অতিথি!

দড়ির ফাঁস তৈরি করে কত সহজে উম্‌জাট একটা বুনো খরগোশ ধরে, নিজেই কাঠকুটো যোগাড় করে সেটাকে পুড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তুললো। উম্‌জাট যেন তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই বন্য জীবনটাকে আবার খুঁজে পেয়েছে।

মরুদ্যানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নতুন উদ্যমে আবার এগিয়ে চলা।

নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিনে হাঁটা, রাতে বালির মধ্যে গর্ত

করে সরিসৃপের মতো লুকিয়ে থাকা। কিন্তু তাতেও কি নিস্তার আছে? বেদুইন দস্যুদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু রাতের নিশাচর প্রাণীরা? মরুভূমি হ'ও' হলে রাতেই হিংস্র জীবজন্তুরা বের হয় শিকারের সন্ধানে। ভাগ্যিস, আগ্নেয়াস্ত্রটা রীডের সঙ্গে ছিল!

এইভাবে সাত দিন কাটার পর, একটা গুহা-মুখের সামনে এসে থামলো দুজনে। অনেকটা ছোটখাট দুর্গের মতো। আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঝোপঝাড়, ক্যাকটাস। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে আসছে গুহার মুখ দিয়ে। উমজাট বললো—বাওয়ানা, এবার আমাদের এই গুহার মধ্যে ঢুকতে হবে। একটা টর্চ থাকলে ভালো হতো। তা নেই যখন, কি আর করা যাবে। আপনি রিভালবারটা হাতে রাখবেন। বলা তো যায় না, কোনো জন্তু-জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে।

একটা চাপা সন্দেহ খোঁচা মারলো রীডের মনে। বুশম্যান সৈনিকটা বিপদে ফেলবে না তো? পরক্ষণে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিলেন, ছিঃ! এত ছোট সন্দেহাকুল তাঁর মন! তিনি তো জানেন, মানুষকে বিশ্বাস করলে, ভালবাসলে, তার ওপর নির্ভর করলে, সে কখনো ঠকাতে পারে না।

উমজাটের পিছন পিছন রীড গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। প্রথম দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতড়ে হাতড়ে হোঁচট খেতে খেতে রীড এগিয়ে চললেন।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর মনে হলো, সামনের দিকে যেন আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে। একটু পরে নিজের হাত পা'ও দেখতে পেলেন তিনি। যেন খুব তাড়াতাড়ি সকাল হচ্ছে।

উমজাট বললো,—বাওয়ানা, আমরা গুহার আর এক মুখে এসে পড়েছি। একটু দেখে চলবেন, এখানে একটা বড় গর্ত আছে।

গুহা থেকে বেরিয়ে রীড দেখলেন, সামনেই একটা হ্রদ। বেশি গভীর নয়। আয়নার মতো পরিষ্কার জল। দেখলেই স্নান করতে ইচ্ছে করে। নিচে ছোট ছোট নুড়ি দেখা যাচ্ছে। ঝাঁক বেঁধে রঙিন মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে নুড়ির ফাঁকে ফাঁকে। হ্রদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে রীডের অন্তরটা তৃপ্তিতে ভরে গেল। তিনি আঁজলা ভরে জল খেলেন।

হ্রদের উল্টো দিকে ছোট টিলার মত। উমজাটের সঙ্গে জলে কোমর ডুবিয়ে ওপারে গিয়ে, রীড মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকটা তাকিয়ে দেখেন। সত্যি, প্রকৃতির কী অপূর্ব সৃষ্টি! টিলার গোড়ায় ছোট ছোট হলুদ রঙের ফুল। আশপাশে সবুজ গাছগাছালি। ডালে ডালে লাল রঙের থোকা থোকা ফল ঝুলছে। পাখি ডাকছে পাতার ফাঁকে ফাঁকে। কে বলবে এটা মরুভূমির মধ্যেই কোনো একটা জায়গা!

আর সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, যে রকম দুটো পাথর পেয়ে মেজর রীডের এত কষ্ট করে এত দূরে ছুটে আসা ; সেই রকম, তার থেকে বড়, অজস্র পাথর চারদিকে ঝিক্‌মিক্ করছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লাগে।

উম্‌জাট হাসি হাসি মুখে রীডের দিকে তাকিয়ে বললো,—বাওয়ানা, এই আমাদের স্বর্গ।...দুঃসময়ে আমরা এখানে আসি। মনে গভীর দুঃখ পেলে, বা খিদের সময় কোনো কিছু খেতে না পেলে, আমরা এখানে আশ্রয় নিই। তবে বেশিক্ষণ থাকি না, পাছে আমাদের স্বর্গ নষ্ট হয়ে যায়!

খানিকটা দার্শনিকের ভঙ্গিতে রীড বলেন,—হায়! তোমরা জানোই না, কী অসীম সম্পদের অধিকারী তোমরা।

তারপর খুব সন্তর্পণে রীড তাঁর ঝোলা আর প্যান্টের পকেটে কয়েকটা পাথর তুলে নেন। উম্‌জাটও কুড়িয়ে নেয় কয়েকটা পাথর।

এবার ফেরার পালা।

সেই গুহা, সেই চোখ-বাঁধা অবস্থায় হাঁটা, সেই মিমোসা গাছের সুগন্ধ—সবই একরকম। শুধু একবারই আচমকা ছন্দপতন! এবং সেটা যে কত মর্মান্তিক, কত নিদারুণ, তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। রীড নিজেও এক মুহূর্ত আগেও তা আঁচ করতে পারেন নি।

উম্‌জাট সবে রীডের চোখের পটি খুলে দিয়েছে। দু মিনিটও হয়নি। হঠাৎ...

বাওয়ানা চুপ! একদম নড়বেন না।—উম্‌জাটের গলাটা চাপা আর্তনাদের মতো শোনালো। সে দু'হাত ছড়িয়ে পিঠ দিয়ে রীডকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। হাতের ফাঁক দিয়ে রীড দেখলো, সামনেই একটা বিরাট সাপ। বালির মধ্যে দিয়ে সড়-সড় করে এগিয়ে যাচ্ছে। লেজের দিকটা বেশ কিছুটা বালির মধ্যে। শরীরের সামনের দিকটা বাইরে বেরিয়ে আছে। মুখটা একটু ওপর দিকে তোলা। চেরা জিবটা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে চিরিক্ চিরিক্ করে। মরুভূমির বিষাক্ত সাপ। একবার কামড়ালে আর রক্ষে নেই।

চকিতে রিভালবার বের করে গুলি ছোঁড়েন রীড। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। তার আগেই সাপটা মোক্ষম ছোবল দিয়েছে উম্‌জাটের পায়ে। উম্‌জাট লাফিয়েও সরে যেতে পারেনি।

এই নির্জন নির্বান্ধব মরুর বুকে রীড এখন কি করবে?

নিজের জামার হাতাটা ছিঁড়ে ফেলে তিনি উম্‌জাটের পায়ে শক্ত করে

বাঁধন দিলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হলো না। চোখের সামনে সঙ্গীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরটা আস্তে আস্তে নীল হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে তাঁর মতো অসহায় মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে দুটি ছিল না।

কিছুক্ষণ পর উমজাটের বলিষ্ঠ দেহটা একবার ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল চিরকালের মতো।

বালিতে গর্ত খুঁড়ে রীড উমজাটের নিথর দেহটাকে সমাহিত করলেন। হীরেগুলোও দিয়ে দিলেন সঙ্গে।

ঐশ্বর্যশালী মহান্ সম্রাটের মতো তুমি চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকো। আমাকে বাঁচাতে তুমি প্রাণ দিয়েছো, কিন্তু কফোঁটা অশ্রু ছাড়া আমার তো তোমাকে কিছুই দেবার নেই।—রীডের কথাগুলো কান্নার মতো শোনালো।

কিন্তু এরপর?

রীডের মনে তখন একটাই চিন্তা। এবার আমি ফিরবো কিভাবে? পথ চিনবো কি করে? সঙ্গে খাদ্য জল যা আছে, তাতে দু-চার দিন চলতে পারে। কিন্তু তারপর?

মরুভূমি পেরুলেও কি নিস্তার আছে? তারপরই গভীর জঙ্গল। এদিকে শরীরও ক্ষতবিক্ষত। একা একা শিকার করাও সম্ভব নয়।

শেষ অবধি চিন্তা-ভাবনা করে তিনি একমুখো হাঁটতে শুরু করলেন। ঠিক করলেন, কোনো অবস্থাতেই দিক্ পরিবর্তন করবেন না।

এইভাবে কত দিন, কত রাত যে তিনি হেঁটে-ছিলেন, তার কোনো হিসেব নেই। তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ একটা লোকালয় তাঁর চোখে পড়লো। লোকগুলোকে দেখে মনে হয়, খুবই দরিদ্র।

কি ভেবে কে জানে, জীর্ণ শীর্ণ প্রায়-উলঙ্গ মানুষগুলো কিন্তু রীডকে দেখে তীর ছুঁড়ে মারলোও না, ভয়ে পালালোও না। অবশ্য রীডেরও অবস্থা তখন প্রায় ওদেরই মতো। আস্তে আস্তে ভাব জমে গেল।

সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা হতে, ওরাই রীডকে নিকটবর্তী বন্দরে পৌছে দিলো। সেখান থেকে জাহাজে চেপে সোজা লন্ডন।

রীডের নাতি 'ফ্রেড' যখন ছোট ছিল, তখন এই রোমাঞ্চকর কাহিনী তাকে ভীষণভাবে উদ্দীপ্ত করতো। পরে এই ফ্রেড কর্ণেল হয়ে বহুদিন ছিলেন নাসির মরু অঞ্চলে। কিন্তু বহুবার সামরিক বিমান নিয়ে তত্ত্ব-তালাশ চালিয়েও তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি বুশম্যানদের স্বর্গ।

ফ্রেডের রিপোর্ট পড়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বাহিনীর এক সামরিক অফিসার 'গেরহার্ট', একই উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলে অভিযান চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেরহার্ট এবং তাঁর সঙ্গী কয়েকজনের বিষাক্ত তীরবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায় নাসিব মরুভূমিতে।

বুশম্যানদের স্বর্গ আজও অনাবিষ্কৃত।

আতঙ্কের বিকেল

১৯৭৮ এর ১লা মার্চ। বিকেল তিনটে পনের।

ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার, ভারমন্ট শহরে তখন সোনালী রোদ ঝলসাচ্ছে। নীল আকাশ। দক্ষিণদিকের সবুজ পাহাড়গুলো ঘন বরফে ঢাকা।

ম্যাক্স লিনডার তাঁর স্ত্রীকে বললেন,—আমি একটু বের হচ্ছি। চিন্তা করো না, সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।

মিনিট তিনেকের মধ্যেই বিরাট লাল লিমুজিন গাড়িটা নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন 'রুট সেভেন'-এর দিকে।

ম্যাক্স লিনডার ভীষণ খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ। বিশেষ করে তাঁর গাড়ির ব্যাপারে। রেডিয়েটারে তাই একটা গোলমাল ধরা পড়তেই, তিনি রুট সেভেনে তাঁর পরিচিত পেট্রল পাম্পের মিস্ত্রির কাছে যাচ্ছিলেন, ঠিক করে আনতে।

ওয়েস্টার্ন নিউ-ইংল্যাণ্ডের, উত্তর-দক্ষিণের প্রধান রাস্তা রুট সেভেন, গাড়ি-ঘোড়ায় ভীষণ ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য ম্যাক্স হাইওয়েতে উঠে, হঠাৎ খুব জোরে দক্ষিণদিকে গাড়ির মুখ ঘোরালেন।

রাস্তাটা এই জায়গায় ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। ডান দিকে গভীর উপত্যকা। বাঁক ঘুরেই ম্যাক্স সচমকে দেখলেন, সামনে একটা বিরাট ট্রাক। মুখোমুখি ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে তাঁর গাড়ির দিকে। সাক্ষাৎ যমদূত। পড়ন্ত সূর্যের লাল রশ্মিতে বার কয়েক ঝলসে উঠল ট্রাকের সামনের কাঁচটা।

নিজেকে বাঁচবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায়, ম্যাক্স মুহূর্তে প্রচণ্ড জোরে ডান দিকে ঘোরালেন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল। চোখের নিমেষে ট্রাকটা ম্যাক্সের গাড়ির গা ছুঁয়ে কয়েক সেন্টিমিটার ব্যবধানে বেরিয়ে গেল।

একচুলের জন্য পরিত্রাণ পেলেও, ম্যাক্স কিন্তু দুর্ঘটনা এড়াতে পারলেন না। ডানদিকের পাহাড়ের গায়ে ভীষণ বেগে ধাক্কা খেল তাঁর বিলাসবহুল গাড়িটা।

রাস্তার ধার বরাবর, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রেললাইন। সারাদিনে বেশ কয়েক জোড়া মালগাড়ি যাতায়াত করে ঐ লাইনে।

একটা ভীষণরকম ঝাঁকুনি খেয়ে ম্যাক্সের তোবড়ানো, মোচড়ানো গাড়িটা কাত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রেললাইনের ওপর।

মুখে, মাথায় ভয়ঙ্কর চোট পেয়ে ম্যাক্সের শরীরটা আটকে গিয়েছিল স্টিয়ারিং হুইল আর সিটের মধ্যে।

অনেকগুলো দাঁত উপড়ে গিয়েছিল। বুকের তলার দিকে দু-একটা পাঁজরাও বোধ হয় ভেঙে গিয়েছিল স্টিয়ারিং হুইলের ধাক্কায়। খুব রক্ত বের হচ্ছিল নাক আর মুখ দিয়ে। কিন্তু ম্যাক্স জ্ঞান হারাননি। প্রতিমুহূর্তে একটা শ্বাসরুদ্ধকারী ভয় তাঁর অবলুপ্তপ্রায় চেতনাকে খোঁচা দিচ্ছিল।

গাড়িটা সম্পূর্ণরূপে রেললাইনের ওপর। যে কোনো সময় একটা মালগাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

ভয়ের আরও একটা কারণ, কয়েক মিটার দূরে রেললাইনটা বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেছে। সুতরাং ট্রেনের ড্রাইভারও কিছুই দেখতে পাবে না। ইচ্ছে থাকলেও, শেষ মুহূর্তে তার পক্ষে ট্রেনের গতিরোধ করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ম্যাক্স নিরুপায়, সম্পূর্ণ অসহায়। পাশের দরজাটা এমনভাবে থেঁতলে আটকে গিয়েছিল, যে ম্যাক্সের ক্ষমতা ছিল না নিজের চেষ্টায় গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার। ঘোলাটে চোখ মেলে ম্যাক্স যীশুকে ডাকছিলেন।

কিছু দূরে পাহাড়ের তলায় পেট্রলপাম্প। লিও পামবিয়ানচি নামে ছেষট্টি বছরের একজন বৃদ্ধ, সেখানে নিজের মনে গাড়ির হর্ন সারাচ্ছিলেন। পাম্পের বাইরে ফূর্তির মেজাজে একাই কাজ করছিলেন তিনি। হঠাৎ সেখানে গাড়ি চালিয়ে হাজির হলেন এক যুবতী মহিলা। চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

গাড়ির ভেতর থেকেই ভদ্রমহিলা চেঁচিয়ে বললেন,—ও মশাই, শুনছেন? আসবার সময় দেখলুম, রাস্তা ছেড়ে একটা গাড়ি রেললাইনের ওপর উঠে গেছে। মনে হচ্ছে অ্যাকসিডেন্ট।

ক্-কী। গাড়ি রেললাইনে!

চোখ বিস্ফারিত করে লিও কয়েক সেকেন্ড কি ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন,—গাড়ির মধ্যে কেউ আছে?

মহিলার বোধহয় তাড়া ছিল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে উত্তর দিলেন,—জানি না।

মহিলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই লিও কাজ ছেড়ে উঠে পড়লেন, পাম্প থেকেই পুলিস এবং উদ্ধারকারী দলকে ফোনে খবর দিলেন। হাইওয়েতে গাড়ি চলাচল খুবই স্বাভাবিক। লিও ভেবে দেখলেন, আজকালকার মেয়েদের রকম-সকম বোঝা দায়! মহিলা তার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতাও করতে পারে। তবু নিজে একবার অবস্থাটা দেখা দরকার। যদি সত্যি হয়?

বিকেল তিনটে পঁয়ত্রিশ। সূর্যের আলো সরে আসছে দ্রুত। লিও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পাম্প থেকে রাস্তা এবং পাসের রেল পথের দিকে চোখ রেখে, যেদিক থেকে মহিলা গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন, সেইদিকে চললেন এগিয়ে।

চড়াই উৎরাইয়ের রাস্তা। কিন্তু রেললাইন তো হঠাৎ হঠাৎ অত উঁচু নিচু হতে পারে না, স্বাভাবিকভাবেই লেভেল বজায় রাখতে, পাহাড়ের কোলে খাদের মধ্যে একসময় ঢুকে যাচ্ছিল রেললাইনটা। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ব্যাপার কি হচ্ছে কে জানে!

এইভাবে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালানোর পর হঠাৎ এক জায়গায় ব্রেক কষে লিও লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। রাস্তাটা এখানে হঠাৎ বাঁক নিয়েছে।

নাঃ, লিও ভুল দেখেননি। পাহাড়ের কোলে খাদের মধ্যে একটা কী ধ্বংসস্তূপ!

একটা বিলাসবহুল গাড়ি তেরছাভাবে পড়ে আছে লাইনের ওপর। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

লিও চোখ সরু করে দেখলেন, ড্রাইভারের সিটে রক্ত মাখামাখি অবস্থায় একজন মানুষ। মাথাটা দোমড়ানো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর নুঁয়ে আছে। লিও জোরে জোরে ডাকলেন কয়েকবার। সাড়া পেলেন না। ড্রাইভারের সিটের দিকের দরজাটা টানাটানি করতেও খুলল না। কিন্তু প্রথম থেকেই লিওর মনে হচ্ছিল, লোকটা বোধ হয় বেঁচে আছে। ঘুরে গিয়ে উল্টোদিকের দরজাটা হ্যাঁচকা দিতেই খুলে গেল।

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসুন।—লিও চিৎকার করে বললেন।

দুদিকে মাথা নাড়লেন ম্যাক্স। লিও অনুভব করলেন, মানুষটার নড়ার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে।

ইস্! চোখের সামনে একজন মানুষ রক্তক্ষরণের ফলে মারা যাবে। লিওর ভেতরটা দুঃখে ভরে উঠল। কিন্তু লিও করবেই বা কি? ম্যাক্সের মতো বিশাল

চেহারার মানুষকে টেনে বার করতে তাঁর অনেক সময় লাগবে। অত সময় বা শক্তি কোথায় তার?

ত্বরিত পদক্ষেপে লিও উঠে গেলেন রুট সেভেনে। অনেক গাড়ি যাচ্ছিল হু হু করে। হাত নেড়ে, রুমাল নেড়ে, মিনিট খানেক চেষ্টা করলেন লিও, যাতে অন্ততঃ একটা গাড়ি থামানো যায়। কিন্তু সব চেষ্টা বৃথা। কেউ শুনলো না। লিওর বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিলো। মানুষের মূল্যবোধগুলো সব শেষ হয়ে গেল!

ভাঙা গাড়ির কাছে হতাশ পায়ে ফিরে এলেন লিও। আর তখুনি তাঁর কানে এল, কোনমতে একটা হাত ছড়িয়ে দিয়ে, জড়ানো জড়ানো মৃদু গলায় ম্যাক্স গাড়ির ভেতর থেকে বলে যাচ্ছেন,—হেল্প মি। প্লিজ, হেল্প মি।

গভীর উৎকণ্ঠার সুরে লিও বললেন,—আপনাকে উদ্ধার করার জন্যই তো এত ছোটাছুটি করছি।...কপাল ভাল, খবরটা ঠিক সময়ে পেয়েছিলুম।

পরমুহূর্তেই লিওর মনে হল, যে কোনো সময় ট্রেন এসে পড়তে পারে সুতরাং আর দেরী করাটা উচিত হবে না। যা করার তাঁকেই করতে হবে।

সেদিন সকালেই 'নিউ ইংল্যান্ড' গুডস ট্রেন, পোর্টল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিল আশিটা ওয়াগান নিয়ে। কাগজ, রসায়নিক দ্রব্য এবং খাদ্যসামগ্রীতে ওয়াগানগুলো বোঝাই। যেজন্য ফিচ্‌বার্গে বাড়তি ইঞ্জিন লাগাতে হয়েছিল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা ভারমন্ট শহরকে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর চিরে দিয়ে, নিউইয়র্কের দিকে চলে যাবে।

একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।—এই বলে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে ভাঙা গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন লিও। ম্যাক্সের পাদুটো বিশ্রীভাবে আটকে ছিল ব্রেক আর গীয়ারের মধ্যে। প্রথমে সে দুটোকে টেনে তুললেন সিটের ওপর। তারপর বুকটাকে জাপটে ধরে, একটা হাত নিজের কাঁধের ওপর তুলে, খুব কষ্ট করে লিও বাইরে আনলেন ম্যাক্সের রক্তমাখা শরীরটাকে।

অতিরিক্ত ওজনের চাপে লিওর পাদুটো থর থর করে কাঁপছিল। অন্ততঃ দেড়গুণ ভারি তাঁর থেকে ম্যাক্সের শরীর। হাঁফাতে হাঁফাতে লিও ভাবলেন, এইভাবে ম্যাক্সকে কাঁধে নিয়ে কোন মতেই খাদ থেকে রুট সেভেনে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্ধারকারী দল না আসা পর্যন্ত তাঁকে এখানে অপেক্ষা করতেই হবে।

অকস্মাৎ কিছুদূরে হঠাৎ ট্রেনের হুইসিল এবং ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেলেন দুজনে। পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে এগিয়ে আসছিল যন্ত্রদানবটা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের আড়াল থেকে একটু পরেই বেরিয়ে এল ইঞ্জিনের প্রকান্ড নীল মুখটা। সার্চলাইটের হলদে আলোয় ধাঁধা লেগে গেল লিওর দুচোখে। মেরুদন্ডের মধ্যে দিয়ে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ বয়ে গেল।

মৃত্যু আর মাত্র কয়েক মিটার দূরে।

রেললাইন আর পাহাড়ের মধ্যে অল্প ফাঁক ছিল। ঝোপ-জঙ্গলে ভরা। ম্যাক্সকে সর্বশক্তিতে জাপটে ধরে এক ঝটকায় লিও সরে গেলেন পাহাড়ের দিকে। হাত পা টান টান করে শুয়ে পড়লেন খাদের মধ্যে। চিৎকার করে ম্যাক্সকে বললেন,—মাটির দিকে মুখ রাখুন। নড়বেন না! একদম নড়বেন না।

আর ঠিক সেই সময়েই ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ট্রেনটা এসে পড়ল তাঁদের পাশে।

গাড়িটার সঙ্গে ইঞ্জিনের ধাক্কার প্রচন্ড ধাতব শব্দে কেঁপে উঠল সমস্ত পাহাড়তলি। যেন বিরাট কোন বিস্ফোরণ। গাছের বাসা থেকে আচমকা পাখির দল ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল দিগবিদিকে। ভাঙাচোরা ম্যাক্সের গাড়িটাকে লাইনের ওপর ঘষটাতে ঘষটাতে বেশ খানিকটা দূর অবধি টেনে নিয়ে গেল গুডস ট্রেনটা।

সমান গতিতে ঝড়ের মত বায়ুস্রোত আসছিল ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে। সেই স্রোতের ধাক্কায় শিলাবৃষ্টির মত চারদিকে ছিটকে পড়তে লাগল গাড়ির টুকরোগুলো।

একসময় লিও আর ম্যাক্স অনুভব করলেন ট্রেনটা যেন তাঁদের টানছে। যে কোনো মুহূর্তে তাঁরা ট্রেনের চাকার নিচে পৌঁছে যাবেন। কারণ মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার দূর দিয়ে ট্রেনের চাকাগুলো পাক খেতে খেতে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

ত্রিশ-চল্লিশ হাত যাওয়ার পর, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ট্রেনটা থেমে গেল আস্তে আস্তে। ব্রেকের শব্দের সঙ্গে, চাকা থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

লিও দেখতে পেলেন, 'নিউ ইংল্যান্ড গুডস ট্রেন-এর ড্রাইভার, ইঞ্জিনের কেবিন থেকে নেমে তাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। অবশ্য তিনি ট্রেন থামাতে বাধ্যই হয়েছিলেন। কারণ ঐ অবস্থায় চালালে যে কোনো সময় ট্রেন ডিরেলড্ হয়ে যেতে পারত।

ইতিমধ্যে পুলিস এবং উদ্ধারকারী দলও এসে পড়েছিল হাইওয়ের ওপর।

উদ্ধারকারী দলের নার্সটি লক্ষ্য করেছিল নাকের মধ্যে অত্যধিক রক্ত জমে থাকার দরুণ ম্যাক্সের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মুখ এবং নাকের মধ্যে

থেকে ভাঙা দাঁত, জমাট রক্ত, যতটা সম্ভব পরিষ্কার করার পর স্ট্রেচারে করে ম্যাক্সকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিয়ে গিয়েছিল উদ্ধারকারী দলটি।

বোধ হয় লিওকে আশ্বস্ত করার জন্য নার্সটি ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল—ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাইরেন বাজিয়ে উদ্ধারকারী দলটি ম্যাক্সকে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাওয়ার পর, লিও খুব জোরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রুট সেভেনে নিজের গাড়িতে ওঠার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে শেষবারের মত দেখলেন, একটা ব্রেক-ডাউন কার লাইনের ওপর থেকে ম্যাক্সের বিলাসবহুল গাড়ির কঙ্কালটাকে ক্রেনের সাহায্যে টেনে তুলছে।

হাসপাতালে কিছুদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে ম্যাক্স আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন। যতদিন ম্যাক্স হাসপাতালে ছিলেন, লিও রোজ দেখতে যেতেন। খবরাখবর নিতেন।

দূর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে, কিরকম একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দুজনার মধ্যে।

খানিকটা সেরে ওঠার পর, ভিজিটিং আওয়ার্সে আবেগ-আপ্লুত গলায় ম্যাক্স প্রায়ই লিওকে বলতেন,—এবার আমায় বাড়ি নিয়ে চলুন। আমি বাড়িতেই ভাল থাকবো।

কখনও এড়িয়ে যেতেন লিও। আবার কখনো কখনো ম্যাক্সের কপালে হাত বুলোতে বুলোতে লিও বলতেন,—ঠিক আছে, অধৈর্য হবেন না। আর একটু সেরে উঠুন, আমি নিজে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।

ঠিক সেই মুহূর্তে লিওকে মনে হত ম্যাক্সের অভিভাবক।

লিও পামবিয়ানচি, পরবর্তীকালে তাঁর এই দুঃসাহসিক কাজের জন্য সরকারের কাছ থেকে 'কারনেজি মেডেল' পেয়েছিলেন। যেটা ইউনাইটেড স্টেটসের মধ্যে সব থেকে বড় অসামরিক পুরস্কার।



বাহাদুর বাঙালী

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

"চন্দ্র দত্ত, রণে মত্ত, শিব-সেনাপতি......

...গুলিগোল্যা সাদেক মোল্যা, রেনীর দর্প ক'রল চূর

বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা, ধন্য বাঙলা বাঙালী বাহাদুর।"

বাঙালী শিবনাথের ডঙ্কা সত্যই একদিন বেজেছিল—ধন্য হয়েছিল বাঙলা দেশ। পূর্ব-খুলনা. বিস্তীর্ণ হোগলা পরগনার অন্তর্গত শ্রীরামপুর-নৈহাটির নগণ্য এক তালুকদার বাবু শিবনাথ ঘোষ— কিন্তু বীরত্ব-গৌরব ও স্বদেশসেবায় তিনি ছিলেন বাঙালী বাহাদুর। ইতিহাসের পাতায় তাঁর কীর্তিকাহিনী লেখা না থাকলেও পূর্ব-খুলনার গ্রাম্যগাথায় আজও তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর রণডঙ্কায় দুর্দান্ত ইংরেজ কুঠিয়াল রেনীসাহেব একদা সশঙ্কিত হয়েছিলেন। ১৮৪০ থেকে১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যত শিবনাথ ও রেনীর যে সশস্ত্র সংগ্রাম চলেছিল, সেই ভুলে-যাওয়া ইতিহাস আজ তোমাদের শোনাব।

কোম্পানির আমলে সুদূর ইংলন্ড থেকে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষী এক ইংরেজ সৈনিক—হেনরী স্লেইড্ রেনী। উৎসাহ ছিল, অধ্যবসায় ছিল, চাতুর্যেরও অভাব ছিল না। ভূ-কৈলাসের রাজার ইংরেজ ম্যানেজার কামারুল সাহেবের একমাত্র কন্যা বারবারাকে বিবাহ করে পত্নীর উত্তরাধিকারসূত্রে হোগলা পরগনার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হয়েছিলেন। প্রাচীন খুলনায় এসে উদ্যোগী রেনী সাহেব গভর্নমেন্টের কাছ থেকে রূপসা চর আর লখ্‌পুরের কাশ্যপ-চৌধুরীদের কাছ থেকে খুলনা ইলাইপুর তালুকের অংশবিশেষ পত্তনি নিয়ে ভৈরবতীরে তালিবপুর গ্রামে রাজকীয় আড়ম্বরে বসবাস শুরু করেছিলেন।

কলকাতার হ্যামিল্টন কোম্পানির হৌস থেকে আট লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে খুলনা-নয়াবাদের কাছাকাছি তালিবপুর, ঘোষের হাট, লখ্‌পুর, নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে নীল আর চিনির দশ-বারোটা কুটি ও কারখানা খোলা হল।

উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেন রেনী সাহেব। ঐশ্বর্য বাড়ল, প্রতিপত্তি বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল আত্মগর্ব আর লোভ। অত্যাচার আর অবিচারে স্থানীয় প্রজাদের জীবন তিনি দুর্বিষহ করে তুললেন। বড় বড় নালা কেটে প্রজাদের জমির সীমানা নষ্ট করা হল, জোর করে তাদের নীলচাষের দাদন নিতে বাধ্য করা হল, ধানক্ষেতে নীল বুনে দেওয়া হল। বেগার খাটবার ভয়ে তালিবপুর কুঠিবাড়ির কাছ দিয়ে মানুষের হাঁটা-চলাও বন্ধ হয়ে গেল।

চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অসহায় প্রজাদের দিনের পর দিন কুঠির অন্ধকার কয়েদ-ঘরে বন্দী করে রেখে অমানুষিক অত্যাচার করা হত। ঘরে আগুন জ্বালিয়ে, জমির পাকা ফসল নষ্ট করে অবাধ্য প্রজাদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করা হত। ফলে আশেপাশের অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম জনহীন নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছল।

ছিন্নমূল এই সব মানুষের আর্ত-চিৎকার বার বার শিবনাথের কানে পৌঁছতে লাগল—আশ্রয় চাই, আহার্য চাই, প্রতিশোধ চাই।

শীতের নিশুতি রাত। শিবনাথের শ্রীরামপুর কাছারিবাড়ির সামনের প্রকান্ড আটচালা মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। মাটির ওপর বসে আছে অনেকগুলো উদ্বাস্তু মানুষ—হিন্দু, মুসলমান আর অন্ত্যজ। কোম্পানি শাসনের নির্মম নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে বলদর্পী রেনীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাত-পুরুষের ভিটে-মাটি ক্ষেতখামার পেছনে ফেলে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরে পালিয়ে এসেছে ওরা—ওদের চোখে নিভে গেছে সমস্ত আশার আলো, জীবন হয়েছে অনিশ্চিত।

বিস্ফারিত বেদনাহত চোখে ঐ অসহায় মানুষগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন যুবক শিবনাথ। উৎপীড়িত অসহায় মানবাত্মা আজ করুণ চোখে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইছে, নেতৃত্ব চাইছে, চাইছে অত্যাচারের প্রতিশোধ। ওদের তিনি বিমুখ করবেন না।

আশেপাশের অনেক ধনবান জমির তালুকদার তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, কূটপরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু শিবনাথ বুঝেছেন, স্বার্থপর ঐ পরামর্শকারীরা কেউই কার্যকালে তাঁর সহায়তার এগিয়ে আসবেন না। সীমাবদ্ধ সংগতি ও মুষ্টিমেয় সহচর নিয়ে দুর্দান্ত কুঠিয়ালের সঙ্গে সর্বস্ব পণ করে তাঁকে একক

সংগ্রামে নামতে হবে। সামান্য এক তালুকদার তিনি—অস্ত্রবল আর লোকবলে বলীয়ান রেনীর পদলেহী অনুচর আর গোরা সৈন্যের বিরুদ্ধে দেশী গাদা বন্দুক, ঢাল-সড়কি আর বাঁশের লাঠি নিয়ে তাঁকে লড়তে হবে। সমাজের উঁচুতলার মানুষদের ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই, দরিদ্র মূর্খ গ্রাম্য মানুষকেই তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় আজ উপস্থিত হয়েছে সহস্রাধিক লাঠিয়াল আর সড়কিওয়ালা।

বাহিরদিয়া থেকে এসেছেন বন্ধু চন্দ্রকান্ত দত্ত, তিলক আর পানিঘাট থেকে এসেছেন শুভানুধ্যায়ী মিত্রমহাশয়রা আর বিরাট থেকে এসেছে দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল সর্দার সাদেক মোল্যা। তার সঙ্গে এসেছে গয়রাতুল্যা, গৌর ধোবা, ফকির মামুদ, আফাজুদ্দি, খানমামুদ জোলা ও আরও অনেক নাম-না-জানা লাঠিয়াল। সভ্যতার বিচারে এই সব নগণ্য মুসলমান ও অন্ত্যজ চাষী হয়তো কোনদিনও সম্মান পাবে না, কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি সেবায় আত্মনিবেদিত এই বীরবৃন্দকে সাধারণ মানুষ কোনদিনও ভুলবে না।

নির্দিষ্ট দিনে শিবনাথের রণডঙ্কা বেজে উঠল। সুযোগসন্ধানী বাঙ্গালী বাহাদুরের নেতৃত্বে উৎপীড়িত মানুষের দল বার বার আক্রমণ করতে লাগল তালিবপুর, লখ্‌পুর, ঘোষের হাটের নীলকুঠি আর নন্দনপুরের চিনির কারখানা। রেনীর নিজস্ব জমির নীলগাছ রাতারাতি চালান হয়ে গেল শিবনাথের কুঠিবাড়িতে, দাদন নিয়েও রাইয়তরা জমিতে নীল বোনা বন্ধ করল। ভৈরব আর পশরের বুকে নির্ভয়ে ঘুরতে লাগল শিবনাথের ছিপগুলো। চিনির কারখানায় পৌঁছবার আগেই লুট হতে লাগল গুড়ের নাগরি ভরা নৌকোগুলো।

ক্রোধে উন্মত্ত হলেন রেনী সাহেব। দ্বিগুণ অত্যাচারের আগুনে তিনি কালো মানুষদের ঔদ্ধত্যের আগুন নেভাতে চাইলেন। কিন্তু প্রজাশক্তির হাতে তাঁকে প্রায়ই বিপর্যস্ত ও পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হল। শিবনাথ ও রেনীর বিরোধ মেটাবার জন্য গভর্নমেন্ট দুজনের জমিদারির মধ্যে নয়াবাদ থানা ও পরে খুলনা মহকুমা স্থাপন করলেন। কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট শ-সাহেবের অভিসন্ধিমূলক পক্ষপাতিত্বে সমস্ত সরকারী চেষ্টাই ব্যর্থ হল। দুজনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল না।

সন্ধ্যার অন্ধকারে এইমাত্র তালিবপুর কুঠি থেকে রেনী সাহেবের নীল আর চিনি বোঝাই ছত্রিশখানা নৌকা কাঁচিবাঁকা নদী ধরে কলকাতার দিকে রওনা হয়ে গেল। অর্থলোভী রেনী মালগুলো মহাজনের হৌসে জমা না দিয়ে অন্যত্র গোপনে বিক্রি করবার নির্দেশ দিলেন দেওয়ানকে।

গোপনীয় এই সংবাদ কিন্তু যথাসময়েই পৌঁছে গেল শ্রীরামপুরে।

........কাঁচিবাঁকা নদীটা যেখানে বাঁক ঘুরে উত্তরমুখী হয়েছে, তারি কাছে প্রায়ান্ধকার একটা জায়গায় সারি সারি খানকয়েক ছিপ বাঁধা রয়েছে। সেখানটায় জলের উপর নেমে এসেছে তটবর্তী বটগাছের শাখাপ্রশাখা— চারদিকে ঘন হয়ে উঠেছে নল-খাগড়ার বন। অমাবস্যার কালো রাত। ফুরফুরে হাওয়ায় ছিপগুলো দোল খাচ্ছে। দূরে অন্ধকার মাঠে বেনাঘাসের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে রাত্রিচর পাখির দল। প্রেতচ্ছায়ার মত বটগাছটায় শকুনশিশুর কান্না মাঝে মাঝে রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ ছিপগুলোর চঞ্চলতা দেখা গেল, শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর।

জলের কলকল শব্দ বাড়ছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নদীর বুকে যেন অস্পষ্ট আলোর রেখা....ক'টা চলন্ত ছায়া যেন নদীর ওপর দিয়ে অন্ধকার ভেদ করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে...

কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে ছিপের ওপর উঠে দাঁড়াল দীর্ঘাকৃতি একটি ছায়ামূর্তি।

—"দেখতে পাচ্ছ সাদেক মিঞা?"

ততোধিক চাপা গলায় উত্তর দিল লাঠিয়াল সর্দার—"হ্যাঁ হুজুর, রেনী সাহেবের নৌকো।"

—"কী করতে হবে, ঠিক ঠিক মনে আছে তো তোমাদের? তলা ফাঁসিয়ে সবকটা নৌকা জলে ডুবিয়ে দিতে হবে! বাধা দিতে এলে কাউকে রেহাই দেবে না।"

তীরবেগে ছিপগুলো ছুটে গেল বাঁকের মুখে। লাঠি আর সড়কি হাতে কালো কালো একদল মানুষ হিংস্র শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মালবোঝাই নৌকোগুলোর ওপর। অতর্কিত আক্রমণে নৌকোগুলোর মাঝি আর রক্ষীরা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল। তারপরেই অন্ধকারে কাঁচিবাঁকা নদীর বুকে মিলিয়ে যেতে লাগল মানুষের রক্তাক্ত দেহগুলো। এক এক করে জলের তলায় তলিয়ে গেল পঁয়ত্রিশখানা নীল আর চিনি বোঝাই নৌকো। ব্যর্থ হল অর্থপিশাচ রেনীর গোপন ষড়যন্ত্র। হাজার মানুষের রক্তে কলঙ্কিত নীলের বাক্স আর দলুয়া চিনির বস্তাগুলো আর কোন দিনও কলকাতার গোপন ঠিকানায় পৌঁছল না।

আরও অনেক অভিযানের মত শিবনাথের এই অভিযানও সফল হল। সে যাত্রায় একখানা মাত্র নৌকো অতিকষ্টে কলকাতায় পৌঁছল।

নিদারুণ এই দুঃসংবাদে জ্বলে উঠলেন ইংরেজ কুঠিয়াল। নগণ্য এক গ্রাম্য তালুকদারের চক্রান্তে বার বার তাঁর সম্মান, তাঁর প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে খুলনার এই অরণ্য অঞ্চলে তিনি নিরঙ্কুশ রাজগি ভোগ করতে এসেছেন, পরাজিত হয়ে নতি স্বীকার করতে আসেননি। প্রতিশোধ নেবার জন্যে তিনি শিবনাথের নামে লুটতরাজ আর ছিয়ানব্বইটি নরহত্যার অভিযোগে রাজ সরকারে মামলা রুজু করলেন। গোরা সৈন্যরা শিবনাথের নেহালপুর আর বিরাটের নীলকুঠি ঘেরাও করল। কিন্তু আসামীকে ধরা গেল না। ভাটির জঙ্গলে আত্মগোপন করে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে রেনীর দর্প চূর্ণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ঝড় শান্ত হতেই একদিন গভীর রাত্রে রেনীর কুঠি আক্রমণ করলেন শিবনাথ। সুখসুপ্ত ইংরেজের নিদ্রাভঙ্গের আগেই কুঠির স্তূপীকৃত নীলগাছ লুটে নিয়ে নিজস্ব নেহালপুর কুঠিতে সদর্পে ফিরে এলেন।

বাঙালী বীরের এই অতর্কিত আক্রমণে বিস্ময়ে হতবাক্ হলেন রেনী—প্রতিআক্রমণের চেষ্টা করলেন না।

এরপর থেকে দুজনের মধ্যে আর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি। তবে রেনীর অত্যাচার যথেষ্ট পরিমাণে প্রশমিত হয়েছিল।

শিবনাথ আর রেনী দুজনেই বীর ছিলেন—বীরত্বের মর্ম বুঝতেন। অভিমানী দুটি মানুষের মধ্যে সদ্ভাব না থাকলেও অশ্রদ্ধা ছিল না। নির্দয় নীলকর হিসাবে নিরীহ প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করলেও নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করার দুর্নাম রেনীর কোন দিনও ছিল না। রেনী-চরিত্রের এই মহৎ গুণটিকে শত্রু হয়েও শিবনাথ আজীবন প্রশংসা করে গেছেন।

১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। সম্মিলিত প্রজাশক্তির দেশব্যাপী নীল-বিদ্রোহে গর্ব-স্ফীত নীলকরদের স্বর্ণস্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ার অশুভ সংকেত দেখা দিয়েছে।

তালিবপুর নীল কুঠির বিরাট প্রাসাদের প্রমোদকক্ষে বিমর্ষমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রেনী সাহেব। সামনের প্রশস্ত উঠোনের নীলখোলায় পুরোনো দিনের মত স্তূপীকৃত নীলগাছ জমা হয়নি। ভৈরবী নদের ধারে উঁচু জায়গায় সারি সারি চৌবাচ্চার অধিকাংশই ফাঁকা। একদা প্রাণচঞ্চল কুঠিবাড়ি আজ কেমন যেন জনহীন—নিস্তব্ধ। রেনী ভাবছেন, নীলকরদের সুখের দিন শেষ হতে আর দেরি নেই। অশিক্ষিত নেটিভগুলোর প্রাণহীন দেহে জেগেছে আজ প্রাণের সাড়া, বুকে জেগেছে সাহস, মুখে কথা ফুটেছে।

একজন তাইদগির এসে সংবাদ দিন রেনীকে—"শুনেছেন সাহেব? শিবনাথবাবু নেই, গত রাত্রে মারা গিয়েছেন।"

ঘুরে দাঁড়ালেন রেনী—"হোয়াট্, শিবনাথ নেইঠ—শিবনাথ ইজ ডেড?"

—"হ্যাঁ সাহেব। গতরাত্রে নেহালপুর কুঠিতে তিনি হঠাৎ মারা গেছেন।"

সামনের একটা কেদারায় বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকলেন রেনী। শিবনাথ চলে যাবে—এ যে তিনি ভাবতেও পারেননি। মাত্র উনচল্লিশ বছরের ইয়ং ম্যান বাবু শিবনাথ ঘোষ—দি হ্যাম্পডেন অব্ বেঙ্গল।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি—"বারবারা, বারবারা ডিয়ারি!"

পাশের কামরা থেকে ছুটে এলেন মিসেস রেনী—"কী হ'য়েছে হেনরী?"

—"জান, জান বারবারা? শিবনাথ চলে গেল, শুধু আমি রয়ে গেলাম। সে আমার শত্রু ছিল বটে, কিন্তু আমি তাকে শ্রদ্ধা করতাম। কেন জান? হি ওয়াজ এ গ্রেট্ সোল! সে দেশকে ভালোবাসত, ভালোবাসত দেশের মানুষকে। দেশের মানুষের জন্যে অমন একটা মহৎ প্রাণ অকালে চলে গেল। এ আমি সহ্য করতে পারছি না বারবারা।"

বারবারা স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। চুপ করে একদৃষ্টে ভৈরব নদের দিকে তাকিয়ে রইলেন রেনী। দুচোখ তাঁর জলে ভরে এল। সারবন্দী ঝাউ আর দেবদারু গাছের বনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির অত্যাচারের রাজত্বও শেষ হয়ে আসছে। তাঁর নীলকুঠিও বন্ধ হয়ে যাবে—দুঃখ নেই তাতে। শুধু দুঃখ রয়ে গেল—অর্থের নেশায় দৃষ্টি তাঁর এতদিন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তাই শিবনাথকে তিনি চিনেও চিনতে পারেননি।

মাথা নোয়ালেন রেনী—"আমায় ক্ষমা কর শিবনাথ। তোমার আত্মার শান্তি হোক—মে ইওর সোল রেস্ট্ ইন্ পিস্।"

মানুষ চিরকাল থাকে না, কীর্তি থাকে, অকীর্তিও থাকে। শিবনাথ চলে গেছেন, পূর্বপুরুষদের গৌরবস্মৃতি রামনারায়ণ খাল আর নেহালপুর-বিরাটের কুঠিবাড়ি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু আজও গ্রাম্য মানুষের গীতিকবিতায় বাঙালী বাহাদুর শিবনাথ ঘোষ অমর হয়ে রয়েছেন।

রেনী সাহেবের কুঠিবাড়ি আর বাঁধাঘাট আজ ভৈরবগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। শুধু রয়ে গেছে আগাছা-কন্টকিত বিস্তীর্ণ উদ্যানের মধ্যে ক'টা ঝাউ আর দেবদারু গাছ, আম্রকুঞ্জের ছায়ায় রেনীদম্পতির জীর্ণ সমাধিস্তম্ভ।

আজও তালিবপুর, লখ্পুর আর ঘোষের হাটের নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষে নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস একেবারে মিলিয়ে যায়নি—সে অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আজও রেনীর অকীর্তির কথা ভুলতে পারেনি।



বেদগাঁওয়ের সেই যুদ্ধ

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সীমান্ত রক্ষী ও ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে। এই সেনাদলের তিনটি শাখা—স্থল, জল এবং বিমান বাহিনী। স্বাধীন ভারতের সেনাদলকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শত্রুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রতিটি যুদ্ধেই অসাধারণ বীরত্ব, রণকৌশল এবং চরম আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন ভারতের নির্ভীক সন্তানরা। সারা দেশ তাঁদের জন্য গর্বিত। এমনই মরণজয়ী সৈনিকের রোমাঞ্চকর যুদ্ধকাহিনী পরিবেশিত হলো।]

বীপ....বীপ....বীপ....হ্যালো—ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার? হ্যালো...বেদগাঁও বেসপয়েন্ট থেকে মেজর সোমনাথ শর্মা বলছি.... হ্যালো....শত্রু পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে....তারা সংখ্যায় অনেক....জলদি আরও দু কোম্পানী সৈন্য পাঠান....তবে সংখ্যায় আমরা যত কমই হই না কেন, আমি শপথ করছি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করবো। মাতৃভূমির এক ইঞ্চি জমিও আমরা হানাদার শত্রুর হাতে তুলে দেব না....কখনোই না....

মেজর সোমনাথ শর্মার পাঠানো ওয়্যারলেস বার্তা এই পর্যন্ত শুনতে পেলেন ব্রিগেডিয়ার সেন। তারপরই এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ। ওয়্যারলেসের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

ব্রিগেডিয়ার সেন আর দেরি করলেন না। তক্ষুণি দু কোম্পানী সৈন্য রওনা করে দিলেন বেদগাঁও বেসপয়েন্ট অভিমুখে।

জায়গাটা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। তাই তার সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শ্রীনগর হলো ভারতের অন্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগের একটা বড় কেন্দ্র। আর সেটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে হানাদার শত্রুরা।

ওরা যে এত চটপট বেদগাঁও-এ পৌঁছে যাবে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ বোধহয় ভাবতে পারেননি। সেখানে শত্রুর মোকাবিলায় হাজির ছিল কুমায়ুন রেজিমেন্টের মাত্র দু কোম্পানী সৈন্য। তাদের দলপতি মেজর সোমনাথ শর্মা। প্রাণচঞ্চল দুঃসাহসী এক তরুণ।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভারত স্বাধীন হবার মাস কয়েক বাদে। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান হঠাৎ হাজার হাজার হানাদার পাঠাতে শুরু করল। উদ্দেশ্য গোটা কাশ্মীর দখল করে নেওয়া। অগত্যা কাশ্মীরকে হানাদারমুক্ত করতে ভারত সরকারও ফৌজ পাঠাল। শ্রীনগর বিমানবন্দরে গিয়ে নামলো ভারতীয় বাহিনী।

হানাদাররা তখন চারটি দলে ভাগ হয়ে মুজঃফরবাদের পথ ধরে এগিয়ে আসছে শ্রীনগর আর জম্মুর দিকে। তারা সবাই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। ওদের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী পাকিস্তানী সেনাদল।

প্রথম চোটে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানী হানাদাররা কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পেরেছিল। অত্যাচার আর নৃশংসতার চিহ্ন ছড়াতে ছড়াতে হিংস্র নেকড়ের মতো ছুটে আসছিল ওরা। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ শহর বারমুলাও তারা দখল করে ফেললো। ততক্ষণে অবশ্য ব্রিগেডিয়ার সেনের নেতৃত্বে ১৬১ নম্বর পদাতিক ব্রিগেড শ্রীনগরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।

পাকিস্তানী হানাদাররাও ধূর্ততায় কম যায় না। তারা এবার সম্মুখ যুদ্ধের পথ ছেড়ে গেরিলা কায়দা ধরলো অর্থাৎ গা ঢাকা দিয়ে রইলো আশপাশের গ্রামগুলিতে এবং মাঝে মাঝে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো ভারতীয় বাহিনীর ওপর।

এমনই একদল হানাদার লুকিয়েছিল বেদগাঁও গ্রামে। ওদের মতলব ছিল হঠাৎ চড়াও হয়ে শ্রীনগর বিমানবন্দরটা দখল করে নেবে। আর তা যদি করা যায় তাহলে পুরো কাশ্মীরের দখল নিতে আর কতক্ষণ?

মতলবটা যদি সত্যিই তারা হাসিল করতে পারতো তবে আজ হয়তো কাশ্মীর থাকতো পাকিস্তানেরই দখলে। কিন্তু ভারতের এক বীর সৈনিক

মেজর সোমনাথ শর্মা তা হতে দেননি। ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন শত্রুপক্ষের চক্রান্ত।

মেজর সোমনাথ শর্মা যে বংশের সন্তান সেই বংশ পুরুষানুক্রমে বহন করে চলেছে সৈনিকের মহান দায়িত্ব। মেজর শর্মার বাবা মেজর জেনারেল এ. এন. শর্মা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। সোমনাথ উপযুক্ত পিতার সুযোগ্য পুত্র।

৪ নম্বর কুমায়ুন রেজিমেন্টের এই মেজর কিন্তু সে সময়ে শারীরিক ভাবে খুব একটা সুস্থ ছিলেন না। দিন কয়েক আগে ক্লাবের মাঠে হকি খেলতে গিয়ে বাঁ হাত ভেঙে যায়। হাতে তখনও প্লাস্টার বাঁধা। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন, যতদিন না হাতের প্লাস্টার খোলা হয় ততদিন তিনি যেন দিল্লীতে বিশ্রাম করেন।

মেজর শর্মা অবশ্য ডাক্তারের এই উপদেশ মানেননি। কারণ ওদিকে কাশ্মীরে তখন বিদেশী হানাদাররা ঢুকে পড়েছে। মোকাবিলায় ডাক পড়েছে তাঁর কুমায়ুন রেজিমেন্টের। এ সময়ে দলনায়ক সঙ্গে না থাকলে কে ভরসা দেবে তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে? অতএব বাঁ হাতে প্লাস্টার বাঁধা অবস্থাতেই মেজর সোমনাথ শর্মা হাজির হয়েছিলেন শ্রীনগর ফ্রন্টে।

১৯৪৭ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার সেনের নির্দেশে কুমায়ুন রেজিমেন্টের ৪র্থ ব্যাটেলিয়ানের প্রায় একশো সৈন্য নিয়ে মেজর শর্মা বেদগাঁও থেকে শ্রীনগর বিমানবন্দরে যাবার পথে একটা উঁচু জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে বসলেন। দুপুর দুটো নাগাদ শ্রীনগরের মূল ক্যাম্পে বসে ব্রিগেডিয়ার সেন মেজর শর্মার ওয়্যারলেস বার্তা পেলেন। মেজর জানালেন, হানাদাররা বেদগাঁওয়ের বাড়িগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু তিনি সেভাবে পাল্টা জবাব দিতে পারছেন না। কারণ, গ্রামের নিরীহ মহিলা আর শিশুরা তাহলে মারা পড়বে। ব্রিগেডিয়ার সেন জানতেন, নির্ভীক ও রণকুশলী এই সেনানায়কের হৃদয়টি বড় কোমল।

মেজর শর্মা বার্তা পাঠাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় সাতশো হানাদার সৈন্যের একটা দল গ্রাম থেকে বেরিয়ে কুমায়ুন রেজিমেন্টের একশো জওয়ানকে তিন দিক থেকে ঘিরে আক্রমণ শুরু করলো। সংখ্যায় তারা ভারতীয় বাহিনীর সাত গুণ। হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র। তারা আসছে ঢেউয়ের মতো। তবু পেছিয়ে গেলেন না মেজর সোমনাথ শর্মা। সাতের বিরুদ্ধে একজন সৈন্য নিয়েও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

ভাঙা হাতের যন্ত্রণা, জীবনের ভয়—সব কিছু তুচ্ছ করে শত্রুর প্রায় মুখোমুখি পৌঁছে লড়াই শুরু করলেন মেজর শর্মা। তাঁর অসাধারণ বীরত্বে উদ্দীপ্ত হয়ে লড়তে লাগলো অধীনস্থ সেনারা। এদের মধ্যে মেজর শর্মা একাই একশো সেনার সমকক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন সমস্ত রণক্ষেত্র জুড়ে। শুধু কি তাই? অধীনস্থ সৈন্যদের অস্ত্রগুলিতে বারুদ যোগান দেবার দায়িত্বও নিলেন নিজেই। এমনকি কোনো পোস্টে কোনো সৈন্য নিহত হলে তার জায়গায় পৌঁছে নিজেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে লাগলেন।

প্রায় ছ ঘন্টা ধরে চললো এই মরণপণ যুদ্ধ। মেজর শর্মার উদ্দেশ্য ছিল সাহায্যকারী সেনা না আসা পর্যন্ত যেভাবে হোক হানাদারদের আটকে রাখা। তা তিনি পেরেছিলেন। কিন্তু ছ ঘন্টা বাদে ভারতীয় সেনারা যখন এসে পৌঁছলো, তার কিছুক্ষণ আগেই শত্রুপক্ষের মর্টার থেকে ছুটে আসা গোলার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই বীর সৈনিক।

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রথম সাধারণতন্ত্র দিবসে মেজর সোমনাথ শর্মাকে মরণোত্তর পরমবীর চক্রে সম্মানিত করা হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে এ সম্মান তিনিই প্রথম লাভ করেছিলেন। মাতৃভূমির গৌরবরক্ষায় তাঁর আত্মদানের কাহিনী চিরকাল লেখা থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইতিহাসে।



নেপোলিয়নের বিখ্যাত গুপ্তচর

বিশু মুখোপাধ্যায়

গ্রামে ছোট একটি তামাকের দোকানের মালিক এখন সালমিস্তার। জীবনের বেলা এখন পড়তির দিকে। আগ্রহ, উৎসাহ ও উত্তেজনা যা ছিল সব স্তিমিতপ্রায়! বিগত দিনের কথা চিন্তা করলে, এখন বেদনামিশ্রিত হাসি আসে সালমিস্তারের মনে। অথচ একদিন কী প্রতাপই ছিল তার! একেবারে যাকে বলে থরহরি-কম্পমান ছিল ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তার নামে! আর এখন? এখন জেল ফেরত সামান্য একজন দোকানী মাত্র সে!

শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা যখন, 'ক্ষুদে কর্পোর‍্যাল'কে পরাজিত করে নির্বাসিত করল, তখন সালমিস্তারের হল কয়েক মাসের কারাদণ্ড। আর তার ধনসম্পত্তি যা ছিল, তার অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করে নিল ইংরেজরা। জেল থেকে যখন ছাড়া পেল সালমিস্তার, তখনও তার যা সামান্য কিছু ছিল, তাই দিয়েই ঐ তামাকের দোকান খুলে বসেছিল সে।

এই কার্ল সালমিস্তার ছিল সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ডান হাত—গুপ্তচরদের সেরা। ঠকিয়েছিল সে সকলকে, কেবল ঠকায়নি তার প্রভুকে—তার প্রিয় 'ক্ষুদে কর্পোর‍্যাল' নেপোলিয়নকে। সেরা গুপ্তচর হতে গেলে যে সব গুণ থাকা দরকার, তার সবগুলিই ছিল তার মধ্যে, নিখুঁত ভাবে। যেমন ছিল তার অভিনয় করার দক্ষতা, তেমনি ছিল কূটবুদ্ধি আর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার অদ্ভুত ক্ষমতা। সে নিজেই ছিল তার নিজের গুরু।

ফরাসী সীমান্তের কাছে জার্মানীর এলসেস্ প্রদেশে জন্ম হয় কার্ল কার্ভে সালমিস্তারের, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে। যখন স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই

সে রীতিমত চোরা-চালানী কাজে রপ্ত হয়ে ওঠে। তার পর যখন তার বয়স উনিশ-কুড়ি তখন তো সে পুরোদমেই বে-আইনী আমদানি-রপ্তানি চালিয়েছে দেশ-বিদেশের সঙ্গে। এই কাজ করতে করতেই সে শিখেছিল কেমন করে কোন্ ব্যাপার গোপন রাখতে হয়, পদস্থ কর্মচারীদের কেমন করে ঘুষ দিয়ে বশ করতে হয় এবং কেমন করে একজনের বিশ্বাসভাজন হয়ে ঠকাতে হয় তাকেই।

সালমিস্তারের গড়ন ছিল ছোটখাটো আর মুখখানায় সৌন্দর্যের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু তাহলেও দরকার মত লোকের চোখে নিজেকে কমনীয় করার কৌশল জানা ছিল তার। আবার প্রয়োজন হলে দুঃসাহসী, নিষ্ঠুরও হতে পারত সে চরমভাবে। এই সব ক্ষমতা ছাড়াও গুপ্তচরবৃত্তির একটি মস্তবড় মূলধন ছিল সালমিস্তারের—সেটা হচ্ছে এই যে, সে যখন কোন অপরাধে অপরাধী, তখনও তার মুখের দিকে চাইলে মনে হবে সরল নিদোষ সে, কোন রকম অসৎ কাজের ধার দিয়েই যেন চলে না সালমিস্তার।

যে সময়ের কথা হচ্ছে, সে সময় ইউরোপের প্রাণ টউৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

সামান্য একজন কর্শিকান সৈনিক থেকে ফ্রান্সের কর্ণধার হয়েছেন নেপোলিয়ন। সারা ইউরোপ দখল করবার সাহস তাঁর বুকে, আর পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন তাঁর চোখে। দগ্বিজয়ের সূচনাও দেখা দিয়েছে এরই মধ্যে—ফ্রান্সের সীমান্তবর্তী দেশগুলি তাঁর করতলগত হওয়ায়। দেশের লোকেরা যেমন ভয় করত নেপোলিয়নকে, তেমনি ঘৃণাও করত অনেকে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে যে সমস্ত বুরবোঁ বংশীয় রাজারা রাজত্ব করত, বহুলোকের ইচ্ছা—সেই বংশের কেউ এসে নেপোলিয়নকে হটিয়ে সিংহাসন দখল করুক, ফ্রান্সে শান্তি ফিরে আসুক। যদিও বুরবোঁ বংশীয়দের মধ্যে তখন প্রায় সকলেই নিহত কিংবা নির্বাসিত।

নেপোলিয়নের মত একজন অসামান্য শক্তিধর পুরুষকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত সালমিস্তার। তারও স্বপ্ন ছিল গুপ্ত ব্যবসায়ীর জীবন ছেড়ে উঁচুতে ওঠবার—রাজকীয় ব্যাপারে মাতব্বর হবার। সে মনে মনে ভাবত—আমি হয়তো তাঁর মস্ত কাজ করে দিতে পারি এক দিন, এবং তখন আমি কি যে হব তা কে বলতে পারে! তার এই কল্পনা সফল হবার সুযোগও আশ্চর্যজনক ভাবে এসে গেল একদিন।

নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে স্যাভারি নামে ছিল এক সেনাপতি। সে সালমিস্তারকে ভালভাবেই জানত। স্যাভারি একদিন তার কাছে গিয়ে বললে,

দেখ সালমিস্তার, তোমার মত একজন কাজের লোকেরই দরকার আমাদের দলপতির—তুমিই পারবে। রাজী আছ?

কথাটা শুনেই জ্বলজ্বল করে উঠল সালমিস্তারের চোখ দুটো। বললে, কি কাজ?

স্যাভারি তাকে বুঝিয়ে দিলে কাজটা কি। নেপোলিয়ন একটু অসোয়াস্তিতে রয়েছেন বুরবোঁ বংশীয় একজন লোকের জন্যে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কাজেই নেপোলিয়ন চান বুরবোঁদের দেখিয়ে দিতে, কেউ ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করলে তার পরিণাম কি হবে। এই রকমের একটা উদাহরণ উদাহরণ দেখাবার সুযোগ সে করতে পারে কিনা?

ব্যাপারটা ভাল করে শুনে নিয়ে সালমিস্তার বললে, আচ্ছা, যদি বুরবোঁদের কারুকে ভুলিয়ে আনতে পারা যায় সীমান্তের দিকে?

স্যাভারি বললে, ব্যস তাহলেই তো কেল্লা ফতে! তুমি তাকে ধরে ফেলবে, তারপর যা চূড়ান্ত হবার তা তো বুঝতেই পারছ!

কয়েক মিনিট আলোচনার পর ঠিক হল কাকে এই পূজোয় বলি দেওয়া হবে। তরুণ ডিউক এন্‌ঘিন জার্মানীতে বডেন শহরে বাস করছিলেন তখন। স্থির হল, তংাকেই ফাঁদে ফেলা হবে প্রথম।

কাজ আরম্ভ করে দিলে সালমিস্তার।

সে প্রথমেই জেনে নিলে ডিউকের নাড়ী-নক্ষত্র সব। এমন কি, ফ্রান্সের অন্তর্গত স্টাসবুর্গের এক ধনীর মেয়ের সঙ্গে যে তাঁর বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে তাও জেনে ফেললে। সালমিস্তার প্রথম করলে কি, সেই মেয়েটিকে মিথ্যা অজুহাতে বন্দী করে এনে রাখলে ফরাসী সীমান্তের একটা জায়গায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই ডিউক এন্‌ঘিন একটা চিঠি পেলেন তাঁর সেই বাক্‌দত্তার কাছ থেকে। তাতে লেখা ছিল—আমাকে এরা এখানে বন্দী করে রেখেছে কি কারণে জানি না। তুমি আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে না গেলে উপায় নেই, নিশ্চয়ই আমার একটা ব্যবস্থা করবে।

এ চিঠিও কার্ল সালমিস্তারের কারসাজি। কেমন করে হাতের লেখা নকল করতে হয়, সই জাল করতে হয়, তা তার ভালরকমই জানা ছিল। কাজেই ডিউক বিন্দুমাত্র সন্দেহ না ক'রে, মেয়েটিকে উদ্ধার করে বডেনে নিয়ে আসবার সংকল্প নিয়ে যাত্রা করলেন ফরাসী সীমান্তের দিকে। সেখানকার কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে একাজ তিনি হাসিল করতে পারবেন এই ধারণা নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন ডিউক।

কিন্তু ফল হল বিপরীত। সালমিস্তার ফাঁদ পেতে বসেছিল, ডিউক ফরাসী সীমান্তে প্রবেশ করবার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাজির করল কর্তৃপক্ষের সামনে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হল—সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে। দণ্ডাদেশ প্রচার হওয়ার দিনেই ডিউকের প্রাণ দিতে হল। সুন্দরভাবে ষড়যন্ত্রের উদাহরণ সাজিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হ'ল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কিছু করবার চেষ্টা করলে, অথবা সীমান্ত অতিক্রমেই উদ্যোগী হলে তার পরিণাম কি! এই কাজের সুদক্ষ পরিচালনার জন্যে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার মত পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল সালমিস্তারকে। শুধু তাই নয়, স্বয়ং ফ্রান্সের সম্রাটের গোপন বৈঠকে তার ডাক পড়ল এবং গুপ্তচরের কাজের গুরুত্বপূর্ণ ভার পড়ল সালমিস্তারের উপর।

নেপোলিয়ান প্রথম তাকে পাঠালেন আয়ারল্যাণ্ডে, তারপর ইংলণ্ডে গুপ্তচর হিসাবে। এই দু-জায়গার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, সম্রাট তার উপর ভার দিলেন সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজের। কাজটি হ'ল—অষ্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীর সমূহ তথ্য সংগ্রহ করে আনা। নেপোলিয়ন তখন অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন। তিনি সালমিস্তারকে বললেন, যা কিছু খবর তা সরাসরি সব আমার কাছে এসে জানাবে।

কয়েক দিন পর এক মজার ঘটনা ঘটল অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে। ফিল্ড মার্শাল কার্ল ম্যাক্ ছিলেন তখন অস্ট্রিয়-বাহিনীর অধিনায়ক। রক্ষীদল তাঁর সামনে হাজির করল এক বন্দীকে। বন্দী হলে হবে কি—চোখে তার ভয়ের লেশ মাত্র নেই, মাথা উঁচু করে দাঁড়াল এসে সে মার্শালের সামনে। ফরাসী সীমান্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মার্শাল সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

সালমিস্তার শান্ত ভাবে জার্মান ভাষায় বললে, আমার নাম কার্ল সালমিস্তার। আমি অস্ট্রিয়ার পক্ষে গুপ্তচরের কাজ করছি, এই অবিযোগে ফ্রান্স থেকে আমায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

—কিন্তু, তুমি তো আমার গুপ্তবাহিনীর লোক নও।

—না, আমি তা নই। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন সম্রান্ত হাঙ্গেরিয়ান। আমি কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সে বাস করছি।

রীতিমত অভিনয় করতে জানত সালমিস্তার। তার কথায় কেউ ধরতে পারল না যে, তার বাবা এলসেসের এক গরীব ধর্মযাজক ছিল। তার ভাবভঙ্গী দেখে কেউ ভাবতে পারল না যে, সে সম্ভ্রান্ত হাঙ্গেরীয় পরিবারের নয়। সে বলে

চললো, আমি অবশ্য গুপ্তচর নই, ফরাসীরা যা সন্দেহ করে; তবে গুপ্তচর হিসাবে আমি আপনার সহায়তায় লাগতে পারি—ঐ উদ্ধত ভুঁইফোঁড়টাকে শেষ করার কাজে।

নেপোলিয়ন সম্বন্ধে সালমিস্তারের এই মন্তব্যটা মার্শালের খুব মনের মত হয়েছিল। 'উদ্ধত ভুঁইফোড়!' বলে মার্শাল বার দুই কপচালেন কথাটা জোর গলাতে। ভালই লাগল তাঁর সালমিস্তারের কথাগুলো—লোকটাকেও মনে লাগল তাঁর। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ওকে অবশ্যই শেষ করা দরকার, কিন্তু তা তো সহজ নয়; দুর্দান্ত সেনাবাহিনী যে তার অধীনে!

সালমিস্তার মুখে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, যতটা আপনারা মনে করেন ততটা শক্তিশালী বাহিনী তার নেই। তাছাড়া ফ্রান্সের এমন বহু লোক আছে, যারা যে কোন বিরোধী দলে যোগ দিতে পারে নেপোলিয়নের শাসন-পাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে।

কয়েক ঘণ্টা ধরে চললো তাদের আলোচনা। মার্শাল যতই সালমিস্তারের কথা শোনেন্ ততই মুগ্ধ হন। অস্ট্রিয়ানরা এর আগে নেপোলিয়নের কাছে হেরে গেছে যুদ্ধে। ভয়ে ভয়েই দিন কাটে তাদের; কখন আবার অতর্কিত আক্রমণ করে বসে ফরাসীদের সেই ক্ষুদে কর্পোর‍্যাল! কাজেই তাকে উচ্ছেদ করবার দীর্ঘকালের স্বপ্ন বুঝি বা সফল হয় এবার। সালমিস্তারের সঙ্গে আলোচনা করে এই কথাই মনে হতে থাকে মার্শালের।

সংবাদ-সরবরাহকারী অফিসারের পদে সেই দিনই নিযুক্ত হল সামমিস্তার। মার্শাল বললেন, তোমাকে ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমাদের পক্ষে গুপ্তচরগিরি করতে হবে।

মাথা নেড়ে সালমিস্তার বললে, আমি আপনার শিবিরে থেকেই নেপোলিয়নের পতনের জন্যে যা করা দরকার তা করব। তা না হলে, ফ্রান্সে ফিরেগেলেই আবার ধরা পড়ে যাব, তখন আর কোন কাজেই লাগব না।

—তা সত্যিই, কিন্তু আমি তোমার মত একজন করিতকর্মা বুদ্ধিমান লোকই খুঁজছিলুম এই কাজের জন্যে।

—তার জন্যে আপনি ভাববেন না, ফ্রান্সে আমার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, যারা আমার মতই ধারণা পোষণ করে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমি তাদের সকলকে আপনার দলে টেনে আনতে পারব।

—চমৎকার প্রস্তাব, সালমিস্তার! তুমি তাই করো।

শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের গুপ্তচর ভিড়ে গেল তারই শত্রুর দলে, তাদের খুব বিশ্বাসী কর্মচারী হয়ে। মার্শাল তাকে সনদ দিয়ে তাঁর বাহিনীর প্রধান সংবাদ-সরবরাহ অফিসার করে দিলেন। আরম্ভ হল গুপ্তচরবৃত্তির বিস্ময়কর ঐতিহাসিক কাজ।

কয়েক দিনের মধ্যেই অস্ট্রিয়ানদের সম্ভ্রান্ত সমাজে সালমিস্তার হয়ে উঠল একজন মস্তবড় লোক। প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে উঠল সে। একদিকে সে যেমন পেতে লাগল অস্ট্রিয়ানদের কাছ থেকে মোটা বেতন,অপর দিকে তেমনি নেপোলিয়নের কাছ থেকে মাসোহারা।

রাজদরবার থেকে আরম্ভ করে,অফিসার ক্লাবে, সম্ভ্রান্ত সমাজে অবাধ হয়ে উঠল তার গতিবিধি। অটুট বিশ্বাস সে তখন জন্মিয়ে ফেলেছে কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর লোকেদের মনে।

ধীরে ধীরে মার্শালের মন থেকে নেপোলিয়ন-ভীতি একবারে দূর করে দিল সালমিস্তার। নানা কৌশলে মার্শালকে বোঝাতে লাগল যে, অস্ট্রিয়া আক্রমণ করবার কল্পনা নেপোলিয়নের নেই। তার ফরাসী সহযোগীদের লেখা চিঠি দেখাতে লাগল। তারা লিখছে—নিজের দেশের ভিতরকার ব্যাপারে নেপোলিয়ন ভীষণ ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। চিঠিপত্র ছাড়া নিয়মিত খবরের কাগজ আসত ফ্রান্স থেকে সালমিস্তারের কাছে। তাতে থাকতো ফ্রান্সের ভিতরকার বিপ্লবের কথা ; জনসাধারণ যে নেপোলিয়নের শাসনে সন্তুষ্ট নয়, তার কথা ফলাও করে ছাপা।

দিনের পর দিন এসব উপকরণের সাহায্যে সালমিস্তার মার্শালের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করে দিল যে, নেপোলিয়নের দেশেই তার বিরোধী দল বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। এই যে সব খবরের কাগজ আসত সালমিস্তারের কাছে, তা নেপোলিয়নের আদেশেই এ সব কাগজ পৃথক ভাবে ছাপিয়ে পাঠানো হত। বেচারা মার্শাল তার বিন্দুবিসর্গও সন্দেহ করতে পারেন নি।

এরপর একদিন সালমিস্তারের কাছে সংবাদ এলো—সম্রাট অস্ট্রিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, সে যেন শেষ দৃশ্যের অবতারণা তাড়াতাড়িই করে। খবর পেয়ে সালমিস্তার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো মার্শলের শিবিরে। উত্তেজনার ভাব দেখিয়ে তাঁকে বললে, মার্শাল আর দেরি নয়। সারা ফ্রান্স নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্স থেকে আমার চরের সকলেই গোপন খবর পাঠিয়েছে এই বিদ্রোহের। অস্ট্রিয়ার সীমান্তে যে সব ফরাসী বাহিনী ছিল, তাদের সব ফিরে যাবার হুকুম হয়ে গেছে। এই বিপ্লব দমন করবার জন্যে নেপোলিয়নের

ঐ সব সেনাদের সাহায্য ছাড়া উপায় নেই। আর দেরি নয়, মার্শাল ! ফরাসী বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করুন, অস্ট্রিয়ার জয় নিশ্চয়!

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল সালমিস্তার। দারুণ উত্তেজনা ও ভাবী বিজয়ের গর্বে লাফিয়ে উঠল মার্শাল। বললে, ঠিক বলেছ সালমিস্তার, আর বিলম্ব নয়!

মার্শাল তাঁর ত্রিশ হাজার বাছাই সেনাবাহিনীর উপর আদেশ জারি করলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা গেল—বিশাল অস্ট্রিয়ান বাহিনী উলম্ শহর ছেড়ে এগিয়ে চলেছে ফ্রান্সের অভিমুখে, সাল-মিস্তারের নির্দেশিত জায়গা লক্ষ্য করে। চলছে তারা বীরদর্পে, নিরুদ্বেগে জয়ের উল্লাসে। কিন্তু হঠাৎ কি যে হয়ে গেলো, মার্শাল ঠিক বুঝতে পারলেন না। দ্রুত এগিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি ; ভেবেছিলেন, হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে ফরাসী সেনারা ফিরে চলেছে তাদের রাজধানীর দিকে। কিন্তু একি! তারা তো চলে যাচ্ছে না, তারা তো এগিয়েই আসছে তাদের দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গেল। ফরাসীদের শত শত কামান উঠল গর্জন করে, আকাশ গেল ধোঁয়ায় ঢেকে, মার্শাল আরও জোর হেঁকে উঠলেন—দ্রুত এগিয়ে চলো।

দুর্দান্ত লড়াই বাধল দুই দলে। তিনদিন অবিরাম যুদ্ধ, আর অবিরাম বর্ষণ। রক্তে আর বৃষ্টির জলে রণস্থল রক্ত-কর্দমাক্ত এক বীভৎস আকার ধারণ করল! তবুও দুই দলের যুদ্ধে বিরাম নেই। সৈনিক আর তাদের বাহন ঘোড়াদের মৃতদেহে চারিদিকে স্তূপাকার হয়ে গেল। শরীর আর বইছে না, তবুও লড়ছে সৈন্যদল—ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়ছে দলে দলে।

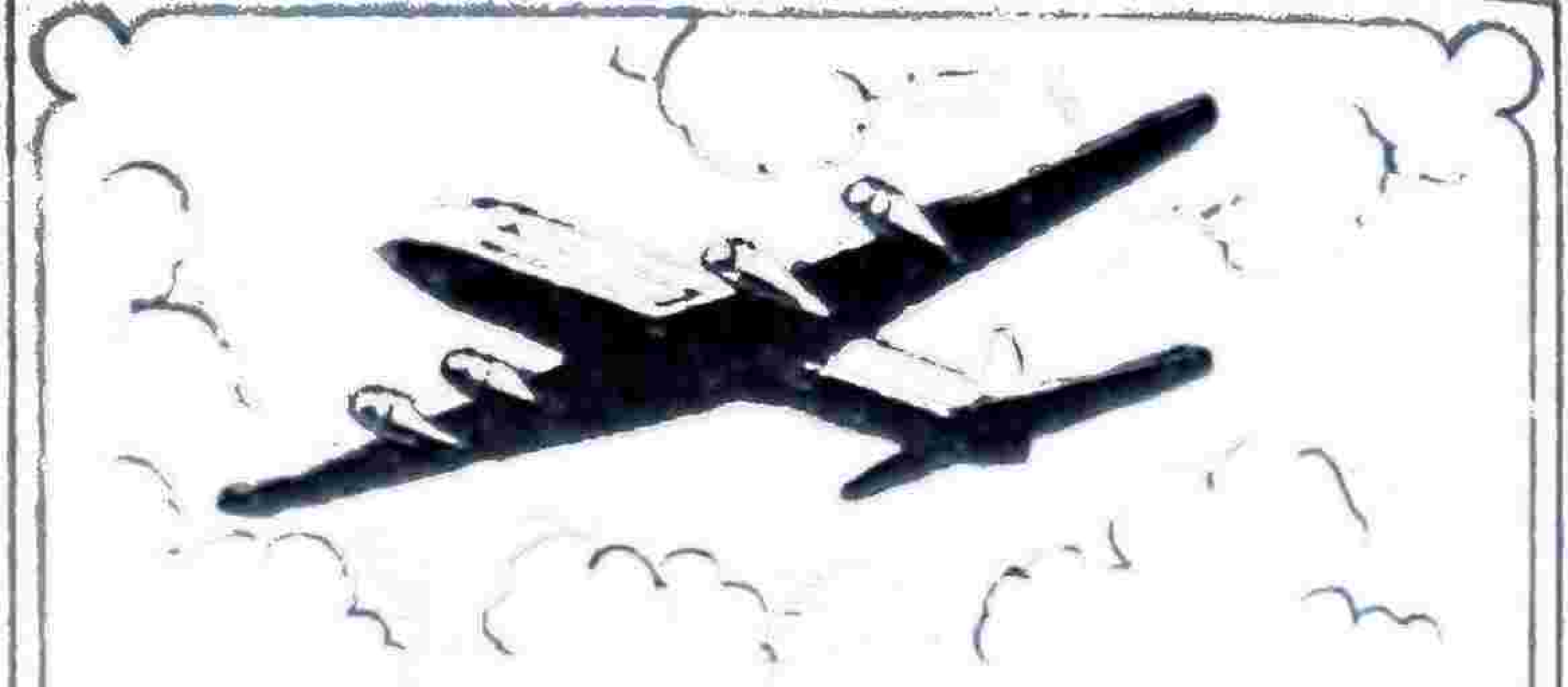
তৃতীয় দিনে মার্শাল তার অবশিষ্ট বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিলেন নেপোলিয়নের কাছে। কিন্তু তখনও তিনি কিছুই বুঝতে পারেন নি সালমিস্তারের কারসাজি। তারপর কোনমতে ফিরে এলেন ভিয়েনাতে—ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে বিষণ্ণ মার্শাল।

সালমিস্তার কিন্তু তার আগেই ভিয়েনাতে ফিরে এসেছিল। অস্ট্রিয়ার সম্রাটকে সে বুঝিয়েছিল যে, মার্শাল ম্যাকের জন্যেই এই পরাজয়। কারণ, ফরাসীরা প্রস্তুত আছে জেনেও তিনি তাদের আক্রমণ করতে এগিয়েছিলেন। অবশ্য এই মিথ্যা কথার বিরুদ্ধে মার্শাল ম্যাকের বন্ধুরা অনেক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার সম্রাটের মন থেকে এই ধারণা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে নেপোলিয়ানের বাহিনী আরও এগিয়ে এসেছে দেশের ভিতর।

সালমিস্তারের ফাঁদে আবার পড়ল অস্ট্রিয়ান বাহিনী—অস্টারলিজের বিখ্যাত যুদ্ধ, আর সেই যুদ্ধে জয়লাভ করে সমস্ত অস্ট্রিয়া দখল করলেন নেপোলিয়ন।

নেপেলিয়ন ভিয়েনাতে প্রবেশ করবার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত সালমিস্তার অস্ট্রিয়ানদের মনে এই বিশ্বাস অটুট রেখেছিল যে, সে তাদের বন্ধু, এবং তাদের জন্যেই সে সংগ্রাম করে চলেছে। কিন্তু যখন তারা তার আসল রূপ ধরতে পারল, তখন সালমিস্তার হাওয়া হয়ে গেছে ভিয়েনা থেকে । এর কিছুদিন পরে সে যখন আবার ফিরে এলো, তখন সে নেপোলিয়ন সরকারের এক পদস্থ সেনসর অফিসার। কিন্তু তার বিরুদ্ধে তাদের করবার কিছুই উপায় নেই।

সম্রাট নেপোলিয়নের জন্যে সালমিস্তার কি যে করেনি তার হদিস পাওয়া যায় না। হাজার হজার লোককে ঠকিয়েছে সে মিথ্যা কথা বলে, বিপুল সৈন্যবাহিনীকে ঠেলে দিয়েছে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। সালমিস্তার বহুজনকে প্রতারিত করেছে, কিন্তু কোন প্রবঞ্চনা করেনি কেবল নেপোলিয়নের সঙ্গে। নেপোলিয়নও তার কাজের জন্যে বরাবর তাকে পুরস্কৃত করেছেন মুক্তহস্তে—তার কোন আশাই অপূর্ণ রাখেননি তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সালমিস্তারের একটি অনুরোধ তিনি রক্ষা করেননি, সেটি হ'ল ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক উপাধি। তিনি বলেছিলেন, ওটা ছাড়া সব কিছু তাকে দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, কিন্তু একজন গুপ্তচরকে ঐ শ্রেষ্ঠ সম্মানের ভূষণে ভূষিত করতে তিনি পারবেন না।



শ্রীলঙ্কার বিমানদস্যু জয়তিলক

পৃথ্বীরাজ সেন

শ্রীলঙ্কা।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাব যে শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।

সেই কবে ফেলে আসা মহাভারতের যুগে রামায়ণ কাহিনীতে শ্রীলঙ্কা আমাদের মনে ছাপ ফেলেছিল। আজও সেই সম্পর্কের শেষ নেই।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে নানা পরিবর্তন। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র তীর্থ হিসেবে সুবিখ্যাত সিংহলের বুকে হিংসা দ্বেষ ছিল একেবারেই অচেনা।

ওখানকার সাধারণ মানুষ সুখ-দুঃখের তরণী ভাসাতো মহাসাগরের বুকে। রাজনীতির আবর্তে আলোড়িত হতো না তাদের হৃদয়।

তারা কোন গুপ্ত ঘাতকের গোপন হাতে তুলে দিতো না চকচকে শানিত ছুরি। তাদের কাছে জীবন বহমান ছিল শান্তির বিচিত্র স্রোতধারায়।

এমন করে কেটে গেছে একটির পর একটি বছর। সেদিনের সুপ্রাচীন শ্রীলঙ্কা পরিচিত হয়েছে সিংহল হিসেবে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে তার বুকেও ঘটে গেছে নানা রূপান্তর। আজ আর আগের মত অহিংসার পূজারী সে নয়। সে-ও মাঝে-মাঝে মেতে ওঠে হিংসার দানবীর আর্তনাদে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন ভুলে গেছে তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা।

গত কয়েক দশক ধরে এই শান্ত সুন্দরদ্বীপের বুকে অনুষ্ঠিত হয়েছে একটির পর একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থান।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহী নায়কেরা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে গেছে। সফল তারা হতে পারেনি সত্যি। কিন্তু শ্রীলঙ্কার বুকে উন্মাদনার আগুন জ্বালিয়ে তার চিরশান্ত জীবনধারাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে।

১৯৭১ সাল।

সমস্ত এশিয়া জুড়ে হিংসার দামামা বেজে উঠেছে। ভারতে, ভিয়েতনামে, লাওসে, কম্বোডিয়া, ইরাকে, ইরাণে, পাকিস্তানে শোনা যাচ্ছে বিচিত্র হিংসার উৎকট উল্লাস।

ইউরোপ থেকে ছুটে আসা হিংসার কালো মেঘ আক্রান্ত করেছে গোটা সিংহল।

যে যুবকরা এতকাল সনাতন জাতীয়তাবাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করতো, তারাই এখন বিচিত্র খেয়ালে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করতে চায়। তারা আর মানবে না কোন সামাজিক বাধানিষেধ। তাদের কাছে মূল্যবোধের কোন দাম নেই। তারা নিজেদের খুশীমত জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে।

এই অস্থির অশান্ত আশ্চর্য মুহূর্তে উদ্ধত যুবকরা মেতে উঠেছিল বিচিত্র রোমাঞ্চে। কখনও বা তারা অকারণে শুরু করতো প্রচণ্ড দাঙ্গা। তাদের আক্রমণের সামনে পুলিশ বাহিনী দিশেহারা হয়ে যেতো।

সব ব্যাপারে পিছিয়ে পড়া দেশ সিংহল। একটি ক্ষেত্রে অসাধারণ ইতিহাস রচনা করেছিল।

পশ্চিমের অতি উন্নত দেশগুলিতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে পুরুষের হাতে স্থাপিত ছিল। যদি বা দুই একজন মহিলা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এসে হাজির হতো, কিন্তু সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে বেশী দূর তারা অগ্রসর হতে পারতো না।

এমনই মুহূর্তে সিংহল গোটা বিশ্ববাসীকে একেবারে অবাক করে দিলো। এক মহিলা, সিরিমাভো বন্দর নায়েক এই দ্বীপের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন।

নানা সমস্যার ভারে জর্জরিত শ্রীলঙ্কার শাসনভার নিজের হাতে নিয়ে বন্দরনায়েক হয়তো কিছুটা বিব্রত হয়েছিলেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যেমন নানা সমস্যা এসে ভিড় করেছিল তেমনভাবেই শ্রীলঙ্কার রাজনীতি আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল একাধিক প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী। তারা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীকে বিপদে ফেলতে চেয়েছিল।

এদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো সনাতন পন্থী বৌদ্ধরা। যদিও বৌদ্ধধর্মের নিয়ম নীতি অনুসারে অহিংসাই পরম ধর্ম, কিন্তু সিংহলের এইসব বৌদ্ধ রাজনীতিবিদেরা যে কোন ভাবে ক্ষমতা দখল করার নেশায় মেতেছে। তারা নানা অসৎ উপায়ে শ্রীলঙ্কার রাজনীতির দিগন্তকে অন্ধকার করতে চাইছে।

আর আছে উগ্র আঞ্চলিকবাদী তামিলরা। তারা দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের আলাদা স্বদেশ ভূমির জন্যেই তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিল। এরাও ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রীলঙ্কার সরকারকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি দাঁড় করালো।

শ্রীলঙ্কাতে মুষ্টিমেয় যে সব মুসলমানরা দীর্ঘদিন সুখে শান্তিতে বসবাস করে এসেছে তারাও এবার আরব দুনিয়ায় তরল সোনার টাকায় উন্মাদ হয়ে উঠলো। তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হলো আলাদা বাসস্থানের অন্যায় দাবী।

এই তিন বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে বেশ বিচলিত মনে হয়েছিল।

তাছাড়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি উৎপাদনের অভাব, বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণেও শ্রীলঙ্কার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল।

এমনই এক বিশৃঙ্খল মুহূর্তে সিংহলের চার বেপরোয়া উদ্দাম যুবক নতুন একটি গুপ্ত দলের জন্ম দিলো। তারা এদলের নাম দিলো সিলন টেররস। অর্থাৎ সিংহলের আতঙ্ক। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের অ্যাথলেট রণসিংহে ছিল এই দলের অধিনায়ক।

নিয়মিত খেলাধুলো করাতে দারুণ সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী সে। মনে আছে দুর্জয় দুর্নিবার সাহস। খোলামেলা সাদাসিধে ধরনের মানুষ। হাসতে হাসতে যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে পারে।

জীবনের শুরু থেকেই সিংহলের গ্রামে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ঘুরেছে সে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করেছে, এক অবদমিত জাতির জাতীয় লজ্জাকে! দেখেছে কেমন ভাবে মুষ্টিমেয় সিংহলী ব্যবসায়ী চা বাগিচার মালিক হয়ে বিত্তেবৈভবে জীবন কাটায়। আর লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে পাবে না।

সূর্য ওঠার আগে থেকে যারা, যেসব ফুলের মত কোমল নিষ্পাপ মেয়েরা দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সন্ধানে বেতের টোকরি হাতে চা বাগিচায় কাজ করে, দিনের শেষে যারা অনন্ত ঐশ্বর্য তুলে দেয় প্রভুর হাতে, সপ্তাহ শেষে তাদের ভাগ্যে জোটে সর্দারের অকথ্য গালিগালাজ।

এইসব অন্যায় সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবে রণসিংহে। অহিংসায় তার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।

সে জানে হাজার বছরের জমাট অন্ধকারের বুক চিরে সামনের লাল সূর্যকে ছিনিয়ে আনতে হিংসার আশ্রয় নিতেই হবে।

তাই সে গঠন করেছে সিলন টেররস, যারা বড়লোকের চোখের পাতায় লেপন করবে নিদ্রা হীনতার আতঙ্ক। তাই এই ভয়ঙ্কর কাজে সঙ্গী হয়েছে সাতাশ বছরের সিভিল ইঞ্জিনীয়ার জয় তিলক। সে হলো মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার বাবা সিংহলের ফরেন সার্ভিসের থার্ড সেক্রেটারী। কাজের সূত্রে তাকে নানা দেশে ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করতে হয়েছে। বাবার সঙ্গে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পা রেখেছে জয়তিলক।

তাই সে পাশাপাশি চিনেছে নানা সমাজকে, বুঝতে শিখেছে দেশ থেকে অন্য দেশে শোষণের কোন পরিবর্তন হয় না। ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, রাশিয়া কিংবা আফগানিস্তানের ধনীরা তাই একই ভাষায় কথা বলে। আর দরিদ্ররা একই ভাবে নির্যাতিত হয়।

ছাত্র হিসেবে মেধাবী ছিল সে। যদিও কোন একটি বিশেষ স্কুল থেকে পড়াশুনা করতে পারেনি জয়তিলক। কিন্তু যেখানেই সে গেছে সেখানে মেধার ছাপ রেখেছে।

কুয়ালালামপুরের ন্যাশনাল স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জয়তিলক ভর্তি হয়েছিল মাদ্রাজের সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে। সেখানে বিশেষ সম্মান নিয়ে পাশ করেছে সে।

তারপর যোগ দিয়েছে এক বিশ্ববিখ্যাত কনস্ট্রাকশান কোম্পানীর লোকাল ব্রাঞ্চে। কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের আপাত রুক্ষ মনের অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক পরম হৃদয়। সে ইট কাঠ পাথরের শুকনো খাঁচায় রচনা করবে না প্রাণহীন জীবনের মহাকাব্য। তাকে ভালবাসার ছোট্ট কুটিরে সৃজন করতে হবে অমলিন আত্মার প্রত্যয়কে। এর জন্য চাই অনেক ত্যাগ, অনেক অঙ্গীকার।

দলের তৃতীয় সদস্য রয় ডায়াস। বয়স মাত্র তেইশ বছর। ইতিমধ্যে সকলের কাছ থেকে সম্মান আর সম্ভ্রম আদায় করেছে সে।

রণসিংহের বা জয় তিলকের মত তাত্ত্বিক নেতা সে নয়। তার অন্তরে আবেগের কোন স্থান নেই। সে কঠিন বাস্তবের মানুষ। সমাজের সবকিছুকে খোলা চোখে দেখতে ভালবাসে।

বলা যায় তার মধ্যে লুকিয়ে আছে দারুণ ছটপটে দুরন্ত দুর্মর এক অশান্ত পুরুষ।

কর্তব্যের ডাকে রয় ডায়াস দারুণ গম্ভীর হয়ে যায়। অন্যায়ের সাথে কোনদিন কোন আপোষ করেনি সে। যেখানেই অত্যাচার সেখানেই সে প্রতিবাদ জানিয়েছে দৃপ্ত কন্ঠে।

অনেকবার নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তার ওপর। তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে। সে নাকি বিদেশী চোরাচালানকারীদের সাথে যুক্ত আছে।

শত্রুরা তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। তাই অনেকের মনে তার আসন অত্যন্ত উঁচুতে। বিশেষ করে সিংহলের যুবকরা রয় ডায়াসকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

তারা জানে ঐ তরুণতম যুবনেতার হাতে আছে এক আশ্চর্য যাদুকাঠি। যা দিয়ে সে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত, অপমানিত অবহেলিত সিংহলবাসীকে বেঁচে থাকার নতুন মন্ত্র শেখাবে।

সাধারণ মানুষের এই আশ্চর্য ভালোবাসাকে পাথেয় করেই রয় ডায়াসের পথচলা শুরু হয়। সে জানে রাজনীতির আসর মাত করার মত কোন গুণ-ই-নেই তার। সে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। কিন্তু নাম না জানা হাজার হাজার যুবক-যুবতী প্রাণভরা ভালোবাসার লাল আগুনে উদ্দীপ্ত তার হৃদয়।

তাই তো সে দৃপ্ত কন্ঠে উচ্চারণ করে লং লিভ রেভলিউসন।

সিলন টেররস দলের সর্বকনিষ্ঠ সভ্যের নাম গুণতিলক। তার বয়স মাত্র উনিশ বছর। এখনও সাবালক হয়নি সে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার মনের গহনে জ্বলে উঠেছে প্রতিবাদের আগুন।

সে মিডল কলম্বো স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট। নিজে ছাত্র হওয়াতে সমাজের এক ব্যাপক অংশের সাথে মিশতে পারে সে। তার এই সহজাত গুণটির জন্যেই রণসিংহে তাকে দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে মনোনীত করেছে।

এত অল্প বয়সে এত বড় সম্মান পেয়েও একটুও বিভ্রান্ত হয়নি সে। সে জানে কাজের দ্বারাই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। কিশোর বয়সে যে সম্মানের শিরোপা সে মাথায় পরেছে তার আসন অবিচল রাখতে হবে তাকে।

মনের দিক থেকে সে হলো কঠিন ও কোমলের আশ্চর্য সংমিশ্রণ।

নবজাতক সিলন টেররস এর পরিচয় তো জানা হলো।

আমরা দেখলাম, বয়স কিংবা মনের দিক থেকে বিন্দুমাত্র মিল না থাকলেও একটি ব্যাপারে সবাই সংঘবদ্ধ।

তা হলো—সিংহলের মুক্তি অন্বেষণ।

তারা জানে, আমাদের কান্না, শ্রম আর রক্তের বিনিময়ে রচিত হবে নতুন ইতিহাস। আজ যদি নিজেদের কাজে ভুল করি, যদি শিথিলতা দেখাই—তাহলে ইতিহাসের পাতায় আমাদের নাম লেখা হবে বিশ্বাসঘাতকতার কালো আঁচড়ে। আমরা কোনদিনই অগ্নিশুদ্ধ বিশ্ববীর সম্মান পাবো না।

এখন সিলন টেররস এর আসর বসেছে উত্তর কলম্বোর উপকণ্ঠে। সেখানে আছে একটি বিলাস বহুল বাগান বাড়ী, যা তাদেরই এক বন্ধু দিলীপ মেণ্ডিসের। দিলীপের বাবা খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, কাজের চাপে বারো মাসই তিনি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ান।

যদিও দিলীপ গোপন দলের কিছুই জানে না। কিন্তু তাদের ওপর সহানুভূতি আছে তার। সেও স্বীকার করে যে সিংহলের বুকে সুদীর্ঘ কাল ধরে চলেছে অন্যায় অত্যাচার।

১৯৭১ সালের ৫ই ফ্রেব্রুয়ারী বিকেল পাঁচটায় সেই বাগান বাড়ীতে চার বন্ধু মিলিত হয়েছে গোপন পরামর্শে।

আসুন, আমরা কান পেতে শুনে নি তাদের সংলাপ। কারণ এরই ভিত্তিতে রচিত হতে চলেছে সিংহলের আগামী ইতিহাস। তাদের অনুচ্চ কণ্ঠের আলোচনাকে আমরা ধরে রাখি।

দলের অধিনায়ক রণসিংহে থেমে থেমে কথা বলে। প্রতিটি কথার মধ্যে জোর দেয় সে। মনে হয় সে বুঝি তার প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কোন রকম সুযোগ দেবে না।

রণসিংহের মুখ থেকে শোনা গেল বিমান ছিনতাই করার অভাবনীয় পরিকল্পনার কথাটা।

সে বললো—যদি আমাদের কণ্ঠস্বরকে পৃথিবীর সকলের কানে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে এমন কিছু করতে হবে যা সিংহলের ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি।

......আমরা কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা কিংবা লুটতরাজের মধ্যে যাবো না। আমরা সিলনের ভারতগামী বিমান ছিনতাই করে দুবাইয়ের দিকে যাত্রা করবো।

তার এই আশ্চর্য উচ্চারণে দলের আবার তিন সদস্য বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

তারা কেউ ভাবতে পারেনি যে রণসিংহে এমন একটা কাজ করতে চলেছে।

নিজের শক্তি সামর্থ্যের ওপর কতখানি আস্থা থাকলে বিমান ছিনতাই করা যেতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। রণসিংহের কথা শেষ হতেই ডায়াস চিৎকার করে বললো—এটাই কি আপনার শেষ সঙ্কেত?

ছটফটে ডায়াসের প্রশ্নে এতটুকু বিচলিত হলো না শান্ত স্থির রণসিংহে।

সে হাসতে হাসতে বললো—তুমি তো জানো ডায়াস, কোন কথা আমি দুবার বলি না। যা বলি অনেক চিন্তা করেই বলি।

জয়তিলক বলে—সমস্ত ব্যাপারটা আপনি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। তারপর কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসবেন।

এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো ক্যাপ্টেন রণসিংহের।

সে গলার স্বর চড়িয়ে বলে—তোমার কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্ন আশা করিনি জয়তিলক। আমি জানতাম, আমাদের দলের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

....আমি আবার বলছি, এটাই আমার প্রথম ও শেষ আদেশ। মনে করতে পারো সিলন টেররস-এর ক্যাপ্টেন হিসেবে তোমাদের আদেশ দিচ্ছি আমি।

দলের সবচেয়ে কমবয়েসী সদস্য গুণ তিলক সাধারণতঃ কোন প্রশ্ন করে না। আজ তার মনেও অশান্তির ছোঁয়া লেগেছে।

সে বললো—প্লেন হাইজ্যাকের টারগেট সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কি?

—তোমার প্রশ্নে খুশী হলাম। দেখছি, তুমিই কেবল আমার ওপর আস্থা রেখেছো। তাহলে শোন, আমরা আগামী ২৮ শে ফেব্রুয়ারী বিমান ছিনতাই করবো।

সকলের দিকে তাকিয়ে রণসিংহে জোর দিয়ে বলতে থাকে—এবার যা বলবো তা খুব মন দিয়ে শুনবে। কারণ হাতে মাত্র তেইশটা দিন আছে।

তার কণ্ঠস্বরে আছে এমন এক মত্ত মাদকতা যা সকলের মন ভরিয়ে দেয়।

সত্যি থমথমে নীরবতা নেমে এলো সমস্ত পরিবেশে। সকলে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। রণসিংহে বলতে শুরু করে—তোমরা এই ম্যাপটার দিকে তাকাও...

সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ চলে যায় টেবিলের ওপর রাখা ম্যাপটার দিকে। এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়া সিলনের এয়ার ওয়েজের মানচিত্র। এটার দিকে চোখ রাখলে সহজেই বোঝা যাবে বিমানটি কোথা থেকে টেকআপ করছে এবং কেমন ভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিশেষ মনযোগ নিয়ে তাকিয়ে রইলো রণসিংহে। তার মন বলছে, তাকেই প্রধান দায়িত্ব নিতে হবে।

অনেকক্ষণ ধরে ম্যাপটি দেখার পর বেশ কিছু প্রশ্ন এসে ভীড় করলো সকলের মনে। তাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিল রণসিংহে।

এবার শুরু হবে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। যার প্রতিটি অক্ষরই তাদের জীবনে নিয়ে আসবে সাফল্য অথবা ব্যর্থতার সংবাদ।

সেই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে তারা সব চিন্তা ভাবনা করেই এই পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। এর অন্তরালে আছে তাদের সুদীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি। বিশেষ করে রণসিংহে সব দিক চিন্তা না করে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। এটা তার চরিত্রের এক প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

একটি একটি করে দিন কাটতে থাকে। তারা ক্রমশই আসন্ন ২৮শে ফেব্রুয়ারীর জন্য মানসিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে যে ঐ প্লেন হাইজ্যাকের মাধ্যমেই নির্যাতিত সিংহলের জ্বালা যন্ত্রণার কথা বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছে দিতে হবে।

২৭শে ফেব্রুয়ারী।

রাতের বয়স হলো অনেক।

দক্ষিণের সমুদ্র থেকে হু হু করে ছুটে আসছে লবণাক্ত বাতাস।

তারা এসে মনটাকে কেমন যেন আনমনা করে দেয়।

মনে হয় এ জীবনের সবকিছুই অত্যন্ত তুচ্ছ।

আর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই শুরু হবে ফাইনাল টেক অফ। এবার তারা যাত্রা করবে মরণ সাগরে। শেষবারের মত পরিকল্পনার ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে তারা।

ঠিক করা হয়েছে যে তারা চারজনেই কলম্বো এয়ারপোর্ট থেকে বিমানে উঠবে। তাদের গন্তব্য হলো এয়ারপোর্ট ম্যাড্রাস।

এই যাত্রা দলের সময় সীমা মাত্র সাইত্রিশ মিনিট।

অর্থাৎ তার মধ্যেই কাজ হাসিল করতে হবে।

নিখুঁত পরিকল্পনায় এগিয়ে চলবে এই আক্রমণ। প্রতিটি মুহূর্তকে তারা কিনবে জীবনের বিনিময়ে! তাই অর্থের মাপকাঠিতে এর কোন বিচার করা যাবে না।

২৮শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য এসে উঁকি দিল পূবের আকাশে।

প্রতিদিনের মত আলোর অজস্র উৎসবে মেতে উঠলো ধরিত্রী।

তখনও কেউ জানে না, কেমন ভাবে চারজন যুবক বুকে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে মৃত্যুর উপত্যকায়।

ভাগ্যিস তারা জানে না। জানলে এদের কোন স্বপ্নই সফল হতো না।

সিলন এয়ার লাইনসের ইনভেস্টিগেসন সিস্টেম খুবই সাধারণ ধরনের। কখনও তেমন কোন যাত্রীর আগমন ঘটেনি বলে এ ব্যাপারে তারা খুব একটা মাথা ঘামায় না।

তারা ভাবতেই পারছে না, আজ দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্য একেবারেই হারিয়ে যাবে। আজ থেকে এক নতুন সিংহলের আবির্ভাব ঘটবে। যে দেশ শোষণের বিরুদ্ধে অন্তহীন সংগ্রামে মেতে উঠতে চাইছে।

সাধারণ ভাবেই টেক অফ হয়ে গেল।

বিমান উড়ে চললো সমুদ্রের ওপর দিয়ে। তার গন্তব্য ভারতভূমি। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হলো চা ও কফির ব্যবসায়ী। নেহাত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়ে চলেছে।

অবশ্য এদের মধ্যে দু-চারজন সৌখিন পর্যটকও রয়েছে। তারা ইচ্ছেমত এদেশ থেকে ওদেশে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কাছে দুদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের শেষ নেই।

সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশ জন যাত্রী রয়েছে এই বিমানে।

আধ ঘন্টায় এই ছোট্ট জার্নি ক্লান্তির সামান্যতম অবকাশও নেই।

তাই সকলেই খুশীতে মশগুল। তাদের মনের মধ্যে জমে থাকা চিন্তা ভাবনার মেঘেরা এখন উধাও হয়ে গেছে।

একুশ মিনিটের মাথায় শেষে সঙ্কেত ধ্বনিত হলো। এবার তৈরী হতে হবে। কারণ একবার যদি বিমানটি ভারতীয় দরিয়ায় ঢুকে পড়ে তাহলে তাকে আর ছিনতাই করা সম্ভব হবে না।

খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে রণসিংহে বলতে শুরু করে,

—এই বিমানের যাত্রীরা, আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু বলার আছে। আমি জানি আপনারা হলেন সমাজের বিত্তশালী সম্প্রদায়। অনেক মানুষের শোষণ আর অত্যাচারের কালো রক্ত লেগে আছে আপনাদের হাতে। আপনারা ইচ্ছে করে হাজার হাজার সাধারণ সিংহলবাসীকে দারিদ্র্য সীমার নীচে ঠেলে দিয়েছেন।

....দীর্ঘদিন ধরে তারা মুখ বুজে সহ্য করেছে এই অত্যাচার। এবার শোষিত আত্মার ঘুম ভাঙছে। তারা কিছুতেই ঐ অন্যায়কে বেশী দিন মেনে নেবে না।

.....আপনাদের ধারাবাহিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে আমরা এই বিমানটিকে ছিনতাই করতে চলেছি।

এর পরেই শোনা গেল জয়তিলকের উদাত্ত কণ্ঠস্বর।

—আপনারা যে যার আসনে যেমন ভাবে বসে আছেন, ঠিক তেমন ভাবেই বসে থাকুন।

....মনে রাখবেন, আমরা আইন হাতে নেবো না। কিন্তু আপনারাও এমন কিছু করবেন না যাতে আমাদের হত্যাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।

তার কথার মধ্যে লুকিয়ে ছিল আশ্চর্য মোহিনী শক্তি।

তাতেই যাত্রীরা স্থির হয়ে যায়। প্রতিবাদের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে।

তারা বুঝতে পারছে, অভিশপ্ত বিমানটি ক্রমশঃই চোখের আড়ালে চলে যাবে। তাদের ওপর শুরু হবে দারুণ অত্যাচার, হয়তো বা কোন কোন হতভাগ্য যাত্রীর জীবন নিয়ে চড়া মূল্য ঘোষিত হবে।

কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই তাদের। এই মুহূর্তে বাধা দেওয়া মানে, মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা।

আগে থেকেই ঠিক ছিল যে রয় ডায়াস প্রধান ভূমিকা নেবে।

কিন্তু মুহূর্তের উত্তেজনায় নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেললো সে।

এই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তার হাতের অটোমেটিক রিভলবার কেড়ে নিলো জয়তিলক।

এতদিন সে সযত্নে রোপণ করেছিল একটি স্বপ্নকে।

সেই স্বপ্ন হলো—সিংহলের জন্য নিজের জীবন দান। এখন বুঝি সেই স্বপ্নটাই সফল হতে চলেছে তার।

সিভিল ইঞ্জিনীয়ারের চোখে ঝলসে ওঠে আশ্চর্য আগুন।

চাপা কণ্ঠে সে পাইলটকে নির্দেশ দিলো—ফ্লাই টু-দুবাই।

আর্থ কনট্রোল সিস্টেম বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়ে বিমানটি ভাসছে মহাশূন্যের পথে। যেন পথহারা এক পাখী নীড়ের সন্ধান পাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে টেলিকমিনিউকেশনের মাধ্যমে। আবার সবকিছু ঢাকা পড়ে যায় জমাট নিস্তব্ধতায়।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হচ্ছে হাইজ্যাকারদের মন। যতই কমে আসে পথের দৈর্ঘ্য ততই তারা নতুন উৎসাহে মেতে উঠে।

অবশেষে সমস্ত আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে বিমানটি এসে নামলো দুবাইয়ের গরদাপি এয়ারপোর্ট।

দু' আঙ্গুল তুলে জয়ের 'ভি' চিহ্ন দেখালো রণসিংহে।

তার সাথে নেমে এলো আর তিন সঙ্গী। কিন্তু তারা ভাবতেই পারে নি যে এয়ারপোর্টের লনে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে দুবাই পুলিশের কঠিন অভিবাদন।

আরব ভূমিতে পা রাখার সাথে সাথে বন্দী করা হলো তাদের। পাঠানো হবে বিশেষ ট্রায়বুনালে।

ঘটনার অভাবিত পরিসমাপ্তিতে সিলন টেররস-এর-তরুণ যোদ্ধারা দারুণ হতাশ হয়ে পড়েছে।

দিনের পর দিন ধরে, রাতের পর রাত জেগে তিল তিল করে তারা যে পরিকল্পনা রচনা করেছিল, যার অন্তরালে আছে তাদের পরিশ্রম, কান্না, বুকের উষ্ণ রুধির, হৃদয়ের ভালোবাসা—তা আজ এক লহমায় হারিয়ে গেল।

তাই বুঝি আবেগের দংশনে বিভ্রান্ত হয়ে জয়তিলক ট্রিগারে আঙ্গুল রাখে।

সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বুক চিরে চলে যায় উত্তপ্ত সীসা।

রক্ষীদলের একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগেই জয়তিলকের কাতর আর্তনাদ মনকে সচকিত করে তোলে।

রণসিংহে দেখতে পেলো তার দলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর জয়তিলকের পাঁজরের কাছে বুলেটের চিহ্ন।

পর মুহূর্তেই স্বদেশ ভূমি থেকে দূরে আরবের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো এক বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক সিভিল ইঞ্জিনীয়ার জয়তিলক।



মৃত্যুর মুখোমুখি

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাসটা যেখানে নামিয়ে দিলো সেখান থেকে বাড়ি বড়জোর মিনিট দুয়েকের হাঁটাপথ। প্যাট্রি পিঠে তুলে নিলো কিটস্ ব্যগটা, তারপর জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করলো।

ওর মনের মধ্যে খুশির ঢেউ তোলপাড় করছে। কী আনন্দ। কী আনন্দ!

পরিবেশটাও চমৎকার। আকাশে ঝকমকে রোদ্দুর। দুদিকে হলুদ পাকা গমের ক্ষেত। হু হু করে হাওয়া দিচ্ছে। সবুজ গাছগাছালিতে ছায়াচ্ছন্ন সরু পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। আকাশে বাতাসে অফুরন্ত মুক্তির স্বাদ।

ঐ-ঐ তো, ঐতো ওদের খামার বাড়ি। আদিগন্ত হলুদের মধ্যে মিশে গেছে। বাড়ির সামনের লনে, হ্যাঁ ঐ তো মা।

নিমেষে তেইশ বছরের প্যাট্রি শার্প বালিকা হয়ে গেলো। প্রাণপণে ছুট দিলো ওর মায়ের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই প্যাট্রি গিয়ে আছড়ে পড়লো বারবারা শার্পের ওপর,—মা, মা, হ্যাপি বার্থ ডে! কী মজা, কী মজা!

বলতে বলতে সে সজোরে জাপটে ধরে মোটাসোটা মাকে আর অবিশ্রান্ত চুমু খেতে থাকে মায়ের গালে,—আজ তোমায় ছাড়ছি না। ছাড়বো না।

মাও ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছেন মেয়েকে,—ওরে পাগলি, কখন এলি?

এইমাত্র।—মায়ের বুকে মুখ গুঁজে প্যাট্রি বললো : পাপা কোথায়? দাদারা?

সবাই আছে।—বারবারা হাসতে হাসতে বললেন ঃ ঐ দ্যাখ, তোর বাবা তোকে ঠিক দেখতে পেয়েছে। গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। হিংসুটে লোক তো, ভাবছে, মেয়ের আদর সবটাই বুঝি মা পেয়ে গেলো।

প্যাট্টি মুখ তুললো। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলো,—হ্যাল্লো, পাপা, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড!

হাই প্যাট্টি ডালিং।—প্যাট শার্প হাসিমুখে দুহাত বাড়িয়ে দিলেন ঃ কাম অন্।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৯১। আমেরিকার ওরিগন প্রদেশের এই 'গ্রস ভ্যালি' গ্রামের শার্পদের খামারবাড়িতে শুধুই উৎসবের আনন্দ। দিনটা শনিবার। সপ্তাহান্তিক ছুটির প্রথম দিন। উপরন্তু আজ আবার শ্রীমতী বারবারা শার্পের জন্মদিন। দুই ছেলের একজন থাকে নিউইয়র্কে, অন্যজন ওয়াশিংটনে। সবার ছোট মেয়ে প্যাট্টি কাজ করছে সাংবাদিকতার, সে আজ এখানে, কাল ওখানে। ফলে কারও সঙ্গেই কারও দেখা সাক্ষাৎ হবার বিশেষ সুযোগ হয়ে ওঠে না। প্রায় একমাস পর আজ আর কাল দু-দুটো দিন একসঙ্গে থাকবে, খাবে, বেড়াবে—তারিয়ে তারিয়ে সবাই মিলে উপভোগ করবে ছুটির মজা।

দুপুরে বেশ গুছিয়ে খাওয়াদাওয়া হলো। তারপর ওরা সবাই মিলে বসলো টেলিভিশনের সামনে। প্যাট্টি একটা ডকুমেন্টারি ভিডিও-ফিল্মে সহকারী পরিচালকের কাজ করেছে। সেই ফিল্মেরই ক্যাসেট ও নিয়ে এসেছে বাবা-মা দাদাদের দেখাবার জন্যে।

প্যাট্টি সবচেয়ে ছোট, বাবা-মা দাদাদের খুব আদরের। তার মধ্যে আবার বাবারই ও বেশি ন্যাওটা। বাবা প্যাট শার্পও মেয়ে বলতে অজ্ঞান। তাঁর কথা, প্যাট্টি পারে না, এমন কিছু নেই।

ছবিটা দেখতে দেখতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—বা, বা, এই কম্পোজিশনটা তো দারুণ হয়েছে। কী রে, তোরা বল্?

দাদারাও সায় দিয়ে উঠলো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা ওর প্রথম কাজ। মনেই হচ্ছে না।

প্যাট্টি লজ্জারক্ত মুখে হাসলো,—যাঃ, তোমরা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছো।

ছবিটা শেষ হলো। দুই দাদা উঠে গেলো। অনেকদিন পর এমন ছুটির দিন, একটু বিছানায় গড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছে।

প্যাট শার্প বললেন,—প্যাট্টি, এবার কি করবি? খানিকক্ষণ আকাশে ঘুরলে মন্দ হয় না। কি বলিস?

দারুণ, দারুণ হবে।—প্যাট্টি লাফিয়ে উঠলো : চলো পাপা। আমি চট করে ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। কতকগুলো টপ্ শট ট্রাই করবো।

প্যাট গেলেন, নিজের লনের দিকে। প্যাট্টি ছুটলো দোতলায় ওর প্রিয় ৩৫ মি.মি. ক্যামেরাটা আনতে। প্যাট্টির তেরো বছরের জন্মদিনে বাবার উপহার।

একটু পরেই লনের পাশের হ্যাঙার থেকে ছোট্ট প্লেনটি বেরিয়ে এলো। কয়েকবার পাক খেলো জমিতে, তারপর সোঁ-ও-ও করে উঠে পড়লো আকাশে। টু-সিটার বেবি প্লেন। সামনে চালকের আসনে প্যাট শার্প, ঠিক পিছনের একমাত্র সিটে প্যাট্টি।

অনেকদিন পর বাবার সাথে আকাশভ্রমণে বেরিয়ে প্যাট্টির আনন্দ বাধা মানছে না। সে কলকল করে উঠলো,—ঐ ঐ দেখো গমের খেতের পাশ দিয়ে ছোট্ট নদীটা। ঠিক যেন হলুদ সমুদ্রের মাঝে রুপোর ফিতে।

বলতে বলতে সে 'ক্লিক্-ক্লিক্' করে যাচ্ছে ক্যামেরা নিয়ে। প্যাটও তাল মিলিয়ে যাচ্ছেন,—এক কাজ কর প্যাট্টি। এবার তুই আমাদের অঞ্চল নিয়ে একটা ছবি তোল্। টাকার জন্যে ভাবিস্ না, তুই পারবি।

বড়সড় পাখির মতো ডানা মেলে ভেসে চলেছে প্লেন। বেশ নিচু দিয়ে। প্যাট একসময় নামকরা পাইলট ছিলেন। নিয়মিত দেশ বিদেশ ঘুরতেন বোয়িং নিয়ে। ছোট্ট প্লেনটা ঠিক তাঁর পোষা পাখির মতো মসৃণগতিতে এগিয়ে চলেছে।

নিচে সরে যাচ্ছে ওদের গ্রাম-শহর গ্রস্ ভ্যালি। প্যাট্টির ছেলেবেলায় প্রিয় বন্ধু ক্যাথির বাড়ি এসে গেলো। প্যাট হেসে বললেন,—কিরে, বন্ধুর সাথে দেখা করবি?

চোখে ক্যামেরা প্যাট্টি মাথা নাড়লো,—না, এখন না। ফেরার সময় না হয়, পাপা, পাপা, দ্যাখো। ফ্যান্টাস্টিক!

প্লেন এখন উড়ে চলেছে বিশাল খাঁড়ি উপত্যকা পেরিয়ে আরও দক্ষিণে। প্যাটি ঝুঁকে পড়লেন,—বাঃ! সত্যিই অপূর্ব।

ঢেউখেলানো পাহাড়ি উপত্যকার মধ্যে সবুজ প্রান্তরে চরছে হাজারে হাজারে ভেড়া। সাদা লোমশ, উপর থেকে মনে হচ্ছে প্রান্তরে যেন থোকা থোকা সাদা ফুল নেচে বেড়াচ্ছে।

সমানে 'ক্লিক্' করে যাচ্ছে প্যাট্টির ক্যামেরা। ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে ও মগ্ন, কোনদিকে হুঁশ নেই।

হঠাৎ প্যাট্রির খেয়াল হলো, বেশ খানিকক্ষণ সব নিস্তব্ধ সেও কথা বলছে না, পাপাও উত্তর দিচ্ছেন না।

ক্যামেরা চোখ থেকে নামিয়ে প্যাট্রি পিছনে থেকে আলতো ঠেলা দিলো প্যাটকে—ও পাপা, কিগো, কিছু বলছো না যে? এ্যাই—

প্যাটের মাথাটা ডানদিকে হেলে পড়লো।

চকিতে বিশ্বভুবন দুলে উঠলো প্যাট্রির চোখের সামনে। ক্যামেরা পড়ে গেলো অবশ হাত থেকে। ও ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে, চিৎকার করে উঠলো,—পাপা, এই পাপা!

পাপা নিরুত্তর। দুচোখ বোঁজা, মাথাটা কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়েছে। হাতদুটো স্টিয়ারিং-এ। নিস্পন্দ শরীর।

প্লেন ভেসে চলেছে সামনের দিকে।

প্যাট্রির মাথায় বেজে চলেছে পাগলাঘন্টি,—মৃত্যু! নির্ঘাৎ মৃত্যু সামনে। বাবার নিশ্চয়ই আচমকা হার্ট অ্যাটাক্ হয়েছে। এদিকে ও নিজেও প্লেন চালাতে জানে না। বাবা তো যাবেনই, তার নিজেরও বাঁচার কোন আশা নেই।

প্লেনে রেডিও নেই, ঝাঁপ দেবার প্যারাসুটও নেই! আপনা আপনি উড়তে উড়তে একসময় প্লেনের তেল ফুরিয়ে যাবে। 'ঝুপ' করে খসে পড়বে আকাশ থেকে পাহাড়, সমুদ্র, বাড়িঘর তলায় যাই থাক্।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেলো। প্যাট্রি নিশ্চল স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো। নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখোমুখি ওরা দাঁড়িয়ে। কি করবে, হাল ছেড়ে দেবে। ভাগ্যের হাতে?

কিন্তু কিই বা করতে পারে ও? ও তো কোনওদিন প্লেন চালায়নি। প্যাট্রির হঠাৎ মনে পড়লো যে কবার উড়েছে বাবার সাথে, প্যাট মাঝে মধ্যে বলতেন, —শিখে রাখ। এই দ্যাখ এটা হলো স্টিক্, প্লেনকে উঁচুতে তোলে বা নামায়। আর এটা থ্রট্ল্, ইঞ্জিনের গতি কমায় বাড়ায়, বন্ধ করে। এই দুটোই প্লেন চালানোর আসল জিনিস। পাকা পাইলটরা এদুটো দিয়েই প্লেন কন্ট্রোল করে।

এই তো, এই তো মনে পড়ছে। এইটুকু টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়েই ওকে আজ মোকাবিলা করতে হবে। না—কখ্খনো না, হাল ও ছাড়বে না।

লাল টুকটুকে সূর্য ওর বাঁদিকে সমান্তরাল উচ্চতায়, আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে নিচে। প্যাট্রি সূর্যের দিকে তাকালো। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ওর ভিতর থেকে কেউ যেন ফিস ফিস করে বলে উঠলো,—চেষ্টা করো প্যাট্রি। তুমি সব পারো।

বাবা—নিশ্চয়ই বাবা! বাবা তাকে এখনো সাহস যোগাচ্ছেন। যেমন চিরকাল যুগিয়ে এসেছেন।

প্যাট শার্পের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠলো প্যাট্রি—পাপা, দেখো, আমি নিশ্চয়ই পারবো।

কন্ট্রোল বোর্ডের একদিকে, হ্যাঁ, এটাই স্টিক। আর সবুজ যন্ত্রটা হ্যাঁ, থ্রটল। বাবার দুটো পা যেখানে, ওগুলো বোধহয় ব্রেক, ক্লাচ এইসব। বোর্ডে তো আরো একগাদা সুইচ আছে। ওগুলো কিসের? স্মৃতি হাতড়াতে থাকে প্যাট্রি, উহুঁ, কিছুই মনে পড়ছে না। আসলে কোনওদিন তো জিগ্যেসই করেনি পাপাকে।

এখন প্রথম কাজ, প্লেনটাকে ১৮০° ডিগ্রি ঘোরাতে হবে। সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ফিরতে হবে। এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে 'শানিকো'তে ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপ আছে। একমাত্র ওখানেই নামবার মতো জায়গা পাওয়া যাবে।

স্টিক দিয়ে কিভাবে ঘোরাবে? থ্রটল্ দিয়ে গতি কমিয়ে নেবে প্লেনের? প্যাট-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ড্যাশবোর্ডের দিকে তাকালো প্যাট্রি, আশিতে কাঁটা কাঁপছে। সামান্য একটু কমানো যেতে পারে। কিন্তু পঁয়ষট্টি থেকে কমে গেলে পড়তে থাকবে প্লেন। তখন একবার পাক খেতে শুরু করলে আর রক্ষে নেই।

সত্তরে কাঁটা রেখে স্টিকটা ডানদিকে ঘোরালো প্যাট্রি। অমনি—একি, প্লেন যে থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। ওর মনে পড়লো, বাবা বলতেন, পাকা চালকরা যেকোনও যানের চাল বুঝে কাজ করে। মসৃণভাবে চালানোটাই আসল কথা। প্যাট্রি আবার পূর্বস্থানে নিয়ে গেলো স্টিককে।

প্লেন আবার স্থিরগতিতে ফিরে এলো।

ওঃ বুঝেছে প্যাট্রি, দমকা হাওয়ার জন্যেই প্লেনটা ধাক্কা খেয়ে কাঁপছিল ঘুরতে গিয়ে। হাওয়াটা যেই এবার কমে এলো, ও খুব ধীরে ধীরে ঘোরাতে থাকে স্টিক। একটু ঘোরায়, থামে, আবার ঘোরায়।

ঠিক, ঠিক, প্লেনটা এবার আস্তে আস্তে ঘুরছে। বাঁদিকে সূর্য এসে গেছে ওর ডানদিকে। তার মানে ওর সামনে এখন দক্ষিণ দিক—শানিকো। স্টিকটা ঠিক সময়মতো ফিরিয়ে আনলো প্যাট্রি। থ্রটল্ ঘুরিয়ে গতি বাড়িয়ে নিলো।

প্লেন উড়ে যাচ্ছে। নিস্পন্দ বাবার ঘাড়ের পাশ দিয়ে ঝুঁকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে তেইশ বছরের এক তরুণী।

প্যাট্রির মাথায় উড়ে উড়ে আসছে বাবার পুরনো টুকরো টুকরো কথা : ধীরস্থির সবসময় থাকবি। তুই ঠিক থাকলে তোর বাহনও ঠিক থাকবে।... স্টিক সামনে পেছনে করলে প্লেনের ডানা উপরনিচ হয়। প্লেনকে উপরনিচে তোলা যায়। তবে সবটাই করতে হবে বাতাসের অবস্থা বুঝে।...

প্যাট্রি পরখ করে দেখতে স্টিক ধরে টান দিলো। নিমেষে গোঁত্তা খেয়ে উঠলো প্লেন। যাঃ, আবার ভুল হলো, বাতাসের গতি দেখা হয়নি।

বহুদূরে ছোট্ট ছোট্ট ঘরবাড়ির ফাঁকে, ঐ যে দেখা যায় শানিকো এয়ারস্ট্রিপ। যাক্, ঠিক পথেই আসছে তাহলে।

এবার আসল পরীক্ষা, শেষ পরীক্ষা। সামান্যতম ভুল হলে দাউদাউ জ্বলে যাবে প্লেন, সব লড়াই খতম হয়ে যাবে। প্লেন ল্যান্ডিং, বড়সড় পাইলটদের ক্ষণিকের ভুলে কী ভীষণ সব দর্ঘটনা ঘটে যায়। আর প্যাটি তো জীবনে এই প্রথম প্লেনের সুইচে হাত দিলো।

তাহলে কি তীরে এসে তরী ডুববে?

প্যাটির ভিতর থেকে আবার কে যেন বলে উঠলো,—ভয় নেই প্যাটি। স্টেডি থাকো।

মুহূর্তে প্যাট্রির দেহে মনে যেন শক্তি ফিরে এলো, ওকে পারতেই হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আজ যদি প্লেনে দুর্ঘটনা ঘটে যায়, কেউ তো আসল ব্যাপার জানতে পারবে না। ওর নির্দোষ বাবার সম্পর্কে সবাই বলবে একষট্টি বছরের বুড়ো বাপ অমন তাজা মেয়েটাকে মেরে ফেললো।

নিচে এসে যাচ্ছে শানিকো এয়ার স্ট্রিপ। প্যাট্রি মনে মনে বিড়বিড় করে চলেছে,—পাপা, পাপা, তোমার আদরের মেয়ে প্যাট্রি বড় বিপদে...তুমি সাহায্য করো।

থ্রটল্ ঘুরিয়ে গতি কমিয়ে দিলো প্লেনের। এখন ঠিক পঁয়ষট্টি কিলোমিটারে কাঁটা। এবার স্টিক ধরে খুব ধীরে ধীরে সামনের দিকে ঠেলতে থাকে প্যাট্রি... নামছে নামছে।

আচমকা আবার দমকা হাওয়া! সর্বনাশ! প্লেন থরথর করতে শুরু করেছে।

চট্ করে স্পীড বাড়িয়ে স্টিক টেনে নিলো আলতো করে। প্লেন ফিরে

এলো আগের উচ্চতায়। কিন্তু ইতিমধ্যে এয়ার স্ট্রিপ পেরিয়ে গেছে প্লেন।

আবার স্টিক ডানদিক বাঁদিক করে, হাওয়া বুঝে প্লেনকে ঘুরিয়ে আনলো প্যাট্রি আগের জায়গায়।

দ্বিতীয়বার নাহ্... এবারেও ঠিক হলো না। স্টিক আর থ্রটল্-এর ঠিক মিল হলো না।

দরদর করে ঘামছে প্যাট্রি। এই শীতার্ত বাতাসেও। জীবনমৃত্যুর পরীক্ষা, পাশ করতে পারবে কিনা জানে না।

শানিকো এয়ারস্ট্রিপের পাশের এক হোটেলের হলঘরে বিল ব্রাগার স্কাউট ছেলেদের ক্লাস নিচ্ছিলেন। সকাল থেকে পি. টি. ট্রেনিং প্যারেড হয়েছে। এখন তিনি বোঝাচ্ছিলেন প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে।

হঠাৎ তাদের কানে ভেসে এলো এঞ্জিনের কর্কশ গর্জন। বিল জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, একটা টু-সিটার বেবি প্লেন গোঁত্তা খেয়ে নামলো। পরক্ষণেই শোঁ করে উঠে গেলো।

এই সন্ধ্যের সময় এখানে তো কেউ প্লেন নামায় না। বিল বেশ অবাক হলেন। তারপর ভাবলেন, হতে পারে। কোনও আকাট পাইলট হয়তো কায়দা দেখাচ্ছে। কিংবা ঠিকমতো নামাতে পারছে না প্লেন।

কৌতূহলী ছেলেরাও সব চলে গেছে বাইরে। বিল তাদের ডাকলেন,—বয়েজ, লিভ দ্যাট্। বী সীটেড। লেট আস ডিসকাস দি প্রবলেম অব ফার্স্ট এইড্।

পঞ্চমবার। এই নিয়ে চার-চারটে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। মনে মনে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছে প্যাট্রি, ও বোধহয় পারলো না। হেরে গেলো।

ওর ডানহাত স্টিকে, বাঁ হাত থ্রটলে। থ্রটল্ ঘুরিয়ে গতি আবার কমিয়ে দিলো। এবার... হ্যাঁ। হাওয়া কমে গেছে, সামনের দিকে ধীরে ধীরে ঠেলছে স্টিককে... ডানাদুটো ভাঁজ হচ্ছে, প্লেন নেমে যাচ্ছে...নেমে যাচ্ছে...

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্ট্রিপের ছোট ছোট ঘাস, পরমুহূর্তে কর্কশ শব্দ আর ঝাঁকুনি!

প্লেন স্পর্শ করেছে জমি! নাহ্, আগুন ধরেনি। একটানে থ্রটল্ ঘুরিয়ে প্যাট্রি বন্ধ করে দিলো ইঞ্জিন।

ওর বাঁ হাত জাপটে ধরেছে অচেতন প্যাট শার্পকে। খানিকটা গড়িয়ে গড়িয়ে থেমে গেলো প্লেন।...

ব্রিল ব্রাগারও শুনতে পেলেন ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যখন দেখলেন সেই ছোট্ট প্লেনটা, বেশ গরম হয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। পাইলটটাকে একটু কড়কে দেওয়া দরকার। কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। এইসব অপদার্থগুলো লাইসেন্স পায় কি করে!

লম্বা লম্বা পা ফেলে বিল এগোচ্ছিলেন প্লেনের দিকে, হঠাৎ তিনি দেখলেন, প্লেন থেকে নেমে তীব্রগতিতে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে, হ্যাঁ, একটি তরুণী মেয়ে।

কিছু বোঝার আগেই মেয়েটি ঝড়ের মতো এসে পড়লো তাঁর সামনে। মেয়েটির দুচোখে আতঙ্ক আর উদ্বেগ, বিধ্বস্ত, ঝড়ে পড়া কাকের মতো অবস্থা। মেয়েটি তার দুহাত ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো,—বাঁচান! আমার বাবাকে বাঁচান। উনি প্লেনে, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ফোন, ফোনটা কোথায় বলতে পারেন?

ইশারায় টেলিফোন বুথ দেখিয়ে দলবল নিয়ে বিল ছুটে গেলেন প্লেনের দিকে।

প্যাট শার্প-এর অচেতন শরীরটা সবাই মিলে ধরাধরি করে এনে শোয়ানো হলো পাশের ঘাসজমির ওপর। বিল ব্রাগার নাড়ি ধরে রইলেন কিছুক্ষণ, কান পাতলেন বুকে।

নাহ্, ধুক্‌ধুক্ শব্দ নেই। হৃদয়ঘড়ি স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের মতো। প্যাট শার্প অনেক আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন।

প্যাট শার্পের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে প্যাট্রিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন বারবারা। খালি বলছিলেন,—আমি অলুক্ষুণে, অপয়া। নইলে আমার জন্মদিনে আমাকে ছেড়ে চলে গেলো লোকটা?

কাঁদতে কাঁদতেই মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো মেয়ে,—একদম বাজে কথা বলবে না। তাই যদি হতো, তাহলে কি আমি ফিরে আসতে পারতাম মাটিতে? পাপা না থেকেও ঐ আকাশে আমার পাশে সারাক্ষণ ছিলেন। ওর কথাগুলো কেবলই বেজেছে মার বুকের মধ্যে। আর উনি তো আমাদের সবসময় বলতেন, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। তবে মৃত্যু যেন যন্ত্রণার না হয়। দেখো মা, কষ্ট উনি পান নি।

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন প্যাট্রির কাকা এড্ শার্প। উনি এয়ারফোর্সের প্রাক্তন

প্রশিক্ষক। এড্ বললেন,—আমি জীবনে এত অবাক হইনি। প্রশিক্ষণ পাওয়া পাইলটরাও প্লেন নামাতে হিসসিম খায়, আর প্যাট্রি শুধু একটু আধটু শুনেই প্লেন নামিয়ে দিলো। তোর বাবা ঠিকই বলতো রে, প্যাট্রি সব পারে।

কালরাত্রি

দারুণ খুশীতে শত্রুঘ্নর চোখের তারাদুটো নেচে উঠলো,—ওহ্, দারুণ, দারুণ! যাত্রাপালা মহাভারত! আমি যাত্রা দেখতে ভীষণ ভালবাসি। আহ্, আমি-একদিন মহাভারতের অর্জুন হবো। পৃথিবীর সেরা বীর। কৃষ্ণ হবে আমার রথের সারথি, টগবগ টগবগ ঘোড়া ছোটাবো যুদ্ধের ময়দানে—

সামনে দাঁড়ানো ছোটবড় অন্য শিশুরাও আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো,—অর্জুন! শত্রুঘ্ন অর্জুন হবে। কী মজা, কী মজা।

এই ফেলাবাড়ি গাঁয়ের সকলেই বড় ভালবাসে শত্রুঘ্নকে। বছর বারোর এই কিশোর সবসময় প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল, উদ্দাম। দেখলে কে বলবে, শত্রুঘ্ন হারিয়েছে ওর প্রিয়তম জনদের—ওর বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই। কয়েকবছর আগে অনাথ শিশু শত্রুঘ্নকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন ওর কাকা কাকীমা। সেই থেকে এ গ্রামেই আছে ও। মাতিয়ে রেখেছে সবাইকে।

দূর এক গাঁয়ে যাত্রা হবে শুনে যাবার জন্য বায়না ধরল শত্রুঘ্ন। গাঁয়ের সবার প্রিয় চিতন দেবী বললেন, তোমায় আজ নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে নেচে উঠে ঘুরপাক খেলো শত্রুঘ্ন তারপর উর্দ্ধশ্বাসে ছুট দিলো বাড়ির দিকে। কাকু কাকীমাকে জানাতে হবে না?

পেছনে থেকে চিতন দেবী চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—আমরা কিন্তু সন্ধ্যে নামতেই রওনা হবো। তৈরী থেকো।

শত্রুঘ্ন ততক্ষণে ওদের রান্নাঘরে। থালা নিয়ে সে বসে পড়েছে কাকীমার সামনে,—কাকীমা, দাও দাও শীগ্গির দাও। দারুণ খিদে পেয়েছে।

পাবেই তো। আজকে কড়াইশুঁটির ঝোল আছে যে। কাকীমা স্নেহের সুরে বলতে বলতে ভাত ঢেলে দিলেন।

জান কাকীমা, শত্রুঘ্ন খেতে খেতে বলে ঃ আজ না, যাত্রা দেখতে যাবো। মহাভারত পালা! চিতনদেবী বলেছে, আমায় নিয়ে যাবে।

—কখন?

—আর একটু পরেই। বিকেল পার হয়ে সূর্য্যি ডুবলেই সবাই রওনা দেবো। কাল সকালে ফিরবো...দাও, আরটু ভাত দাও... রাতেরটাও খেয়ে নিই...

পাগল ছেলে কোথাকার!—কাকীমা ওর কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দেন ঃ সাবধানে যাস্। আর একদম দুষ্টুমি করবি না। চিতনদিদি যা বলে শুনবি, কেমন?

শত্রুঘ্ন গোগ্রাসে খেতে খেতে ঘাড় নাড়ে।

সূর্য ডুবছে পশ্চিমদিগন্তে। ধু-ধু প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দশজনের দলটা রওনা দিলো। চারজন মহিলা, ছয়জন নানাবয়েসের ছেলেমেয়ে। দুধারের ঝোপ জঙ্গল বেয়ে রাতের অন্ধকার দ্রুত এগিয়ে আসছে, গ্রাস করছে চরাচর। হিমেল বাতাস ঝলক ঝলক বয়ে যাচ্ছে।

শীত এসে গেলো।—চেতন দেবী বলতে বলতে চাদরটা ভালভাবে জড়িয়ে নিলেন। দেখাদেখি অন্যরাও।

শত্রুঘ্ন দলের সবচেয়ে ছোট নির্মলার হাত শক্ত করে ধরে এগোচ্ছে, মাঝেমাঝে তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে।

চলো, এই রেললাইন ধরে এগোনো যাক।—চিতন দেবী সামনের রেলপথ দেখালেন; এতে ফুলঝড় নালা পেরুনো সোজা হবে। নইলে অনেকটা ঘুরতে হবে।

কোনও ভয় নেই তো?—শত্রুঘ্ন প্রশ্ন করলো।

না, না।—চেতনদেবী জোরের সঙ্গে বললেন, এই পথটা সোজা এসেছে ভিলাই থেকে। এ সময় কোনও ট্রেন নেই। বরং রাস্তায় অন্য গাড়িঘোড়ার ভয় আছে। চলো—পা চালাও, যাত্রা শুরু হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে।

শত্রুঘ্ন মেয়ে আর আরও ছোটদের হাত ধরে টেনে টেনে তুললো লাইনের ওপরে। তারপর নির্মলার হাত শক্ত করে ধরে পা চালালো।

বেশ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এইসময়ে পিছন থেকে এক শিশু চেঁচিয়ে উঠলো,—মা, একটু আস্তে! আমি পারছি না!

চিতনের কোলের শিশুটিও কেঁদে উঠলো। ওর পিঠে চাপড় মারতে মারতে চিতন বললেন,—চুপ চুপ লক্ষ্মীটি? কাঁদে না! গপ্পো শুনবে? শকুন্তলা দুষ্যন্তের গল্প?

দ্যুৎ! ও আমি একশোবার শুনেছি।—শত্রুঘ্ন বিরক্তকণ্ঠে বললো।

তুমি শুনেছো, অন্যরা তো শোনে নি।—চিতনদেবী হাসলেন : একশো

এক বারই শোন তাহলে। ...এক যে ছিল কন্যে... কণ্বমুনির আশ্রমে, নাম তার শকুন্তলা।...

চিতন রসিয়ে রসিয়ে বলে চলেন শকুন্তলা কাহিনী, অন্য সবাই নিশ্চুপ। নিথর রাত্রির বুকে তাঁর গলা গম্‌গম্‌ করতে থাকে।

সহসা শত্রুঘ্ন চমকে ওঠে,—লাইনটা কাঁপছে না?

চিতনদেবী হেসে ওঠেন,—ও তোমার মানসিক আতঙ্ক, শত্রুঘ্ন। ঘাবড়িও না বাছা, এই লাইনে সন্ধ্যের পর কোনকালে ট্রেন আসে না। ...হ্যাঁ ... কী বলছিলাম ...তারপর শকুন্তলা খুব সাজলো ...খুব সাজলো...তারপর...

শত্রুঘ্ন হতাশায় ঘাড় ঝাঁকালো। চিতনদেবী তার কথা কানেই নিচ্ছেন না! অবশ্য সেও জানে, এসময় এখানে কোনও ট্রেন নেই।

চলো-চলো, জলদি! ঐ যে ফুলঝড় নালা! চিতনদেবী গল্প থামিয়ে হেঁকে ওঠেন : চটপট আমাদের রেলব্রীজটা পেরোতে হবে। তাহলেই ব্যস্‌ —চলো!

গোটা দল উঠে পড়লো ব্রীজের ওপর। আর ঠিক তখনই চেঁচিয়ে উঠলো শত্রুঘ্ন,—ব্রীজ কাঁপছে! ব্রীজ কাঁপছে!

ওর সঙ্গের অন্য শিশুরাও চেঁচিয়ে উঠলো,—মা—মা—, ব্রীজ ভীষণ কাঁপছে!

হাঁদা-গঙ্গারাম!—চিতন দেবী দাবড়ে ওঠেন : বাতাসের শব্দ, বোকা, বাতাস! ব্রীজ কাঁপবে কোত্থেকে?

শত্রুঘ্ন মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কান খাড়া করে। নাহ্‌, সমস্ত ব্রীজজুড়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ! এ বাতাস নয়, কক্ষণো নয়।

ট্রেন ; নির্ঘাৎ ট্রেন! ঝোড়ো বাতাসের মতো সামনে থেকে ছুটে আসছে!

শত্রুঘ্ন প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো,—নির্মলা, চিতনদেবী, সুকুবাই... পালাও... ট্রেন পালাও!

তখন আর সময় নেই! মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে জমাট অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঘোর কালো এক অন্ধ দানবের আবছা অবয়ব। ইঞ্জিনটার কোনও লাইট নেই।

সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুঘ্ন নির্মলাকে হ্যাঁচকা টান মেরে লাফ মারলো লাইনের বাইরে। তারপরেই ওকে সুদ্ধু নিজেদের দুজনকে চেপে ধরলো ব্রীজের রেলিং -এর গায়ে।

ও শুধু অনুভব করলো ফোঁস...ফোঁস করতে করতে দানবের ছুটে যাওয়ার শব্দ, প্রচন্ড বাতাসের টান। আর পলকের জন্যে শুনতে পেলো চিতন দেবীর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ!

মাত্র কয়েক মুহূর্ত।

এখন আবার সব নিথর নিঃশব্দ!

শত্রুঘ্ন এখনও অপেক্ষা করে আছে চিতনদেবীর ডাকের জন্যে। কই, কেউ তো সাড়া করছে না।

চিতন দেবী... সুকুবাই..তোমরা কই? শত্রুঘ্ন এবার চেঁচিয়ে ওঠে। কোনও উত্তর নেই।

নির্মলা এবার ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে,—ভাইয়া, গাঁয়ে চলো।

যাবো বোন—শত্রুঘ্ন এবার সব বুঝতে পারছে। সব শেষ। কেউ নেই। তবুও যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে ও নির্মলার চোখমুখ মুছিয়ে দেয় : কাঁদিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এমন সময় শিশুকণ্ঠের মৃদু গোঙানি ভেসে আসে কোথা থেকে।

মুহূর্তে শত্রুঘ্ন সেদিক লক্ষ্য করে ধেয়ে যায়, বাবলি, ছোট্ট বাবলির গলা না?

জমাট অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে শত্রুঘ্ন খুঁজতে থাকে।

এই তো...এ কী! এ যে রক্ত! এই তো মাথা, চুল, চোখ, এই তো হাত... বাবলির গলা চিরে আবার গোঙানি বেরিয়ে আসে...

বেঁচে আছে! এখনও বাবলির কচি প্রাণটা ধুকপুক করছে।

পলকের মধ্যে রক্তাক্ত বাবলিকে কোলে তুলে নেয় শত্রুঘ্ন, বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরে নির্মলাকে, পাগলের মতো ছুটতে থাকে মাঠ বেয়ে।

কতক্ষণ দৌড়েছে জানে না শত্রুঘ্ন, প্রায় মধ্যরাতে গিয়ে সে আছড়ে পড়লো সবচেয়ে কাছের মুংরি গ্রামে। চিৎকার করতে করতে,—ভাইয়া বাঁচাও! বাঁচাও!

শীতার্ত নভেম্বরের ঘুমন্ত গ্রাম জেগে উঠলো অতি অল্পসময়ের মধ্যে। সবাই-ই দোর খুলে ছুটে এল,—কী হয়েছে?

বারো বছরের একটি কিশোর, তার বাঁ হাতে একটি বছর সাতেকের বালিকা, কোলে একটি অচেতন রক্তাপ্লুত দুধের শিশু!

পরক্ষণে শত্রুঘ্ন লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। অচেতন। মুংরি গাঁয়ের অধিবাসীরা

শুশ্রুষা করতে থাকে আহতদের একদল যান সরেজমিনে ফুলঝড় রেলব্রীজের অকুস্থলে।

রেলব্রীজের ওপরে টর্চ মারতে গাঁয়ের মোড়লও বোবা হয়ে গেলেন।

সাতটা ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে আছে লাইনের এদিকে ওদিকে।

একজন ফিসফিস করে বললো,—আলো নেই, হুইসল্ নেই, ইঞ্জিন চলে এলো! প্রাণের কোনও দাম নেই আমাদের?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মোড়ল,—আমরা গাঁয়ের লোকরা কি মানুষ নাকি? চলো, যারা আছে তাদের অন্তত সুস্থ করে তুলি। ঐটুকু ছেলে আজ যা করলে ভাবা যায় না। ও মানুষ নয়, দেবতা।

—আমরা থানায় যাবো না?

—নিশ্চয়ই যাবো। একসাথে যাবো। ...এই ঘটনার প্রতিবিধান চাই-ই।

মোড়ল নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলেন, পিছনে গাঁয়ের অন্যরা।

পরিশেষে দুটো সংবাদ দিয়ে শেষ করি।

ছোট্ট মা-হারা শিশু বাবলি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আর শত্রুঘ্ন তার অসাধারণ বুদ্ধি, মহানুভবতা ও বীরত্বের জন্যে পেয়েছিল রাষ্ট্রপতির সম্মান। পুরস্কার নিতে গিয়ে ও কেঁদে ফেলেছিল! বলেছিল, —এ কিসের পুরস্কার। এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে?



লন্ডনে জালিয়ানওয়ালা বাগ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

আমি যে বছর ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনো করতে যাই তার অনেক আগে লণ্ডনে উধম সিং-এর ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল।

উধম সিং-এর নাম তোমরা বোধহয় শোন নি। আচ্ছা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কথা শুনেছ তো? অমৃতসরের যে জায়গায় আজ থেকে বহু বছর আগে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার শত শত নিরীহ ভারতীয়কে নৃশংসভাবে গুলি করে মেরে ফেলেছিল—সেই জায়গার নাম জালিয়ানওয়ালাবাগ। এই হত্যালীলার অধিনায়ক ছিল মাইকেল ও' ডায়ার।

শুধু বলে যাচ্ছিল মাইকেল ও' ডায়ার, "ফায়ার! ফায়ার!"

অসংখ্য নরনারীর আর্ত চিৎকারে, কত শিশুর করুণ ক্রন্দনে ভারী হয়ে উঠেছিল বাতাস। আর নিরীহ নিরপরাধ কত পিতামাতা এবং শিশুর রক্তে সেদিন লাল হয়ে উঠেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের মাটি হিংস্র জানোয়ারের মত নিষ্ঠুর মাইকেল ও' ডায়ারের অকল্পনীয় অত্যাচারের জন্যে।

যে শিশুরা সেদিন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল, উধম সিং তাদের একজন। তার মা বাবা তাকেও কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে তাদের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দিতে। ব্রিটিশ সরকার ভাবল ধর্ম-টর্ম একটা ছুতো। আসলে এই উৎসব স্বদেশী আন্দোলনেরই প্রস্তুতি। সুতরাং চালাও গুলি মাইকেল ও' ডায়ার!

ডায়ারের গুলিতে সেই জালিয়ানওয়ালাবাগে সেদিন মৃত্যু হল উধম সিং এর মা ও বাবার। সন তারিখ হল উনিশ শো উনিশ সালের তেরোই এপ্রিল। উধম সিং-এর বয়েস তখন ঠিক দু বছর। সে বেঁচে রইল অনাথ হয়ে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা আমি অনেক পড়েছি। তবে উধম সিং-এর বিষয় আমি কিছু শুনিনি। তার কথা প্রথম শুনলাম মিস্টার রঘুবনাশ প্যাটেলের মুখ থেকে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেল অঞ্চলে।

ইস্ট এণ্ডে বসবাস করবার আমার কোন ইচ্ছে ছিল না। আমি দায়ে পড়ে হঠাৎ সেই দরিদ্র পল্লীতে কিছুকাল বাস করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বোধহয় ব্যাঙ্কের কোন গণ্ডগোলের জন্যে দেশ থেকে বেশ কয়েক মাস আমার বিলেতের খরচপত্রের টাকা আসে নি। খুব মুশকিলে পড়েছিলাম।

ল্যাণ্ডলেডির পাওনা টাকা দিতে পারি না। লণ্ড্রিতে কাপড় পাঠাতে পারি না। বোঝ তো, হাতে টাকা না থাকলে কিছুই করবার উপায় নেই। আর হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থেকে সময় নষ্ট করতেও ইচ্ছে করে না।

কিন্তু কী করি!

হঠাৎ আমার কয়েকজন বাঙালী বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। মণ্টু টুবলু কল্যাণ আর প্রবাল। ওরা বাপ-মায়ের হীরের টুকরো ছেলে। ইস্ট এণ্ডের এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেল অঞ্চলে থেকে ওরা পড়াশুনো করে। আর খুব কম খরচে মাস চালায়। তোমরা শুনলে অবাক্ হবে আমার যেখানে সপ্তাহে লাগে প্রায় সাত পাউণ্ড, সেখানে ওদের এক-একজনের লাগে মোটে এক কিংবা দেড় পাউণ্ড। অথচ কোন অসুবিধা হয় না ওদের। নিজেরা রান্না করে খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আছে মণ্টু টুবলু কল্যাণ আর প্রবাল।

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে একটা ট্যাক্সিতে আমার সব মালপত্র চাপিয়ে আমি একদিন এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেলের সেই ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। আর প্রথম দিনই আমার সঙ্গে সেখানে আলাপ হল আইনের ভারতীয় ছাত্র রঘুবনাশ প্যাটেলের।

প্যাটেলের গায়ের রং কুচকুচে কালো। নিগ্রোদের মত কোঁকড়া চুল। গলার স্বর কর্কশ। আমাদের চেয়ে মনে হয় তার বয়েস কিছু বেশী। প্যাটেলের চেহারা দেখে আর তার গলার স্বর শুনে প্রথমে যেমন আঁতকে উঠতে হয়, পরে কিন্তু

মনে আর কোন ভয়-টয় থাকে না। বরং তাকে খুব ভালই লেগে যায়। মনে হয়, এমন সরল দিলখোলা মানুষ যেন আর দুটি নেই।

মণ্টু টুবলু কল্যাণ আর প্রবালের সঙ্গে এক ঘরে থাকে না প্যাটেল। সে থাকে একা একটা ঘরে, দোতলায়। দিনের বেলা সে তার আইনের ক্লাস করতে যায় লিনকনস ইনে, আর রাতে অনেকক্ষণ জেগে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করে। আপাততঃ প্যাটেল আসছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। তার বাবার সেখানে ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বোধহয়, আমি ঠিক জানি না।

ইস্ট এণ্ডের এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেলের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় মণ্টু টুবলু কল্যাণ আর প্রবালের ঘরে (আমিও সে-ঘরে থাকতাম) প্যাটেলের সঙ্গে আমার জোর তর্ক হয়ে গেল। সেদিনই আমি প্রথম শুনলাম জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই শিশু উধম সিং-এর নাম।

বাইরে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে। সম্ভবতঃ বয়ে চলেছে ব্লিজার্ড অর্থাৎ বরফের ঝড়। ঘরের দরজা জানলা ভাল করে বন্ধ থাকলেও মনে হচ্ছে বাইরে থেকে হুহু করে বারবার ছুটে আসেছে ঠাণ্ডা স্রোত। আমাদের বুকের হাড় কনকন করে উঠছে। ঘরে যদিও একসঙ্গে জ্বলছে হিটার আর কয়লার আগুন।

ঠকঠক করে দরজায় কে যেন আঘাত করল। কে এল এই দুর্যোগের রাতে? দরজা খুলে দেখি প্যাটেল দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে তখন জ্বলছে চুরুট।

সিগার নামিয়ে সে হেঁকে বলল, "মে আই কাম ইন?"

"আরে এস এস!"

ঘরে ঢুকে চোখ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করল প্যাটেল, "হোয়াট এ ন্যাস্টি ইভনিং!" পরে মণ্টু টুবলু কল্যাণ আর প্রবালের দিকে ফিরে বলল, "ওয়েল বয়েজ, চটপট কফি বানাও তো। এই ওয়েদারে গরম কফি খেতে মন্দ লাগবে না। কী বল মিস্টার মুখার্জি?"

আমি বললাম, "ওঃ, দ্যাট উইল বি ফাইন!"

একটা বড় ইজিচেয়ার মতন ছিল সে-ঘরে। তার ওপর ধপ করে বসে পড়ল প্যাটেল। আমি তার সামনে ক্যাম্প খাটের ওপর বসলাম। কফির জল চাপিয়ে দিয়েছে কল্যাণ। প্যাটেলকে ঘিরে বসল সকলে।

অনেকক্ষণ কোন কথাবার্তা বলল না প্যাটেল, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে পা টান-টান করে দাঁতে সিগার চেপে বসে থাকল। তার দু চোখই বোজা।

বেশ কিছু পরে আমাকে লক্ষ্য করে প্যাটেল হঠাৎ বলল, "বাপের বেটা

বটে উধম সিং। সে মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে। মুখার্জি, উধম সিংকে তুমি বাহবা দাওনা?"

আমি উধম সিং-এর নামই শুনিনি। তাই প্যাটেলকে প্রশ্ন করলাম, "উধম সিং? সে আবার কে?"

"হোয়াট!" চেয়ারে সোজা হয়ে বসল প্যাটেল। কটমট করে তাকাল আমার দিকে। তাকিয়ে বলল, "তুমি উধম সিং-এর নাম শোননি?"

আমি একটু ঘাবড়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে আস্তে বললাম, "না।"

"পুওর বয়!" যেন আমাকে করুণা করে আরও জোরে দাঁত দিয়ে সিগার চেপে ধরে প্যাটেল বলল, "তুমি ভারতীয় নাকি? ছি ছি, তুমি উধম সিং-এর বীরত্বের কথা জান না? হি ইজ রিয়েলি এ গ্রেট সোল।"

নিজের অজ্ঞতার কথা ভেবে মনে মনে বেশ লজ্জা পেয়ে চুপ করে বসে থাকলাম। অনেক ভাববার চেষ্টা করলাম, কে এই উধম সিং? কী তার বীরত্বের কাহিনী। কিছুই মনে পড়ল না।

একটু পরে সব শুনলাম প্যাটেলের মুখে। উধম সিং হল দু বছরের সেই অনাথ শিশু—যার বাপ-মা নররূপী জানোয়ার মাইকেল ও' ডায়ারের বর্বর অত্যাচারের বলি হয়েছিল ।

প্যাটেল বলল, "শিশু হল বালক। হল কিশোর। হল যুবক। সে শুনল তার বাপ-মায়ের শোচনীয় মৃত্যুর ইতিহাস। শুনে সে পুষে রাখল বুকে প্রতিহিংসার আগুন। হ্যাঁ মুখার্জি—" চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল প্যাটেলের, "প্রতিশোধ নিল উধম সিং। তার মা-বাপের প্রাণের বদলে সে নিল জানোয়ার ডায়ারের প্রাণ। লণ্ডনের পার্লামেণ্টে প্রকাশ্য দিনের আলোয় ডায়ারকে গুলি করে মারল উধম সিং।"

এই কাহিনী শুনে প্রথমে চমকে উঠলাম, পরে আমার দু চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়। ভাবলাম এত দিন ধরে বুকের মধ্যে কেমন করে প্রতিহিংসা পুষে রাখতে পারে মানুষ। আমার দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসছিল প্যাটেল। সে ভাবল তার মত আমিও প্রশংসা করব উধম সিং-এর এই প্রতিহিংসার। প্যাটেল হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কী রকম শুনলে বল?"

তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমি বললাম, "তারপর? উধম সিং-এর কী হল?"

"হবে আবার কী—" গর্বের হাসি হেসে বলল প্যাটেল, "ফাঁসি হয়ে গেল উধম সিং-এর। মৃত্যুর আগে সে এক দীর্ঘ বিবৃতি লিখে গিয়েছিল। অপূর্ব। বীরের মত সরল উধম সিং। ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করল।"

রঘুবনাশ প্যাটেলকে চমকে দিয়ে আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, "উধম সিংকে আমি ভারতের বীর সন্তান বলে মনে করতে পারি না মিস্টার প্যাটেল—"

প্যাটেল হিংস্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল, "কেন?"

"মানুষ হয়ে সে প্রতিহিংসাকে মনে করেছিল হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। আমার মনে হয় তার আচরণও ডায়ারের মতই নিষ্ঠুর। একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে এত দিন পর মেরে ফেলে কেমন করে সে ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করল আমি বুঝতে পারছি না।"

আমার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে প্যাটেল বলল, "তাহলে তুমি বলতে চাও মানুষ অন্যায় করে যাবে দুর্বলের ওপর আর আমরা মুখ বুজে তা সহ্য করে যাব?"

"কখনো না—" আমি বললাম, "কেউ যদি আমাদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করে, আমরা তার সঙ্গে পশুর পর্যায়ে পড়ব না, আমরা প্রতিবাদ জানাব মানুষের মত।"

প্যাটেল চেয়ারের হাতলে জোরে আঘাত করে আমাকে উদ্ধত প্রশ্ন করল, "কী বলতে চাও তুমি?"

আমি তার মত চিৎকার করে উঠলাম না, আস্তে বললাম, "লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা কীভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের?"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই প্যাটেলের মত চিৎকার করে কল্যাণ বলে উঠল, "রবীন্দ্রনাথও খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা মনে করে তিনি লিখেছেন—

আমি সে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি সে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ৷৷"

একটা হাত তুলে কল্যাণকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, "রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছেন, মনে মনে আহত হয়েছেন কিন্তু ডায়ারকে মারবার জন্যে তিনি পিস্তল তোলেননি—" আমি আরও বললাম, "তিনি জানতেন এক অত্যাচারীকে হত্যা করলেই অত্যাচার বন্ধ হয় না।"

প্যাটেল খুব গম্ভীর স্বরে বলল, "হোয়াট ডু ইউ মীন?"

আমি বললাম, "আই এগরি উইথ টেগোর। আমি মহাত্মা গান্ধীর নীতিই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি।"

"থাম থাম—" টুবলু ঘুষি বাগিয়ে বলল, "ওসব অহিংস-ফহিংস কোম্পানি মানলে ভারতবর্ষকে আর স্বাধীন হতে হত না।"

আমি ধীর স্বরেই বললাম, "স্বাধীন হল কেমন করে?"

এবার প্রবাল নাক গলিয়ে বলল, "ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-ই-হিন্দ ফৌজের বিক্রমের জন্যে, বেয়াল্লিশ সালের আগস্ট মুভমেন্টের জন্যে--"

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, "না! ব্রিটিশের অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। ইচ্ছে করলে ভারতবর্ষের সব বিদ্রোহ দমন করতে তাদের দু ঘণ্টার বেশী সময় লাগত না। কিন্তু তারা তা করল না কেন?"

প্রবাল কোন উত্তর খুঁজে পেল না। মণ্টু আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

আমি বললাম, "কারণ আমাদের বাইরের সব হুমকি হয়তো দমন করতে পারত ব্রিটিশ—তারা পন্ড করতে পারত আমাদের সংগ্রামের সব আয়োজন—" আমি অল্প হেসে বললাম, "কিন্তু একটি জিনিস তারা আর কিছুতেই রুখে রাখতে পারত না।"

"কী?"

আমি বললাম, "তা হল আমাদের মনোবল—যা অ্যাটম বোমার চেয়ে, পৃথিবীর যে কোন ভয়ংকর মারণাস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী—" একটু থেমে ওদের সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি আবার থেমে থেমে বললাম, "অনেক দুঃখ দৈন্য সহ্য করে, অনেক ত্যাগ আর কঠোর সাধনার ভিতর দিয়ে এই মনোবল তিল তিল করে আমাদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, পণ্ডিত জহরলাল আর অনেক প্রণম্য দেশনেতা।"

কাঠের মেঝের ওপর খট করে জুতোর শব্দ করে প্যাটেল আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এরা কি বলেছেন যে আমরা কখনো প্রতিশোধ নেব না, শুধু পড়ে পড়ে মার খাব?"

"না, তেমন কথা এঁরা কেউ একবারও বলেন নি—" আমি কয়েক মুহূর্ত ভেবে কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কল্যাণ, রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতার শেষের দিকের কয়েকটা লাইন বলেছিলে না? ওই কবিতা প্রথম থেকে একটু বলছি—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা কর সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে ॥"

আবৃত্তি থামিয়ে বললাম, "মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিন্তু বুকের মধ্যে প্রতিহিংসা লালন করে রাখতে পারে না। সংহারলীলার ভিতর দিয়ে নয়, মানুষ প্রতিশোধ নেবে অন্যায়কারীর সঙ্গে অসহযোগ করে।"

একমুখ সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে প্যাটেল আমাকে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার মুখার্জি, তুমি বাইবেল পড়েছ?"

"কিছু কিছু।"

প্যাটেল সিগার নামিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বাইবেলের কয়েকটি কথা আমি জীবনের সার বলে জেনেছি।"

"কী কথা?"

"এ টুথ ফর এ টুথ এণ্ড অ্যান আই ফর অ্যান আই! বুঝলে? দাঁতের বদলে দাঁত, আর চোখের বদলে চোখ! ব্যস, আর কোন কথা নয়।"

কথা আর কেউ বললও না। বাইরে এখনো চলেছে বরফের ঝড়। ব্লিজার্ডের ঘায়ে জানলার সার্সীতে থেকে থেকে শব্দ উঠছে, ঝন ঝনাৎ। কনকনে হাওয়ায় আমাদের শরীর যেন জমে যাচ্ছে। আমরা চুপচাপ কফি খেয়ে যেতে লাগলাম।

॥ দুই ॥

লণ্ডনে এপ্রিল এসে গেল। এখন তুষারপাত নেই। বসন্তের শুরু। ঝিকমিক করে হালকা রোদ। ঘন ঘাসের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে রবিন পাখি। গাছে গাছে ফুটে উঠেছে রঙ-বেরঙের গন্ধহীন কত ফুল! পার্কে-পার্কে আবার জড়ো হয় ছেলেমেয়ে। ঘাসের ওপর গড়িয়ে পড়ে। শুয়ে-শুয়ে দেখে ঝকমকে আকাশ। বাড়ি ফিরে যেতে ওদের আর মন চায় না। কী করবে বল, সূর্যের মুখ তো বেশী দেখতে পায় না ওরা।

আমিও সময় পেলে এ দেশের লোকের মত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই। খোলামেলা মাঠে চিৎ হয়ে পড়ে থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গায়ে লাগাই এপ্রিলের নরম সূর্যকিরণ।

এখন এলিফেন্ট এণ্ড ক্যাসেলের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার আর দেখা-টেখা হয় না। কিছুদিন পরেই ব্যাঙ্কের গোলমাল মিটে গিয়েছিল। একসঙ্গে আমি অনেক টাকা পেয়েছিলাম। পেয়েই ফিরে এসেছিলাম আমার সাউথ কেনসিংটনের পুরনো বাড়িতে।

কিন্তু হঠাৎ লণ্ডনের সব লোক—যাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে—ভয়ে একেবারে গুম হয়ে গেল। বড় বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে শুরু করেছে লণ্ডন শহরে। কে এক নরপশু পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়েকে সুযোগ পেলেই হত্যা করছে নৃশংসভাবে।

আমি নিজেও একদিন একটা বীভৎস দৃশ্য দেখলাম। হাইড পার্ক কর্নারের এক দিকে ভিড় জমেছে। দাঁড়িয়ে আছে লণ্ডন পুলিস। ফুলের মত ফুটফুটে একটি মেয়ে পড়ে আছে। সে মৃত। তার গলা টিপে শ্বাস রোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

রোজ লণ্ডনের সব খবরের কাগজে এই রকম নৃশংস হত্যার বিবরণ প্রকাশিত হতে লাগল। বাপ-মা একটু অসাবধান হলেই চুরি হয়ে যায় তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। পরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায় কোন পার্কে। একই ভাবে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

এই রকম নৃশংস হত্যা আগে কখনো সংঘটিত হয়নি এদেশে। কে এই নির্মম হত্যাকারী? সুস্থ স্বাভাবিক কোন মানুষ নিশ্চয়ই নয়। এ কোন পাগলের কাজ। তৎপর হয়ে উঠল স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। হত্যাকারীকে গ্রেফতার করার অক্লান্ত চেষ্টা করতে লাগল লণ্ডন পুলিস।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত অনেক। দরজা ঠুক ঠুক করে ল্যাণ্ডলেডি আমার ঘুম ভাঙাল। ভাঙিয়ে স্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, "এত রাতে এক ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে। বলছেন খুব জরুরী দরকার। এই যে—"

দেখলাম আমার ল্যাণ্ডলেডির পেছনে দাঁড়িয়ে আছে প্যাটেল। সে খুব লজ্জিত হয়ে বলল, "আই অ্যাম ভেরি সরি টু ট্রাবল ইউ অ্যাট সাচ অড আওয়ার অব নাইট—"

আমি তাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে বললাম, "আরে, কী ব্যাপার মিস্টার প্যাটেল?"

"একটু বিপদে পড়ে এলাম তোমার কাছে—" বলে সে ল্যাণ্ডলেডির দিকে ফিরে তাকে বিরক্ত করার জন্যে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। এবং ল্যাণ্ডলেডি বিরস মুখে চলে যাবার পর প্যাটেল এসে বসল আমার ঘরে। ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট তার মুখ। চেহারা দেখে মনে হয় প্যাটেলের শরীরে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

স্বরে সমবেদনা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বিপদ মিস্টার প্যাটেল?"

সে করুণ চোখে তাকাল আমার দিকে। কিছু বলল না। দু-হাতে মাথা চেপে ধরে চেয়ারে বসে থাকল চুপচাপ কিছুক্ষণ। পরে পকেট থেকে ছোট একটা ছবি বের করে টেবিলের ওপর রাখল।

দেখলাম ছোট একটি মেয়ের ছবি। ইংরেজ নয়, ভারতীয়। বয়েস বোধহয় পাঁচ-ছয় বছর হবে। প্যাটেলের কোন আত্মীয়া হবে হয়তো। তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কথা ভেবে ছোট মেয়ের ছবি দেখতে দেখতে মনে শিউরে উঠলাম। একেও কি হত্যা করেছে সেই পাগল—যাকে ধরবার চেষ্টা করছে লণ্ডনের পুলিস?

ফটোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার প্যাটেল, এ মেয়েটি কে?"

"আমার বোন আভা। আমার চেয়ে চার বছরের ছোট।"

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, "এ ছবি তাহলে অনেক আগেকার।"

"হ্যাঁ, অনেক আগেকার। আভার বয়েস তখন ঠিক ছয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় আছে এখন তোমার বোন?"

প্যাটেল ওপরে আঙুল দেখিয়ে খুব আস্তে বলল, "স্বর্গে!"

"কবে তার মৃত্যু হল?"

"ওই ছ'বছর বয়েসেই।" প্যাটেল ছেড়ে ছেড়ে বড় করুণ করে বলল, "স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি আভার। আমার চেহারা দেখছ তো? নিগ্রোর মত। আমার বোনও আমার মত দেখতে ছিল—" তার অসংযত স্বর কাঁপল, "আভাকে নিগ্রো মনে করে অকারণে তাকে গলা টিপে বড় রাস্তার ওপর মেরে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা চামড়ার একদল লোক।"

আমি উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম, "হাউ হরিড!"

কিন্তু উত্তেজনার একটিও রেখা ফুটে উঠল না প্যাটেলের কপালে। শান্ত সংযত স্বরে সে বলল, "জান মিস্টার মুখার্জি, আমি আইনের একজন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। কিন্তু এখানে আইন পড়তে আসা আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না।"

"তবে?"

প্যাটেল ভিজে গলায় বলল, "রিভেঞ্জ! আমার দশ বছর বয়েস থেকে আমিও প্রতিহিংসাকে বিষধর সাপের মত লালন করে এসেছিলাম বুকের মধ্যে। পাঁচ-ছ বছরের সব সাদা চামড়ার শিশুকে আমিও গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।"

আমার বুকের মধ্যে কী রকম করে উঠল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। গলা শুকিয়ে আসছে। লণ্ডনের সাম্প্রতিক শিশুনিধন রহস্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার কাছে। তাই আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করলাম প্যাটেলকে, "তুমিই কি—"

"হ্যাঁ, আমি সেই নিউরোটিক মার্ডারার—যাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে হোল অব স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড—" প্যাটেল হাসল, "আমি দিব্যি আছি। লণ্ডনের পুলিস ভাবতেই পারে না যে এই বর্বর হত্যা একটা শিক্ষিত ইণ্ডিয়ানের কাজ।"

ভয় এবং ঘৃণায় অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল আমার মনে। সামনেই বসে আছে হৃদয়হীন এক হত্যাকারী। আমাকেও কী বিপদে ফেলবে, কে জানে। ও কী চায় আমার কাছে?

জিজ্ঞেস করলাম, "মিস্টার প্যাটেল, আমার কাছে এলে কেন?"

"শুধু তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে—" আবার কয়েক মুহূর্ত মাথা চেপে ধরে চুপচাপ বসে থাকল প্যাটেল, একটু পরে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে

করতে বলল, "মিস্টার মুখার্জি, এলিফ্যান্ট এণ্ড ক্যাসেলে ব্লিজার্ডের সেই সন্ধ্যার কথা তোমার মনে আছে?"

শুকনো গলায় বললাম, "হ্যাঁ।"

"অনেক ভাল ভাল কথা সেদিন আমাকে শুনিয়েছিলে তুমি। আমি শুনেছিলাম কিন্তু তোমার কথা সেদিন মেনে নিতে পারি নি—" আমার দিকে চোখ রেখে প্যাটেল জিজ্ঞেস করল, "টেগোরের একটা কবিতা আবৃত্তি করে কী যেন বলেছিলে তুমি?"

বললাম, "মনে নেই।"

প্যাটেলের চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, "আমার সব মনে আছে। তুমি বলেছিলে, মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব। সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কিন্তু বুকের মধ্যে প্রতিহিংসা লালন করে রাখতে পারে না—" কথা বলতে বলতে পাগলের মত হয়ে উঠল প্যাটেল, ভাঙা ভাঙা স্বরে চিৎকার করে বলল, "আমি মানুষ না, পশু। পশুর অধম। জান, আমি বাইশটা নিষ্পাপ শিশুকে গলা টিপে মেরে ফেলেছি। বেঁচে থাকতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার—বুক জ্বলে যাচ্ছে। ও গড! কিল মি—কিল মি!"

আমি লণ্ডনে থাকতেই ফাঁসি হয়ে গিয়েছিল রঘুবনাশ প্যাটেলের।



নীল সায়রে লড়াই

ভৈরবপ্রসাদ হালদার

বসন্তকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ।

উইলহেলসেভেন বন্দর।

উপসাগরের দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ায় বন্দর-অফিসের পতাকা উড়ছে। ফ্যাসিস্ট জার্মানীর স্বস্তিকা-লাঞ্ছিত বিশাল পতাকা।

বহু সমুদ্র-যান কূলে ভিড় করে আছে। কোনটা বন্দরে বোঝাই মাল খালাস করছে। কোনটা বা নতুন করে সমুদ্র-যাত্রার জন্য তৈরী হচ্ছে। বন্দরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের বুকে একখানা জাহাজ ভাসছে—বিশাল জাহাজ। সাততলা উঁচু টাওয়ার। ওয়্যারলেসের খুঁটিতে তারের টানা—প্রত্যেকটা খুঁটির মাথায় উড়ছে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর কালো পতাকা। টাওয়ারের বেসে বড় বড় কামান বসানো।

জার্মানীর ফ্যাসিস্ট নেতা হিটলারের ভয়াল রণহুঙ্কারে ইউরোপ তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই জার্মানীর যুদ্ধজাহাজ অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী!

সহসা যুদ্ধজাহাজের বাঁশীটা তীব্রস্বরে বেজে উঠল। থেমে থেমে বাঁশীটা বাজতে থাকে—যেন একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ার ফুঁসছে।

ঘড় ঘড় শব্দে জাহাজের নোঙর ওঠান হল।

সেদিন উনিশ শ উনচল্লিশ সালের একুশে অক্টোবর। একটা কামান তাক করল আকাশের দিকে।

বুম...উম...ম ম! ফাঁকা আওয়াজ!

অজস্র ধোঁয়া ছেড়ে জাহাজখানা এবার চলতে শুরু করে। উপসাগরের ঢেউ কাটিয়ে জার্মান ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজ অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী এগিয়ে চলে।

কিন্তু ক্ষুদে হলেও, হিটলারের জার্মান সরকার অনেক দিক দিয়ে জাহাজখানাকে দুর্ভেদ্য করে তৈরি করেছে। জাহাজখানা বার হাজার টনের। ছটি এগার ইঞ্চি ব্যাসের কামান তাতে। কামানগুলো থেকে ছ'শ সত্তর পাউণ্ড গোলা সতের মাইল দূরে নিক্ষেপ করা যায়। এক নাগাড়ে ছ সপ্তাহ কয়লা আর রসদ না পেলেও সে চলতে পারে।

হ্যানস্ ল্যাঙ্গস্ড্রফ এই ক্ষুদে যুদ্ধ জাহাজের ক্যাপ্টেন। জার্মানীর ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর হিটলারের প্রতি তাঁর অফুরন্ত আনুগত্য। উপসাগর পার হয়ে জাহাজ নর্থ সী-তে পড়ল। গ্রেট ব্রিটেনকে পূবে রেখে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। সামনে অন্তহীন অতলান্তিক বারিধি।

একটি একটি করে দশ দিন পার হয়। অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী সমানে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কবে ছাড়িয়ে এসেছে গ্রেট ব্রিটেনের উপকূল। শত শত মাইলের মধ্যে কোথাও ডাঙ্গার চিহ্ন নেই।

ক্যাপ্টেন হ্যান্স ল্যাঙ্গস্ড্রফ্ কেবিনে বসে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। নীল—অনন্ত নীল মহাসমুদ্রের জল। মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ সাপের মতন ফণা তুলছে—আবার ভেঙে পড়ছে।

সহসা ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ফোন তুললেন ক্যাপ্টেন।

পরমুহূর্তে ওঁর মুখের চেহারা বদলে গেল।

—হ্যাঁ, মেসেজ ধরুন! আমি আসছি।

দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি ওয়্যারলেস ঘরের দিকে।

ওয়্যারলেস ঘরে তখন ছোটখাট ভিড়। সবাই ব্যগ্র হয়ে খবর শুনছে। বার্লিনের ঘোষক তখন বলছে—জার্মান সৈন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস'র দিকে...সৈন্যদল প্রস্তুত হও!

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে পিতৃভূমি জার্মানী। এবার ওঁর দায়িত্ব ডিক্টেটরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা।

ল্যাঙ্গস্ড্রফ্ ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ দূর সমুদ্রের দিকে।

গ্রাফ স্পী মকরক্রান্তি রেখা বরাবর পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে। কয়েক দিন আগেও জাহাজখানা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে ছিল। ওয়্যারলেসে হুকুম

এসেছে—বৃটিশ জাহাজ ক্লিমেণ্ট যাচ্ছে, ওর ব্যবস্থা করো। এ হুকুমের অর্থ জানেন ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ। সারা দেশ এখন মরণপণ লড়াই করছে। লড়াই চলছে জলে স্থলে আকাশে। জার্মানবাহিনী তিন দিকে অভিযান চালাচ্ছে—ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড আর চেকোস্লোভাকিয়ার দিকে। সারা অতলান্তিকে ঘুরছে জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলো। মিত্রপক্ষের কোনও জাহাজ নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দিতে পারছে না। মাঝে মাঝে বৃটিশ নৌবাহিনীর সঙ্গে লড়াই হচ্ছে জার্মান নৌবাহিনীর, কিন্তু বৃটিশ নৌবাহিনী মার খাচ্ছে। ওদিকে জার্মান বোমারু বিমানগুলো বোমা ফেলছে লণ্ডনের উপর।

বেতারে যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে গর্বে ফুলে ওঠেন ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ ঃ জার্মান শক্তি আজ দুনিয়ার সেরা শক্তি! গোটা ইউরোপ রক্তের বন্যায় ভাসছে!

কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে ল্যাঙ্গস্‌ড্রফের মনে।

ক্লিমেন্ট ত যুদ্ধজাহাজ নয়—মার্চেন্টশিপ। আফ্রিকা থেকে সওদা নিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকায়। এ ধরনের জাহাজ ঘায়েল করা ত জলদস্যুতা—বোম্বেটেগিরি! আন্তর্জাতিক জাহাজী আইনের বিরোধী। এসব জাহাজে ত কামান বন্দুক থাকে না। আক্রান্ত হলেও নাবিকরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। তাহলে?.........

দূরে বৃটিশ বাণিজ্যতরী ক্লিমেন্টকে দেখা গেল।

দূরবীনে চোখ রেখে ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ সকলকে তৈরী হতে বললেন। গ্রাফ স্পী মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চলল।

ক্লিমেন্ট জাহাজের উদ্দেশ্যে ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ ওয়ারলেসে হুকুম করলেন—আত্মসমর্পণ করো। নইলে কামান দেগে জাহাজ উড়িয়ে দেব।

মার্চেন্টশিপ ক্লিমেন্ট। যুদ্ধজাহাজের সামনে একেবারে নিরূপায়। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লিমেন্টের সমস্ত নাবিকদের বন্দী করে গ্রাফ স্পীতে তোলা হল। নিরস্ত্র নাবিকদের হত্যা করা হল না।

তারপর গ্রাফ স্পী অনেকটা দূর পিছিয়ে এল।

সামনের তিনটে কামান তাক করল ক্লিমেন্ট জাহাজের দিকে ঃ ব্যুম...ব্যুম...ব্যুম!

দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল ক্লিমেন্ট জাহাজ।

অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পীর জলদস্যুতা কিন্তু থামল না, বাড়তে লাগল। বিষুবরেখা

দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অতলান্তিক মহাসাগরে ঘুরতে লাগল ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্রে ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজ। ব্রিটিশ মার্চেন্টশিপ একের পর এক ডুবল। ধ্বংস হল নখানা জাহাজ।

নৌসেনা থেকে আধুনিক যুগের একজন শক্তিশালী জলদস্যু হলেন ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌। ছ কামানে সাজান ক্ষুদে যুদ্ধজাহাজ। তার ওপর টর্পেডো নিক্ষেপের রয়েছে ব্যবস্থা। রসদেরও অভাব নেই। আক্রান্ত মার্চেন্টশিপের সমস্ত খাদ্য রসদ নিয়ে এসে ভরা হচ্ছে গ্রাফ স্পী স্টোরে। পরাজিত নাবিকরা বন্দী হয়ে স্থান পাচ্ছে গ্রাফ স্পীর বন্দীশালায়।

তার ওপর আছে জার্মান রসদ সরবরাহকারী জাহাজ আল্টামার্ক। সারা অতলান্তিকে ঘুরে ঘুরে আল্টামার্ক জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলোকে রসদ সরবরাহ করে.। অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী বন্দীদের চালান করে দেয় আল্টামার্কে।

একটা বুনো জানোয়ারের মতন অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী দক্ষিণ অতলান্তিকে ঘুরতে লাগল।

কাটল সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাস।

এল ডিসেম্বর।

তেইশখানা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ সমগ্র দক্ষিণ অতলান্তিকের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মান বোম্বেটে ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ আর তার অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পীর জলদস্যুবৃত্তি বন্ধ করতেই হবে। এমনভাবে চললে ইংরাজদের ব্যবসাবাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যাবে।

তেরই ডিসেম্বরের ভোর।

তিনখানা ক্রুজার নিয়ে তৈরী একটি ব্রিটিশ স্কোয়াড্রন টহল দিচ্ছে দক্ষিণ অতলান্তিকে—উরুগুয়ের উপকূলে। ক্রুজার তিনখানি খুব বড় নয়। ওদের নেতা হেনরি হারউড। এক্সিটর, অ্যাজাক্স এবং অ্যাকিলিসের কামানগুলো মাত্র আট ইঞ্চি ব্যাসের।

সহসা দূর সমুদ্রে দিকচক্রবালে ধোঁয়া দেখা গেল।

ওয়্যারলেসে দূরের জাহাজখানার খবর নিতে চাইলেন কমোডর হারউড। কিন্তু হুমকি এল ল্যাঙ্গস্‌ড্রফের—আত্মসমর্পণ করো।

বটে! এই সেই বোম্বেটে জাহাজ! অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী আর তার অধ্যক্ষ ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌! হুমকি দিচ্ছে! ব্রিটিশ ক্রুজারগুলো লড়াইয়ের জন্য তৈরী হল। খবর পাঠালে অতলান্তিক টহলরত সমস্ত রণতরীতে—অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী-কে আক্রমণ করছি। সাহায্য করো।

কমোডর হারউড জানতেন যে, অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী খুবই শক্তিশালী, তাকে এভাবে আক্রমণ করা বিপজ্জনক। তবু হাতের নাগালে পেয়ে অ্যাডমিরাল গ্রীফ স্পী-কে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী হলেন না। সামনাসামনি লড়াই করবেন। খবর পাঠান হয়েছে। কাছাকাছি যে-সব ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ টহল দিচ্ছে সেগুলো পৌঁছে যাবে ততক্ষণে।

সাঁড়াশীর মত ব্যূহ তৈরী করল ব্রিটিশ ক্রুজারগুলো। এক দিকে এক্সিটার এবং অন্য দিকে অ্যাকিলিস ও অ্যাজাক্স।

ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ নিজের জাহাজখানাকে আরও কাছে এগিয়ে আনলেন। একেবারে ইংরাজ জাহাজগুলোর কাছাকাছি। দুপাশের ছ-ছটা কামান মাথা তুলে জাহাজগুলোর দিকে তাক করল।

ঠিক সকাল ছটা আঠার মিনিটে অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পীর কামানগুলো গর্জে উঠল—ব্যুম্‌ ...ব্যুম্‌ ...ব্যুম্‌!

জবাব দিল ব্রিটিশ ক্রুজার—ব্যুম্‌ ...ব্যুম্‌ ...ব্যুম!

অব্যর্থ সন্ধান।

ব্রিটিশ কামানের গোলা এসে পড়ল গ্রাফ স্পীর ডেকে।

আগুন জ্বলে উঠল। জার্মান সৈনিকরা আগুন নিভিয়ে ফেলল।

সবচেয়ে আঘাত পেল এক্সিটার। আধঘণ্টার লড়াইয়ে একশটা গোলা এসে এক্সিটারে আঘাত হানল। পঞ্চাশজন নৌ-সৈনিক মারা গেল। গ্রাফ স্পীর আরও আঘাত থেকে এক্সিটারকে বাঁচিয়ে দিল অ্যাজাক্স আর অ্যাকিলিস।

একই সঙ্গে দুদিকে আক্রমণ। জার্মান ক্ষুদে জাহাজ নাজেহাল হয়ে পড়ে। পঞ্চাশটা গোলার আঘাতে গ্রাফ স্পীর ডেকের উপরটা তছনছ হয়ে গেছে। অনেক সৈনিক মারা গেছে।

ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌ এবার পালাতে চেষ্টা করলেন ধোঁয়ার আবরণ সৃষ্টি করে।

প্রচণ্ড বেগে সমুদ্রের জল তোলপাড় করে গ্রাফ স্পী এগিয়ে চলল। কাছেই নিরপেক্ষ দেশ উরুগুয়ে—মন্টিভিডিও বন্দর। আহত জাহাজ নিয়ে ওখানে আশ্রয় মিলবে। তারপর জাহাজ সারিয়ে নিয়ে গ্রাফ স্পী আবার সমুদ্রে ভাসবে।

উরুগুয়ে সরকার ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌কে হুকুম করল—বাহাত্তর ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। নিহতদের কবর দিয়ে আর ভাঙ্গা জাহাজ সারিয়ে নিয়ে বন্দর ছেড়ে যাও।

কিন্তু কোথায় যাবেন ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্‌?

বন্দর থেকে তিন মাইল দূরে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রিটিশ রণতরীগুলো। অ্যাডমিরাল গ্রাফ স্পী বন্দর ত্যাগ করে বার সমুদ্রে প্রবেশ করলেই একসঙ্গে তার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদের মিলিত আক্রমণে জার্মান ক্ষুদে রণতরী ডুবে যাবে।

তাহলে কি আত্মসমর্পণ? অসম্ভব! অসম্ভব!!

নির্ধারিত সময় পার হওয়ার আগেই ল্যাঙ্গস্‌ড্রফ্ জাহাজ সরিয়ে আনলেন বন্দরের বাইরে বালির চড়ায়। নিজে দাঁড়ালেন সম্পূর্ণ সামরিক পোশাকে ডেকের উপর। জার্মান সৈনিকরাও দাঁড়াল সার বেঁধে।

হেইল হিটলার!—সবাই অভিবাদন জানাল ফুয়েরার-কে, জার্মানীর ডিক্টেটর হিটলারকে।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে টাইম-বোমা ফাটল জাহাজের গুলি-বারুদের ঘরে। অ্যাডমিরাল-গ্রাফ স্পী টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

আত্মসমর্পণ না—আত্মত্যাগ! তীরে সমবেত উরুগুয়েনরা এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল।



বাঁশের কেল্লা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

বাঁশের কেল্লার কথা অনেকেই বলে কিন্তু বাঁশের কেল্লা কে তৈরি করেছিলেন এবং এখানে কিভাবে লড়াই চলেছিল, তার কথা হয়তো অনেকের জানা নেই।

বাঁশের কেল্লা তৈরি করেছিলেন তিতুমীর। ইংরেজরা বলে, তিতুমীর ছিলেন একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত, আবার এদেশের লোকে বলেন, তিনি ছিলেন একজন স্বদেশভক্ত বীর। সে যাই হোক, তাঁর জীবনের কাহিনী যা শোনা যায়, সেইটুকুই বলছি।

২৪ পরগনা জেলায় বাদুড়িয়া থানার ভেতরে হায়দারপুর বলে একটি গ্রাম আছে। সে জায়গাটি মুসলমানপ্রধান। সেইখানেই এক গরিব মুসলমানের ঘরে ১৭৮২ সালে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকে তিতুমীর লাঠিখেলা, ছোরাখেলায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতেন এবং তাঁর পালোয়ানীর খ্যাতি সেসময় চারধারে খুব ছড়িয়ে পড়ে।

সেই সময় জমিদারদের জুলুম খাটাবার জন্য লাঠিয়ালের খুব দরকার পড়ত এবং ভাল লাঠিয়ালদের লাঠির জোরে অপরের জমি দখল ও কারুর সঙ্গে রেষারেষি হলে মারপিট করার জন্য লোক রাখতেই হত। নদীয়ায় কয়েকজন জমিদার তিতুমীরকে সেই কাজের জন্য বাড়িতে ভাল মাইনে দিয়ে বহাল করেছিলেন। যিনি বেশী টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করতেন, তাঁর সম্পত্তি রক্ষার জন্যেই তিতুমীর চলে যেতেন। এই সময়ে একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে তিতুমীরকে জেলে যেতে হয়।

ইংরেজরা তখন ধীরে ধীরে তাঁদের শাসন ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলছে, লোকে তাদের ভয়ে অস্থির, কিন্তু তিতুমীর নিজের শক্তি ইংরেজদের চেয়ে ঢের বেশি ভেবে, ওদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না। যখন তাঁর উনচল্লিশ বছর বয়েস সেই সময়ে তিনি ভাবলেন যে আমি যখন একজন খাঁটী মুসলমান, তখন আমার মক্কা যাওয়া প্রয়োজন হজ করতে। এ তীর্থস্থান দেখতেই হবে। তিনি মক্কায় চলে গেলেন।

মক্কায় গিয়ে তিনি আরও গোঁড়া মুসলমান হয়ে এলেন। মুসলমানদের মধ্যে সেই সময় ইংরেজ ও কাফের বিরোধী একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল—তাদের নাম 'ওয়াহাবী সম্প্রদায়'। এই সম্প্রদায়ের একজন ধর্মগুরু সৈয়দ আহমদ্ সাহেব, তাঁকে দীক্ষা দিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে এলেন তিতুমিঞা নাম গ্রহণ করে। সেই থেকে ওয়াহাবী সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন তিতুমিঞা।

এই সময়ে তাঁর সঙ্গে মিস্কিন নামে এক ফকিরের আলাপ হল এবং তিনি তিতুমিঞাকে এমন প্রভাবান্বিত করলেন যে তিতুর গোঁড়ামি আরও বেড়ে গেল। হিন্দু, মুসলমান, ক্রীশ্চান যদি কেউ তাঁর মতের বিরোধিতা করত, তাহলে তার দফা নিকেশ করে দিতেন তিনি। তাঁর ভয়ে সাধারণ লোক কেউ কাছে ঘেঁষতে ভরসা করত না। তিতুমিঞা তখন নিজের একটা দল গড়ে ফেলেন।

পুঁড়ের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় আর গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক সময়ে তিতুর দলের ঘোরতর একটা সংঘর্ষ বেধে গেল—বহু লোক খুন জখম হল কিন্তু তিতুকে জব্দ করতে এঁরা কেউই পারলেন না। সেকালে জোর যার মুলুক তার, এই নীতিটাই চলত, অতএব তিতুর বিরুদ্ধে লাগতে গেলে রীতিমত যে-শক্তির দরকার হত, সেটা এঁদের ছিল না। বাধ্য হয়ে তাঁরা চুপচাপ রইলেন, কিন্তু ইংরেজরা তখন হাঙ্গামা বাধলে চুপ করে থাকত না, বিশেষ করে জমিদারদের ওপরে কেউ হামলা করলে তারা তাঁদেরই পক্ষ নিত, তবু তিতুমিঞার বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী দেবে না, মামলা ফেঁসে যাবে ভেবে তাঁরাও চুপ করে রইলেন। তাছাড়া তারা জানত তিতুমীর একজন দুর্ধর্ষ লোক আর তাঁর দলে লোক অনেক।

কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তিতুর প্রতাপ ক্রমশঃ আরও বেড়ে গেল। এর ওপর মিস্কিন ফকির তাঁর কানে কানে মন্তর দিলেন, আরে তুম্ তো বাদ্‌শা বন্ গিয়া, কিসিকো পরোয়া নেহি করো।

তিতু ভাবলেন, সত্যিই তো, আমার এত অনুচর, এত ভৃত্য, সবাই আমার ভয়ে থরথর করে কাঁপে, আমি তো সত্যিই বাদশা—কাকে পরোয়া তাহলে। আমি নিজেকে এখন বাদশা বলেই ঘোষণা করে দিচ্ছি। সত্যি সত্যি তিতু নিজেকে বাদশা বলে প্রচার করে দিলেন। তখন থেকে তাঁকে বাদশা তিতুমিঞা বলে সকলে ডাকতে লাগল।

মিস্কিন হলেন প্রধান মন্ত্রী—সেনাপতি হলেন মাসুম খাঁ নামে তিতুর এক বিশ্বস্ত অনুচর। এছাড়া সৈন্য, সামন্ত সব পদে এক একজন বসে গেল।

মিস্কিন ফকির পরামর্শ দিলেন, আরে তুম্ তো বাদ্শা হুয়া, তব্ কিল্লা কাহে নেই বানাতা। ইয়ে ইংরেজ লোগোঁকো সাথ লড়াই হোনেসে তুম্ ক্যা করেগা ?—আগাড়ী কিল্লা বানাও।

সত্যি তো কেল্লা তৈরি না হলে বাদশাহী করা তো যাবে না—তাছাড়া ইংরেজরা যদি সত্যি সত্যি কোনদিন কিছু করতে আসে, তাহলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে তো কেল্লা দরকারই। এই ভেবে তিতু নারকেলবেড়িয়া বলে একটি জায়গায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করে ফেললেন।

কেল্লা তৈরি করার পর, তিতুর প্রজাদের ওপর কর বসল, বাদশার সঙ্গে দেখা করতে হলে নজরানা দিয়ে দেখা করার নিয়ম হল, তাঁর হুকুম না মানলে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ইংরেজরা সে খবর পেলে কিন্তু এদেশের লোকের ওপর যা হচ্ছে হোক ভেবে তারা তখনও কিছু বললে না। তারপর নীলকুঠির সাহেবদের ওপর যখন বাদশার সৈন্যরা হামলা করে বসল, তখন ইংরেজের টনক নড়ল। আর চুপ করে থাকা চলে না। সাদা চামড়ার অপমান সহ্য হল না তাদের।

বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেটকে ইংরেজ সরকার হুকুম দিলেন, তিতুমীরকে গ্রেফতার কর। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্দার সাহেব একদল দেশী সেপাই নিয়ে নারকেলবেড়িয়ায় হাজির হলেন তিতুকে গ্রেফতার করতে, কিন্তু বাদশা তিতুমীর এমন তীর আর বর্শা ছুড়তে লাগলেন যে আলেকজান্দার তাঁর দলবল নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। তিনি সত্যি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালালেন।

এ সংবাদ গেল ভারতের তখনকার গভর্নর জেনারেল উইলিয়ম লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে। তিনি কলকাতার সামরিক অধ্যক্ষকে হুকুম করলেন, তিতুমীরকে যে কোন উপায়ে শায়েস্তা কর।

অধ্যক্ষের হুকুমে, একজন কর্নেলের অধীনে একশো গোরা সৈন্য, তিনশো দেশী সেপাই, দুটো বড় বড় কামান নিয়ে কলকাতা থেকে নারকেলবেড়িয়ার পথে যাত্রা শুরু করলে।

বেলা দুপুরে তারা বাঁশের কেল্লার বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছে ওখানকার প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করলে, তিতুমীর কোথায়?

বাঁশের কেল্লার প্রহরারত সৈন্যরা ভেতর থেকে জবাব দিলে, বাদশার সঙ্গে এখন দেখা হবে না—যাও, ভাগো!

কর্নেল সাহেব এগিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বললেন, আমি ফোর্ট উইলিয়ম থেকে আসছি, তিতুমীরকে ধরে নিয়ে যাবার গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে। তাকে বলে এস, ভালভাবে যদি সে আমার সঙ্গে যায় তো ভালই, নইলে তাকে জোর করে আমরা ধরে নিয়ে যাব!

প্রহরী দেখলে চারশো দেশী বিদেশী সৈন্য আর দুটো বড় কামান নিয়ে এরা হাজির হয়েছে যখন, তখন তাহলে বড় রকমের কিছু ঘটবেই—

তাহলে বাদশাকে খবর দিতেই হচ্ছে! তখুনি একজন পাহারাদার ছুটল খবর দিতে। একটু পরেই আরও কয়েকজন লোক নিয়ে সেনাপতি মাসুম খাঁ এসে দাঁড়ালেন দরজার ওপারে। খুব কড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই তোমাদের? বাদশা এখন বিশ্রাম করছেন, বেশী গোলমাল করলে ভাল হবে না।

কর্নেল গম্ভীরভাবে আবার বললেন, তিতুমীরের নামে সরকার থেকে গ্রেফতারির পরোয়ানা আছে—তাকে ধরে নিয়ে যেতে আমরা এসেছি।

বাদশাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছ? প্রশ্ন শুনে সবাই এর-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। সবাই ভাবলে, সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বোধহয়। তা না হলে বাঙলার বাদশাকে ধরতে আসে।

কর্নেল সাহেব তবু তিনবার পরোয়ানাটা দেখলেন। ভেতরের লোকরো চিৎকার করে বলে উঠল, জান বাচানে চাও, তো হট্ যাও বেয়াকুফ্ হিঁয়াসে।

কর্নেল আদেশ দিলেন, কামান দাগো।

একজন সিপাহী কর্নেলের আদেশ ও ইঙ্গিতে শুধু কেল্লার অধিবাসীদের ভয় খাওয়াবার জন্যে দুবার ফাঁকা তোপের আওয়াজ করলে।

কামান দাগার উপক্রম করতেই কিন্তু দরজার ওপারে সবাই হুড়মুড়িয়ে

ছুটে পালাল—কিন্তু আওয়াজটা থেমে যেতে উঁকি ঝুঁকি মেরে তারা দেখলে যে কেল্লার কোন ক্ষতি তো হলই না, এমন কি দরজাটাও ভাঙল না।

দলের পেছনে পেছনে তিতুমীরও এসেছিলেন। কেবল মিস্কিন ফকির লুকিয়ে পড়েছিলেন একটা ঝোপের মধ্যে।

তিতুমীর তখন শত্রুদের বিরুদ্ধে কি করা উচিত, সেই পরামর্শের জন্যে মিস্কিন ফকিরের খোঁজ করছিলেন কিন্তু তাঁকে খুঁজে পেলেন না। ওদিকে কর্নেল সাহেব অনর্থক হাঙ্গামা না করে বিনা রক্তপাতে যদি কার্য উদ্ধার হয়, তার জন্য কামান চালানো থামিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

ওদিকে ফকির সাহেব সব-কিছু চুপচাপ হয়ে যেতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যারা ওঁর খোঁজ করছিল। তারা তাঁকে দেখেই সোৎসাহে বলে উঠল, ইংরেজ কর্নেল কামানের গোলা চালিয়েও বাঁশের কেল্লার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তখন তিনি তাদের কথা শুনে মৃদু হেসে বলে উঠলেন, উ কেয়া করেগা—ম্যায় তো গোলা খা ডালা! (আমি তো গোলা খেয়ে ফেলেছি।)

এ্যাঁ! ফকির সাহেব মন্ত্রের জোরে অত বড় বড় গোলা খেয়ে হজম করে ফেলেছেন!—কথাটা শুনে তাদেরও চোখ বড় বড় রসগোল্লার মত গোল হয়ে গেল।

কেল্লার মধ্যে ফকিরের এই অদ্ভুত কেরামতির কথা ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে। তিতুমীর তখন ছুটে এসে ফকিরকে ঘন ঘন সেলাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এখন আমাদের কি করা কর্তব্য জনাব?

ফকির বলে উঠলেন, কুছ ডর নেহি—কুত্তাকো মার ডালো! (ভয় নেই, কুকুরকে মারো)।

সঙ্গে সঙ্গে মহোৎসাহে তিতুমীর আর তাঁর সৈন্যদল বাঁশের কেল্লার চারধারে সমবেত হয়ে গোরা আর সেপাইদের বিরুদ্ধে লাঠি, সড়কি, তীর ছুঁড়তে শুরু করলে। দু'চারজন সেপাই সেই আক্রমণে ঐখানেই রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল হুকুম দিলেন—চার্জ! তোপ দাগো।

মুহূর্তের মধ্যে কামান আর বন্দুক গর্জে উঠল বাঁশের কেল্লার সামনে। সেই গোলা আর গুলির আঘাতে কেল্লার মধ্যে তিতুর বহু সৈন্য প্রাণ দিলে।

একটি গোলার আঘাতে তিতুমীরের ডান পা-টা উড়ে বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে তিতুমীর মৃত্যুবরণ করলেন।

এক ঘন্টার মধ্যে বাঁশের কেল্লা ধূলিসাৎ হয়ে গেল নারকেলবেড়িয়া গ্রামে। বাদশার স্বপ্নপুরী বাতাসে মিলিয়ে গেল চিরকালের মত। সাড়ে তিনশো লোক বন্দী হল—তার মধ্যে একশো চল্লিশ জনের কারাদন্ড হল, বাকী খালাস পেয়ে গেল।

এই ঘটনাটি ঘটে ১৮৩১ সালে।

তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি মাসুম খাঁকে সেই বিধ্বস্ত বাঁশের কেল্লার সামনে লটকে দেওয়া হয় তারপরেই।

কিন্তু ফকিরকে এই ঘটনার পর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি যে কোথায় সরলেন—তা ইংরেজদের গুপ্তচররাও খুঁজে বার করতে পারেনি কোনদিন।



হাত পা না থাকলেও

পূরবী দেবী

ঘুণাক্ষরেও যদি সেদিন বুঝতে পারতো যে আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই তাকে ভীষণ দুর্ঘটনায় পড়তে হবে, তাহলে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে সে কিছুতেই সেদিন বেপরোয়াভাবে এরোপ্লেন চালিয়ে চিরজীবনের মত পাদুটি হারাতো না।

বয়স তার তখন সবে একুশ কি বাইশ। নাম ছিল ডগলাস বাদার। এই বয়সেই সে নিজের চেষ্টায় ইংল্যান্ডের রয়েল এয়ার ফোর্সে প্রবেশ করে উচ্চস্তরের বৈমানিক বলে খ্যাতি পেয়েছে। স্বভাবে যেমন জেদী তেমনি দুঃসাহসী। ভয়ের ছিঁটেফোটাও তার আচরণে দেখা যেত না। এরোপ্লেন নিয়ে উড়তে উড়তে এমন দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ দেখাতো যা তার সহযোগীরা কেউ সাহস করত না। এই সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সব থেকে কঠিন আর বিপজ্জনক ছিল এরোপ্লেন চালিয়ে মাটির কাছে স্ক্রুর প্যাঁচের মত ঘুরপাক খাওয়া।

মাটির কাছে এরোপ্লেন চালিয়ে ঘুরপাক খাওয়া শুধু যে বিপজ্জনক ছিল তাই নয়, রয়েল এয়ার ফোর্সের আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধও বটে। কয়েকবার এই দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে তাকে কর্তৃপক্ষ সাবধান করে দেয়। তবুও একলা এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উঠে ঘুরপাক খাওয়ার লোভ সে সংবরণ করতে পারতো না। কর্তৃ-পক্ষের চোখের আড়ালে এই বিপজ্জনক খেলাটি সে অভ্যাস করত।

একদিন সে এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উড়ছে এমন সময়ে দেখতে পেলে

বিমান ময়দান থেকে আর দুটি এরোপ্লেন আকাশে উড়ল। ডগলাস আগেই জানতো সেই এরোপ্লেন দুটি আজ উইবলি এরোড্রোমে যাবে। সেখানে বৈমানিকদের একটা ক্লাব আছে। সেই ক্লাবে তাদের দু'জন বন্ধু আছে। বন্ধুদের সঙ্গে তারা দেখা করবে।

ডগলাসের ইচ্ছে হল তাদের সঙ্গে উইবলি থেকে ঘুরে আসে। তাই সে তার বিমানটি রয়েল এয়ার ফোর্সের ময়দানে না নামিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে উড়ে চলল উইবলির দিকে।

উইবলি পৌঁছে এয়ার ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শেষ হবার পর যখন তারা সেখান থেকে উঠবে উঠবে করছে, এমন সময়ে ক্লাবের এক সভ্য ডগলাসকে বললে, আপনি নাকি এরোপ্লেনে মাটির কাছে স্ক্রুর মত ঘুরপাক খেতে পারেন? কথাটি কি সত্যি? একবার দেখাবেন?

ডগলাস এরোপ্লেনের খেলা দেখাতে রাজী হল না। তখন সেই লোকটি বললে, তাহলে আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি সব বাজে।

এরোপ্লেনে বিপজ্জনক খেলা দেখানোয় ডগলাসের পারদর্শিতায় সন্দেহ প্রকাশ করার অর্থ হল ডগলাসকে চ্যালেঞ্জ করা। ছেলেবেলা থেকে ডগলাসকে কেউ কোন কাজ পারবে না বলে চ্যালেঞ্জ করলে কাজটা যতই বিপজ্জনক হোক না কেন, আগুপিছু না ভেবে ডগলাস সেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এর জন্য তাকে বহুবার শাস্তি পেতে হয়েছে তবুও তার স্বভাব শোধরায়নি।

উইবলি ক্লাবে এইভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে ডগলাস এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। তারপর নানারকম ক্রিয়াকলাপ দেখাবার পর নীচে নেমে এসে মাটির কাছে সেই বিপজ্জনক স্ক্রু প্যাঁচ দেখাতে এরোপ্লেনের একপাশের ডানাটা মাটির সঙ্গে ধাক্কা খায়। সঙ্গে সঙ্গে প্লেন গোত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। মাটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে এরোপ্লেনের পাখা ও ইঞ্জিনটা এরোপ্লেনের মুখ থেকে খুলে একপাশে ছিটকে পড়ে আর প্লেনের বডিটা এসে সজোরে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা খায়।

এই আকস্মিক সংঘর্ষণে ডগলাস প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। বুঝতে পারেই না কি হল। বুদ্ধি ফিরে আসার পর দেখে তার ডান পাটা হাঁটু থেকে অনেক দূরে অদ্ভুত ভঙ্গীতে পড়ে আছে। আর তার বাঁ পাটা এরোপ্লেনের সীটের নীচে আটকে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও ডগলাস সেটাকে সীটের নীচে থেকে টেনে বার করতে পারে না। চারদিকে রক্ত।

এই ঘটনার খানিক পরেই ডগলাসের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে। তার মনে হল এরোপ্লেনের চারধারে লোকের ভিড় বাড়ছে। তারপর সে জ্ঞান হারিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে।

কদিন পরে যখন তার জ্ঞান ফিরল, তখন সে হাসপাতালে। তার দুটি পা'ই শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ডান পাটা হাঁটুর উপর থেকে এরোপ্লেনেই কাটা পড়েছিল। বাঁ পাটা এমন বিশ্রীভাবে ভেঙে গেছল যে তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ডাক্তার সেটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

দীর্ঘ ছয়মাস ধরে হাসপাতালে পড়ে থেকে ডগলাস শেষ অবধি সেরে উঠল। কিন্তু সেরে উঠলে কি হবে, সে এখন পঙ্গু। একতিলও বিছানা থেকে নড়তে পারে না। এদিক ওদিক যেতে হলে তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়।

ছেলেবেলা থেকে ডগলাস কোন বিষয়ে কারো সাহায্য নিত না। কেউ সাহায্য করতে এলে ধন্যবাদ দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করত। আজ পঙ্গু হয়ে চলাফেরা করার জন্যে লোকের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে বলে তার লজ্জার শেষ ছিল না। সদাই বিমর্ষ হয়ে থাকতো।

ডগলাসের মনের কথা বুঝতে পেরে যে নার্স তাকে দেখাশুনা করত সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, ডগলাস, দুঃখ করো না। তোমার হাঁটুর ঘাটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তোমায় পা-খুঁটি আর ক্লাচ দেওয়া হবে, তখন তুমি হাঁটতে পারবে।

আশায় আশায় কিছুদিন কেটে যাবার পর একদিন হাসপাতাল থেকে ডগলাসকে একটা ক্লাচ ও পা-খুঁটি দেওয়া হল। ডগলাস পা-খুঁটিটা বাঁ পায়ের নীচে বসিয়ে ফিতে দিয়ে উরু ও কোমরে বেঁধে নিলে। ক্লাচটার উপর ডান বগলে ভর দিয়ে ডগলাস হাঁটবার চেষ্টা করলে। প্রথম চেষ্টায় সে টলে গেল। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল হাসপাতালের পরিচারকবর্গ। তারা টপ করে তাকে ধরে বসিয়ে দিলে।

প্রথমবারে অকৃতকার্য হয়ে ডগলাসের জেদ বেড়ে গেল। সে বার বার চেষ্টা করতে লাগল। বাঁ পায়ের হাঁটুর কাছে পা-খুঁটির ঘষড়ানিতে জ্বালা করতে লাগল আর ডান বগলের নীচে ক্লাচের চাপে টনটন করতে থাকে। সব কষ্ট অগ্রাহ্য করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। হাজার কষ্ট হলেও সে হাল ছাড়বে না। বেশ কিছুক্ষণ অভ্যাসের ফলে ডগলাস হাঁটতে শিখে গেল।

এইভাবে কয়েকদিন কেটে যাবার পর ডগলাস এয়ার ফোর্সের হাসপাতালে এল।

এয়ার ফোর্সের হাসপাতালে থাকার সময়ে ডগলাসের মা প্রায় গাড়ি চালিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। একদিন ডগলাস মার সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছে। খানিকটা যাবার পর তার কি মনে হল। সে বললে, মা, গাড়িটা থামাও তো। ডগলাসের কথা মত ব্রেক চেপে মা গাড়িটা থামিয়ে ফেললেন।

এইবার তুমি দরজা খুলে আমার বাঁদিকে এসে বস। তার মা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। কিন্তু কোন প্রতিবাদ না করে গাড়ি থেকে নেমে ঘুরে বাঁদিকে এসে বসলেন। ডগলাস ততক্ষণে ড্রাইভারের সীটে গিয়ে বসেছে।

মা পাশে বসে দরজা বন্ধ করে দিতে ডগলাস গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাঁ উরুতে বাঁধা পা-খুঁটিটা দিয়ে গাড়ির অ্যাকসিলেটারটায় চাপ দিয়ে আস্তে আস্তে উঁচুনীচু করতে থাকে। কয়েকবার করার পর ডগলাস গাড়িতে স্টার্ট দিলে। এখন গাড়ি চালায় কি করে? পা-খুঁটিতে জোড়া মাত্র একটা পা। দুটো পা ছাড়া তো গাড়ি চালান যায় না। এখন উপায়?

ডগলাস মাকে বললে, মা, তোমার ডান পাটা দিয়ে ক্লাচটা টিপে ধর তো।

ডগলাসের মা অবাক্ বিস্ময়ে ছেলের কথামত ক্লাচটা টিপে ধরলেন। বললেন,—ডগলাস, হঠাৎ যদি পুলিস ধরে তো কি হবে?

—কি আবার হবে? পুলিসের সঙ্গে জোর তর্ক হবে। আবার কি।

ডগলাস হাত দিয়ে গাড়িতে গিয়ার দিয়ে বললে, মা এবার পাটা ধীরে ধীরে হালকা করে ক্লাচটা ছাড়তে থাক। ওদিকে ডগলাস তার পা-খুঁটিটা অ্যাকসিলেটারের উপর চেপে ধরলে।

গাড়িটা আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

ডগলাসের কি আনন্দ। এয়ার ফোর্সে ঢুকে সে একটা গাড়ি কিনেছিল। পা দুটো কাটা পড়াতে সে যে কখনও আর গাড়ি চালাতে পারবে তা ভাবেনি। আজকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে গাড়ি চালান, থামানো বা গতিবেগ বাড়ানোতে তার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না।

খানিকক্ষণ এইভাবে মায়ের সাহায্যে ক্লাচ টিপে ডগলাস গাড়ি যখন স্বাভাবিক ভাবে চালাতে লাগল তখন ডগলাসের মা খুশী হয়ে বললেন, ডগলাস তোমায় আর হেঁটে বেড়াতে হবে না। তুমি নিজেই গাড়ি করে ঘুরতে পারবে। শুধু একজন ক্লাচ টেপার জন্যে সঙ্গী দরকার।

আমি কি নিজে পারব না। একটা কিছু যদি হাতের কাছে থাকতো তাহলে চেষ্টা করে দেখতাম।

মা বললেন, আমার এই ছাতাটা দিয়ে হবে?

দেখি চেষ্টা করে।

এই বলে ডগলাস বাঁ হাতে ছাতি ধরে ক্লাচটা টিপতে চেষ্টা করলে। একটুও অসুবিধে হল না। বাঃ! নিজের মনেই ডগলাস বলে উঠল।

তারপর থেকে মা এলেই ডগলাস নিজে গাড়ি চালিয়ে মার সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াত।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডগলাসের জন্যে একজোড়া কৃত্রিম পা তৈরি করা হল। ডগলাস পা'টার মধ্যে হাঁটুটা গলিয়ে দিয়ে পায়ের সঙ্গে লাগান স্ট্রাপগুলি কাঁধের সঙ্গে বেঁধে নিলে। যে লোক পা তৈরি করে এনেছিল সে ডগলাসের হাতে একটা লাঠি দিলে ভর দেবার জন্যে। ডগলাস লাঠি নিলে না। সে নিজেই নিজের জোরে চলবে।

ডগলাস এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করলে। পারলে না। আবার চেষ্টা করলে। এইবার সে দাঁড়িয়ে উঠল। আয়নার দিকে তাকালে। না আর তাকে খোঁড়া দেখাচ্ছে না। নিজের মনে তার পূর্ণ বিশ্বাস ফিরে এল। এবার সে আগের মত সকলের সামনে বোরোতে পারবে, কেউ তাকে খোঁড়া বলে তাচ্ছিল্য করবে না।

এইবার ডগলাস হাঁটবার চেষ্টা করলে। কখনও কৃত্রিম পায়ের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে হাঁটেনি। একটা পা সামনে এগোতে গিয়েই টলে গেল। লোকটি তাকে ধরে ফেললে। পড়তে পড়তে ডগলাস বেঁচে গেল। কিন্তু ডগলাস এত সহজে হাল ছাড়বার ছেলে নয়। সে আবার চেষ্টা করতে শুরু করলে। কয়েকবার চেষ্টা করার পর হেঁটে চলা খানিকটা অভ্যেস হয়ে এল। অসুবিধে হল, পাশ ফিরতে গিয়ে। কৃত্রিম পায়ের উপর ভর দিয়ে পাশ ফেরা সোজা নয়। কয়েকবার চেষ্টা করার পর ডগলাস দেখলে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘোরা তার পক্ষে কঠিন নয়। সে চট্ করে সেই ভাবে ঘুরতে শুরু করলে।

ব্যস। আর ডগলাসকে কে পায়। সে তার গাড়িটাকে গ্যারেজ থেকে আনিয়ে নিলে। তারপর নিজেই সেটাকে স্টার্ট দিয়ে চালাতে সুরু করলে। পায়ের অভাবে ছাতির লাঠি দিয়ে আর ক্লাচ টিপতে হল না।

ডগলাস ভেবেছিল সে যখন হাঁটতে পারে গাড়ি চালাতে পারে তখন রয়েল এয়ার ফোর্স থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে না। তবুও তার মন থেকে পুরোপুরি ভয়টা গেল না। হয়তো পঙ্গু বলে তাকে বাতিল করে দেবে।

এরোপ্লেন চালাতে গেলে গাড়ি চালাবার মত পায়ের অত প্রয়োজন হয় না। ডগলাস জানতো সুবিধে পেলে সে এরোপ্লেন চালিয়ে দেখিয়ে দেবে যে সে অন্য বৈমানিকদের থেকে একটুও অকেজো নয়। সে সুযোগ এসে গেল। একজন বড় অফিসারের বাড়িতে তার নেমন্তন্ন হয়েছিল। কথায় কথায় সেই অফিসার বললে, তুমি কি একলা এরোপ্লেন চালিয়ে উড়তে পারবে?

অফিসার ডগলাসের উত্তর আশা করেননি। ডগলাস বললে, হ্যাঁ পারব।

—দেখাতে পার?

—এখনি।

—আচ্ছা মাঠে ঐ একটা এরোপ্লেন রয়েছে। চালাতে দেওয়া বেআইনী তবুও তোমার কেরামতিটা দেখি একবার।

ডগলাস তখনি গিয়ে এরোপ্লেনের ককপিটে লাফিয়ে উঠল। ককপিটে বসে মনে হল সে যেন আবার পুরানো জীবনে ফিরে গেছে। পায়ের কথা তার স্মরণে এল না। ককপিটের ডায়াসে যন্ত্রপাতিগুলি ভাল করে দেখে নিয়ে সে সেলফ্ স্টার্টারে হাত দিলে। গোঁ গোঁ করে প্লেনের পাখাটা ঘুরতে শুরু করল। ডগলাসের বুকটা আনন্দে ফুলে উঠল। আকাশে উড়বার জন্যে সে জন্মেছে। পা ভেঙে পড়ে থাকতে কি তার ভাল লাগে।

এরোপ্লেনের পাখার গতিবেগ বাড়িয়ে ডগলাস চাকার ব্রেকটা খুলে দিলে। এরোপ্লেনটা সামনে এগিয়ে চলল। ডগলাস পা দিয়ে রাডারের যন্ত্র টিপে ধরল। এরোপ্লেনটা ধীরে ধীরে পাশ ফিরে রানের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল। সেইখানে ডগলাস এরোপ্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে রানের মুখোমুখি করে ব্রেক কষে দাঁড় করালে। এইবার আকাশে ওঠার দৌড় শুরু হবে।

ভীষণ গর্জন করে ডগলাসের হাতে প্লেনটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। ডগলাস ব্রেক ছেড়ে দিলে। প্লেনটা প্রথমে ধীরে ধীরে একটু এগিয়ে গেল। প্লেনের কাঁপুনি যেন কমে গেল। তারপরই অতি দ্রুত বেগ অর্জন করে প্লেনটা উল্কার বেগে সামনে ছুটে চলল। প্লেনটার লেজটা উঁচু হয়ে উঠল। ডগলাস হাতের যন্ত্রটা টেনে ধরলে। দেখতে দেখতে প্লেনটা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল। ডগলাস যখন আকাশে উঠে পড়ল তখন নীচে থেকে সেই অফিসার

দুরুদুরু বক্ষে সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ভালোয় ভালোয় মাটিতে নেমে আসতে পারবে তো ছোকরা। যদি সেবারের মত অ্যাকসিডেন্ট করে তাহলে ওর হাড়ের ছিটে-ফোঁটাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ওদিকে আকাশে উঠে ডগলাসের মনের গ্লানি একেবারে চলে গেল। নানারকম ভাবে এরোপ্লেনটা উঠিয়ে নামিয়ে গোঁৎ খেয়ে ডগলাস ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ পাইলটের মত প্লেনটা ডাঙ্গায় নামিয়ে আনলে। তারপর ককপিটের মাথাটা খুলে একপাশে দুহাতে ভর দিয়ে ব্যাঙের মত ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে মেঝের উপর দাঁড়াল।

ডগলাস এরোপ্লেন থেকে হেঁটে যখন অফিসারের কাছে দাঁড়াল তখন সেই অফিসার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ডগলাসকে অভিভূত করে বললে, তুমি যখন এরোপ্লেন চালিয়ে এসে নামলে, তোমার নামা দেখে মনে হল খুব অভিজ্ঞ বৈমানিকও এত অবহেলায় নেমে আসতে পারে না। তোমাকে নিশ্চয়ই এয়ার ফোর্সে থাকতে দেবে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডগলাসের পক্ষে এয়ার ফোর্সের জঙ্গীবৈমানিক হয়ে থাকা সম্ভব কিনা এই নিয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বৈঠক হল। ডগলাসকে পরীক্ষা করা হল। ডগলাসের স্বপক্ষে সেই অফিসার সমর্থন করলে। সকলেরই একমত যে ডগলাস এয়ার ফোর্সে থাকুক।

কিন্তু.......

এয়ার ফোর্সের আইনে পদহীন ব্যক্তির জঙ্গীবৈমানিক হয়ে থাকবার কোন নিয়ম নাই।

অতএব—

সকলের সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও ডগলাসকে বিদায় নিতে হল।

এই ঘটনার পর প্রায় সাত বছর কেটে গেছে। ডগলাস তখন একটা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে। তার দৃঢ় একাগ্র মনোভাবের ফলে উন্নতিও হতে থাকে। কিন্তু মন তার সদাসর্বদা পড়ে থাকে এরোপ্লেনের দিকে।

এই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পোলান্ডের যুদ্ধ শেষ করে জার্মানী এবার পশ্চিম দিকে মন দিয়েছে। জার্মানীর পূর্বপরিকল্পিত যন্ত্রবাহিনীর সামনে মিত্রপক্ষ ক্রমশঃই হটে আসতে থাকে। প্রায়ই সংবাদ আসতে থাকে আকাশযুদ্ধে শত্রুপক্ষের গোলার আঘাতে মিত্রবাহিনীর জঙ্গীবিমান ভেঙে পড়েছে। যত বৈমানিক মারা যাচ্ছে সংখ্যায় তত তৈরী হচ্ছে না। ইংল্যান্ড পড়ল মহা ফাঁপরে।

ডগলাস নিয়মিত অফিসে যায়। আর বাড়ি ফিরে খবরের কাগজ পড়ে। একদিন সকালে অফিসে গিয়ে ডগলাস মালিককে বললে, কাল থেকে আমি আর কাজে আসব না।

মালিকের মনে হল মাইনে বাড়াবার জন্যে ডগলাস চাপ দিচ্ছে। তিনি বললেন, কত মাইনে চাও। তোমাকে ছাড়তে পারব না।

ডগলাস বললে, আপনি আমাকে অংশীদার করে নিলেও আমার সিদ্ধান্ত বদলাবে না! আমি যা চাই তাই পাচ্ছি।

—কি ব্যাপার?

—আজ রয়েল ফোর্স থেকে চিঠি পেয়েছি। আমাদের বৈমানিকদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। তাই আমায় তারা জিজ্ঞাসা করেছে আমি জঙ্গীবৈমানিক বিভাগে যোগ দিতে রাজী কিনা।

বিদায় নিয়ে ডগলাস এসে যোগ দিলে রয়েল এয়ার ফোর্সে। এয়ার ফোর্স বিভাগ ডগলাসকে এক স্কোয়াড্রনের লিডার করে দিলে।

বিমানবাহিনীর ভার নিয়ে ডগলাস তাকে ঢেলে সাজালে। তার স্কোয়াড্রনে যে সব বৈমানিক যোগ দিয়েছিল তাতে মিত্রপক্ষের অন্যান্য দেশের ছেলেরাও ছিল। বেশির ভাগ ছেলেই ডানকার্ক থেকে প্রাণ হাতে করে ফিরেছিল। কারো পরনের পোশাকটি ছাড়া দ্বিতীয় পোশাক অবধি ছিল না। যে বিমানগুলি ডগলাসকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল সেগুলির অধিকাংশই অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি কলকব্জার অভাবে নির্ভরযোগ্য ছিল না।

ডগলাস তার বৈমানিকদের আদেশ দিলে, এখনি তোমরা নতুন পোশাকের অর্ডার দিয়ে এস। বিমানবাহিনী তার দাম না দিলে আমি দেব। তারপর কলকব্জার জন্যে সরকারী বিভাগে তাগাদা শুরু করলে। এর জন্যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা নিয়ে এসে হাজির হল।

সমস্ত ব্যবস্থা ঠিকমত হয়ে যাবার পর ডগলাস তার স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের দিকে নজর দিলে। জার্মানীর হাতে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করে আর সরকারী ঔদাসীন্যে তারা সব উৎসাহ হারিয়ে শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়েছিল। ডগলাসের সহযোগিতায় ও সহানুভূতিতে তাদের মনে আবার আশার উদ্রেক হতে থাকে। জঙ্গীবিমান চালনায় তারা ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর বৈমানিকদের ছাড়িয়ে যেতে লাগল। ডগলাসের নেতৃত্বে তাদের মনে

আবার দেশপ্রেম জেগে উঠে দেশের জন্যে তাদের আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত করে তুলল।

বিমান চালনা ভাল করে অভ্যাস হয়ে যাবার পর ডগলাস এইবার সত্যি সত্যি বিমানযুদ্ধে তার স্কোয়াড্রনের কৃতিত্ব পরীক্ষা করবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে দিকে আকাশ আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্যে ডগলাসের স্কোয়াড্রনকে নিযুক্ত করা হয়েছিল, সেদিকে একবারও তখন জার্মানীর জঙ্গীবিমান আসতে দেখা যায়নি।

এইভাবে কিছুকাল কেটে গেল। সমস্ত ফ্রান্সটা জার্মানীর অধিকারে আসার পর হিটলার তাঁর বিমান বাহিনীকে প্রবলভাবে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করবার জন্যে আদেশ দিলেন।

শুরু হয়ে গেল আকাশযুদ্ধ। যখনই জার্মানীর বিমান ফ্রান্সের উপকূল থেকে ওঠে অমনি টেলিফোনে তটস্থ প্রহরীরা সংকেত পাঠায় বিমান বাহিনীর কাছে। যেদিকে আক্রমণ হবার সংকেত আসে সেদিকের বিমান তক্ষুণি তৎপর হয়ে আকাশে উঠে পড়ে। তারপরই ক্যাট ক্যাট করে কেবলই মেসিনগানের শব্দ ভেসে আসে। হয়তো স্বস্তিকা আঁকা জার্মানীর কোন বোমারু বিমানে গুলির আঘাতে আগুন ধরে যায়। সেটিকে জ্বলতে জ্বলতে পড়তে দেখা যায়। কখনও বা মিত্রপক্ষের অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে।

এইভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এগিয়ে যেতে থাকে। বিমানযুদ্ধে ডগলাসের বিমানবাহিনীর খ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সে খ্যাতি যে কতদূর রটেছিল তা ডগলাস বুঝলে যখন তার এরোপ্লেন ভেঙে পড়ল জার্মানীর এলাকায়।

একবার শত্রুপক্ষের বিমানের অনুসরণে ডগলাস ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের উপকূলে প্রবেশ করে। পলায়মান জার্মান বিমান দ্রুতবেগে আরো ভিতরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। ডগলাস দেখলো সব প্লেন সরে পড়েছে। কোন প্লেন আর চোখে পড়ছে না। ওদিকে তখন শত্রুপক্ষের একটা বোমারু বিমান আকাশ থেকে ডগলাসের প্লেন লক্ষ্য করে দ্রুত গোত্তা খেয়ে নেমে আসছে তা ডগলাস দেখতে পায়নি। হঠাৎ তার প্লেনটা গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল। কিছু বোঝবার আগেই ইঞ্জিনে আগুন ধরে গেল। আর কোন উপায় নেই। এবার প্লেনটা গোত্তা খেয়ে আছড়ে পড়বে মাটির উপর। এখুনি প্যারাশূট নিয়ে লাফিয়ে না পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। ডগলাস ফিরে যাবার আশা ত্যাগ করে এরোপ্লেনের ককপিটের মাথা খুলে দুহাতে ভর দিয়ে সীটের উপর দাঁড়িয়ে উঠল। ইঞ্জিনের হলকা এসে তার মুখে লাগছে। তখন অত বিচার করার সময়

নেই। ডগলাস প্লেন ছেড়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল। আর প্লেনটা গোত্তা খেয়ে নীচে নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তারপর কখন যে ডগলাসের পিঠে বাঁধা প্যারাশূট খুলল, কি করে সে নেমে এল তা তার স্মরণ নেই। জ্ঞান হবার পর সে দেখে সে একটা হাসপাতালে পড়ে আছে। আর তার চারদিকে জার্মানীর উচ্চপদস্থ বৈমানিকরা তাকে ঘিরে বসে আছে।

ডগলাসের জ্ঞান ফিরতে একজন তাকে প্রশ্ন করে, তোমার নাম কি? কত নম্বর?

ডগলাস নাম আর নম্বর বললে। কিন্তু আর কোন প্রশ্নের জবাব দিলে না। বললে, আমি এখন যুদ্ধবন্দী। জেনেভা কনভেনসন অনুযায়ী আমি আর কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই। তারপর বললে, আমার পা কই?

ডগলাস যখন প্যারাশূট করে মাটিতে নেমে আসে তখন ভুমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার পাদুটি শরীর থেকে খুলে পড়ে যায়।

ডগলাসের কথা শুনে অফিসাররা মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। একি অদ্ভুত দাবিরে বাবা। তার পা কি কেটে গেছে। এমন সময়ে একজন নার্স এসে ডগলাসের চাপা সরাতে দেখা গেল তার পা দুটি হাঁটু থেকে কাটা। তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমিই কি সেই পা কাটা ডগলাস যার বীরত্বের কাহিনী আমরা এখানে বসে শুনতে পাই। কিন্তু কি করে তুমি এরোপ্লেন চালিয়ে যুদ্ধ করতে?

—যেমন করে তোমরা কর। কিন্তু আমার পা দুটো যাতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা কর।

আকাশ থেকে ভেঙে পড়ার সময়ে ডগলাসের প্লেনে আগুন ধরে যায়। তাই সবাই ধরে নিয়েছিল প্লেনের সঙ্গে পা দুটিও ছাই হয়ে গেছে, এখন উপায়। তবুও তারা পা দুটি খোঁজবার জন্যে দু'জন সৈনিক পাঠিয়ে দিলে যেখানে ডগলাস প্যারাশূট করে এসে মাটিতে নেমেছিল।

ডগলাসের ভাগ্য ভাল। পা দুটি তার প্লেনের আগুনে খোয়া যায়নি। ডগলাস যখন প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ে তখন তার শরীরের সঙ্গেই পা দুটো বাঁধা ছিল। তারপর পৃথিবীর উপর আছড়ে পড়ার সময়ে পা দুটি বাঁধন মুক্ত হয়ে একটু দূরেই ছিটকে পড়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বলে ডগলাস তা বুঝতে পারেনি।

পা দুটি ফিরে পেয়ে ডগলাসের মনে আবার উৎসাহ ফিরে এল। জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা ডগলাসকে নিয়ে একটা যুদ্ধবন্দী হাসপাতালে রেখে দিলে। জায়গাটা ফরাসীদেশের একপ্রান্তে জার্মানীর কাছে। হাসপাতালে আরো সব বন্দীরা আহত হয়ে পড়ে ছিল। ডগলাস তাদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলে। দু'চারদিন আলাপ করার পর ডগলাস তাদের জিজ্ঞেস করলে আমাদের যে নার্স দেখাশুনা করছে সে কি নির্ভরযোগ্য?

বন্দীরা বললে, ও ফরাসী।

—ওর সাহায্যে কি পালান যাবে না?

চারদিকে প্রহরী। তাদের চোখ এড়িয়ে কি পালান যাবে?

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন নার্সটি তার নিত্য নৈমিত্তিক কাজে রুগীদের দেখতে এল, ডগলাস তাকে চুপি চুপি বললে, এখান থেকে পালাবার কি উপায় আছে সিস্টার?

নার্সটি কোন কথার জবাব দিলে না।

তার পরদিন সন্ধ্যেবেলায় যথারীতি দেখতে এসে ডগলাসের হাতে একটা ছোট কাগজ দিয়ে চলে গেল।

সেই কাগজটায় লেখা ছিল প্রতিদিন রাত বারোটায় সময়ে গেটের কাছে লোক দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।

কথাটার মানে বুঝতে ডগলাসের দেরি হল না। সে ব্যাপারটি তার ঘরের বন্দীটিকে জানায়। বন্দীটির পা ভেঙে গেছল। তার পক্ষে পালান অসম্ভব। তাই সে ডগলাসকে বললে তুমি চেষ্টা কর।

সেদিন রাত বারোটার সময়ে ডগলাস বিছানার চাদর ছিঁড়ে দড়ির মত পাকিয়ে জানলা দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে। তারপর অনেক কষ্টে জানলার উপর তার কৃত্রিম পা দুটো হাতের ভরে টেনে তুলে জানলার বাইরের আলসের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর দুহাতে পাকানো চাদরের দড়ি ধরে ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ডগলাস ধরা পড়ার পর তার পা নেই দেখে সে যে কখনও অন্য সব বন্দীদের মত একটু সুযোগ পেলেই পালিয়ে গা ঢাকা দিতে পারবে একথা কারো মনে হয়নি। তাই কেউ তার দিকে তত নজর রাখেনি। এমন কি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ডগলাসকে জার্মানীর প্লেন যে কত ভাল তা দেখাবার জন্যে তাকে জার্মানীর প্লেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল।

সেই প্লেনে বসে ডগলাসের যা মনে হচ্ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করলে এই রকম শোনাবে।

যদি ঘিরে থাকা এই লোকগুলি মুহূর্তের জন্যে দূরে সরে যায় তাহলেই সেল্‌ফ স্টার্টারে স্টার্ট দিয়ে বোঁ করে উড়ে যেতে পারি।

কিন্তু সে আশার কথা। ডগলাস জানতো যে তাকে ঘিরে থাকা লোকগুলির মধ্যে একজনের হাতে পিস্তল তৈরী ছিল। মুহূর্তের বেচালে পিস্তলের মুখে আগুন জ্বলে উঠত। ডগলাসের এ কাহিনী চিরতরে লোক চক্ষুর আড়ালেই থেকে যেত।

ডগলাস মাটিতে নেমে দু'এক পা এগুবার পরই বন্দী হাসপাতালের মাথায় রাখা সুবৃহৎ অনুসন্ধানী আলোটি ফাঁকা মাঠের উপর আলোর বন্যা বইয়ে একপাশে সরে গেল। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল বলে ডগলাসের উপর আলোর রশ্মি এসে পড়ল না।

সকলের অলক্ষিতে ডগলাস তাঁর কৃত্রিম পায়ে ভর দিয়ে হাসপাতালের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার ভাগ্য ভাল যে গেটটা খোলাই ছিল আর সে সময়ে কোন কারণে প্রহরীও উপস্থিত ছিল না।

এই সময়ে ডগলাসের মনের যা ভাব হচ্ছিল তা বলা কঠিন। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিল এই বুঝি প্রহরীদের চোখে পড়ে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বন্দী অবস্থায়। আরো কড়া পাহারা হবে তার বেলা।

যা হোক ডগলাস তো বন্দী-হাসপাতালের সীমানার বাইরে এসে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে একটি লোক এসে তার পাশে উপস্থিত হল। একে তো চারদিকে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, তারপর লোকটির আবরণে কালো পোশাক। মাথার চারদিকে টুপিটাও এত টেনে নামানো যে তার সাদা মুখটার অধিকাংশই দেখা যায় না।

লোকটি চাপা গলায় ফরাসী ভাষায় বললে, নিঃশব্দে আমাকে অনুসরণ করে এস।

ডগলাস কোন কথা না বলে তাকে অনুসরণ করে চলল। পথ আর ফুরোয় না। চলতে চলতে কৃত্রিম পায়ের উপর হাঁটুর ঘষড়ানিতে ছড়ে গিয়ে জ্বলে যেতে লাগল। ধরা পড়লে মুক্তির আর সম্ভাবনা নেই জেনে ডগলাস সব জ্বালা-যন্ত্রণা উপেক্ষা করে তার কৃত্রিম পা দুটো ক্রমাগত চালিয়ে নিয়ে চলল।

এইভাবে দীর্ঘ তিন ঘন্টা অতিক্রম করে তারা একটা বাড়ির সামনে এসে

দাঁড়াল। আবছা আবছা বাড়ির আকার দেখে ডগলাস বুঝতে পারলে সে শহরের বাইরে কোন পল্লীগ্রামের খামারে এসে পড়েছে। লোকটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সাংকেতিক ভাষায় কি বললে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আলো হাতে এক বৃদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটি ডগলাসকে ভেতরে যেতে বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে ডগলাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র লোকটি দরজা বন্ধ করে দিলে। তারপর ডগলাসকে নিয়ে পাশের ঘরে এল। সেখানে লোকটির স্ত্রী বসেছিলেন। তিনি সাগ্রহে ডগলাসকে একটা চেয়ারে এসে বসতে বললেন। বসবার জন্যে ডগলাসের হাঁটু টনটন করছিল। অনুরোধ করা মাত্রই ডগলাস বসে পড়ে হাঁটু থেকে কৃত্রিম পা দুটো খুলে ফেললে। ডগলাসের পা নেই দেখে গৃহকর্তা ও তাঁর স্ত্রী অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়ের ভাব খানিকটা কমতে তাঁরা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, আপনার পা কি যুদ্ধে কাটা গেছে?

তাঁদের কুণ্ঠা দেখে ডগলাস একগাল হেসে তাঁদের কৌতূহল নিরসন করে পা কাটা যাওয়ার সমস্ত কাহিনী ব্যক্ত করে বললে, এই কাটা পা নিয়ে আমি ষোলটা জার্মান বিমান ভূপাতিত করেছি। সে যা হোক এখন হাঁটুটা বড় জ্বালা করছে। অনেক পথ হেঁটে এসেছি। কিছু পাউডার তুলো আর প্লাস্টার পেলে ভাল হয়। এইখানটা এই ছড়ে যাওয়া জায়গায় ব্যান্ডেজ করে পা দুটো হাঁটুর সঙ্গে জুড়ে নেই। না হলে আর চলতে পারব না। এখন পায়ে চলা অতিথি হয়ে আছি, কিন্তু পা না থাকলে আপনাদের পিঠে চড়ে ঘুরতে হবে।

গৃহকর্তা ও তাঁর স্ত্রী ডগলাসের কথা শুনে হেসে উঠলেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি ওষুধপত্র এনে দিলেন। ডগলাস তার হাঁটুর ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়ে পা দুটো আবার স্বস্থানে লাগিয়ে নিলে। তারপর গৃহকর্ত্রীর দেওয়া খাবারগুলি উদরসাৎ করে একটা ঘরে শুয়ে পড়ল।

তখনও ভোর হতে দেরি। ডগলাস দীর্ঘপথ হেঁটে আসার পরিশ্রমে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এমন সময়ে নাড়া পেয়ে জেগে উঠে দেখে তার সামনে গৃহকর্তা শঙ্কিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

ডগলাসকে জেগে উঠতে দেখে চাপা সুরে বললে, শীগ্‌গির! পেছনের খামার ঘরে। জার্মান পুলিস।

আর কিছু বলতে হল না। এক লাফে ডগলাস বিছানায় উঠে বসল। পা দুটি শোবার আগে খুলে খাটের পাশে রেখেছিল। তাড়াতাড়ি আবার বেঁধে

নিলে নিজের উরুতে। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলে তার কোন চিহ্ন পড়ে আছে কিনা। সব দেখে নিয়ে গৃহকর্তার সঙ্গে গিয়ে খামার ঘরে ঢুকল। সেখানে খড়ে ভরতি। ডগলাস খড়ের গাদার নীচে আত্মগোপন করে রইল।

এরকম করে কতক্ষণ সে চুপ করে পড়ে ছিল তার মনে নেই। কিন্তু খানিক পরে বুঝতে পারলে খামারের দরজা বেশ শব্দ করে খুলে গেল। তারপর কতকগুলি বুটজুতার পায়ের আওয়াজ শব্দ করে ভেতরে ঢুকল। ডগলাস বুঝলে জার্মান পুলিস খামার ঘরে ঢুকেছে। এইবার অনুসন্ধান চালাবে। কিন্তু অতবড় খামার ঘর। সারা ঘরটি খড়ে ভরা। অত বড় ঘরে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করা সোজা নয়। তারা ওপর ওপর দু'চারটে খড়ের আঁটি সরিয়ে ভেবেছিল পলাতক বন্দীকে ধরতে পারবে। কিন্তু ডগলাসের হদিস না পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর পুলিসগুলো তাদের বন্দুকে লাগানো বেয়োনেট দিয়ে খড়ের গাদায় খোঁচা মারতে শুরু করলে।

একটা খোঁচা ডগলাসের মাথার এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে ফিরে গেল। ডগলাস দেখলে মহাবিপদ। চুপ করে পড়ে থাকলে এখনি বেয়নেটের খোঁচায় তার প্রাণ যাবে। সে আর নিঃশব্দে আত্মগোপন করে না থেকে খড় ঠেলে বেরিয়ে এল।

ডগলাসকে বেরিয়ে আসতে দেখে সৈনিকরা উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু ডগলাসের মন খারাপ হয়ে গেল দরজার সামনে গৃহকর্তাকে দেখে। তাঁর মুখ দেখে বুঝতে বাকী রইল না ডগলাসের যে সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের উপর অনেক অত্যাচার হয়ে গেছে এবং আরো অত্যাচার হবার সম্ভাবনায় তাঁর মুখ থেকে সব রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে।

ডগলাস ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে মিলিটারী অফিসারকে বললে, আমার জন্যে ইনি দায়ী নন। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে খামারে ঢুকেছি।

মিলিটারী অফিসার ইংরেজী বুঝতো। সে বললে, সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। এখন চল তো। ডগলাস জানতো না যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে খামারে ঢোকবার সময়ে একটা রুমাল ফেলে এসেছিল ঘরে। মিলিটারী পুলিস অফিসার সেটা কুড়িয়ে পায়।

ধরা পড়ার পর ডগলাসের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হল। সে আর কখনও পালাতে পারেনি। তাকে ফ্রান্সের সীমানা থেকে জার্মানীর অভ্যন্তরে বন্দী-শিবিরে এনে রাখা হয়। সে নানাভাবে জার্মানীর পুলিসকে হয়রান করতে থাকে। তার দুষ্টুমির জন্যে মাঝে মাঝে তাকে বিপদেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু

তার দুর্দান্ত সাহস নিখাদ আত্মবিশ্বাসের ফলে সে প্রতিবারই রক্ষা পেয়ে গেছে। দীর্ঘ তিন বছর জার্মান বন্দী শিবিরে বাস করে যখন মিত্রবাহিনী জার্মানী অধিকার করে নিলে তখন ডগলাস মুক্তি পায়।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর দেখা গেল বহু দেশের বহু যুবক আহত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। কারো একটা পা কাটা পড়েছে, কারো হাত নেই। তাদের সকলের মনেই গভীর নৈরাশ্য। এরপর তারা কি করবে? কেউ কেউ আত্মহত্যা করে এই সব দুর্বিষহ পঙ্গুতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চিন্তা করছে। এদের মনোবল ফিরিয়ে আনবার জন্যে ডগলাসকে সরকার নিযুক্ত করলে।

ডগলাসও মনে প্রাণে কাজে লেগে গেল। সে দেশ-বিদেশে হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরে যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকা সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করে আলাপ করতে লাগল। নিজের পা খুলে দেখালে। বললে, এই কৃত্রিম পা নিয়েই সে বিমান বাহিনীর লেফটেনান্ট হয়ে বহু শত্রু-বিমান ভূপাতিত করেছে। অতএব হাসপাতালের বন্ধুরা তোমাদের হাত পা না থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না যদি মনটা তোমাদের ঠিক থাকে।

ডগলাসের উৎসাহে বহু পঙ্গু তাদের নৈরাশ্য কাটিয়ে উঠে কৃত্রিম অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের সাহায্যে আবার স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে শুরু করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল, মনটাকে বশ করতে পারলে আর কোন ভয় নেই।



আজব এক দুঃসাহসিক কাহিনী

বিশু মুখোপাধ্যায়

হায়দ্রাবাদ শহর থেকে মাত্র ছ'মাইলের পথ মাসাব কুন্তা। ছোট্ট ছবির মত একটি গ্রাম। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির সামনেই আছে ছোট্ট একটি বাগান। সবজি আর ফুলের গাছে গাছে সবুজের সমারোহ সর্বত্র। গাঁয়ের এক পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে শীর্ণা একটি নদী, আর তার অপর পাশে ঘন অরণ্য। ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়াগুলি বনের ভেতর থেকে এখানে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯৫২ সালের ঘটনা। সারা মাসাব কুন্তা জুড়ে যেন এক গভীর বিষাদের ছায়া নেমে এল। কয়েকদিন ধরে সেই গাঁয়ের লোকের বাড়ি থেকে ক্রমাগত গরু বাছুর, কুকুর বেড়াল, ছাগল ভেড়া বেমালুম লোপাট হয়ে চলেছে, অথচ আশ্চর্যের বিষয় কোনই হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না আক্রমণকারীর। লোকের মনে আতঙ্কের শেষ নেই। সন্ধ্যা নামার আগেই সবাই ঘরদোর বন্ধ করে দিচ্ছে ঝুপঝাপ করে। গ্রাম থেকে উত্তেজনার হাওয়া হায়দ্রাবাদ শহর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

শুধু গরু বাছুর ছাগল ভেড়াই নয়, কুঁড়েঘর থেকে শিশুও উধাও হতে লাগল। পরদিন সকালে খবর পেয়েই দলবেঁধে লোক জড়ো হয় সেই কুঁড়েঘরের সামনে। ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। তারা শুনতে পায় অদ্ভুত ঘটনা। স্থানীয় লোকেরা বলে, শিশুর বাবা মায়ের চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখে, শিশুটি রক্তাক্ত দেহে গড়াচ্ছে রাস্তায়, আর কি একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে ঢুকে যাচ্ছে পাশেই ঝোপের মধ্যে। কেউ কেউ বলে, কয়েকদিন আগেই তারা

একটা ভয়াবহ জন্তুকে দেখেছে নদীর ধারে। তার দেহটা যদিও বাঘের মতো, কিন্তু মুখটা বিকটাকার এক মানুষের।

গ্রামের কোল ঘেঁষেই পাহাড়। সেই পাহাড়ের পাদদেশে যে বনভূমি সেখানে নানাধরণের হিংস্রজন্তুদের বাস। গভীর রাত্রে বিচিত্র ডাক ভেসে আসে মাসাবকুন্তায় ঐ বন থেকে। স্থানীয় লোকেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে ঐ ডাকের সঙ্গে। সেই সব জন্তুদের আক্রমণই এই গাঁয়ের লোকদের একমাত্র চিন্তার কারণ। কখন কোন অবস্থায় যে তারা গ্রামের গবাদি পশু বা মানুষের উপর আক্রমণ করে বসে তার ঠিক থাকে না। তাই সব সময়েই গ্রামবাসীদের সশস্ত্র হয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়।

এই ব্যাপারটি হায়দ্রাবাদ শহরের প্রধান পুলিস অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি একদিন সেখানে ঘুরে গিয়ে মাসাবকুন্তার পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্টকে লোকজন সহ সারা বনাঞ্চল পাহারা দেবার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তাঁর নির্দেশ মতো কাজও হতে থাকে, কিন্তু তাতে যেন জানোয়ারের দল আরো ক্ষেপে ওঠে। এবার চোটটা এসে পড়ে পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্টের নিজের উপর।

সেদিন রাত্রে পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্ট তাঁর বাংলোর সামনেটায় কাঁটাতারের বেড়ার একটা মজবুত খুটিতে নিজের পোষা এলসেসিয়ান কুকুরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে ক্লাবে যান। বাংলো দেখাশোনার ভার থাকে এক সিপাহীর উপর। মাত্র ঘন্টা দুই পরে ক্লাব থেকে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে তাঁর কুকুর নেই। কোথায় গেল কুকুরটা? ছুটে এল সিপাহী। ছুটে এল তাঁর মেয়ে। এসে দেখল, যে খুঁটিতে সেটা বাঁধা ছিল, সেখানে রয়েছে কেবলমাত্র লোহার ছিন্ন গলাবন্ধটা, আর জায়গাটা রক্তে লাল হয়ে গেছে। কোথাও কুকুরের দেহের চিহ্নমাত্রও নেই। চমকে উঠলেন পুলিস সুপার। কুকুরটা তো সাধারণ কুকুর ছিল না। যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত যথেষ্ট সাহস ও শক্তি ছিল তার।

পুলিশ সুপার হায়াৎ খানের সমস্ত গায়ের লোম যেন খাড়া হয়ে উঠল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করেই হোক তাঁর প্রিয় কুকুর 'জান'-এর হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবেনই। ঘুরে ঘুরে দেখতে পেলেন তিনি কয়েকটি থাবার চিহ্ন।

তিনি পরদিন ভোর বেলাতেই বেরিয়ে পড়লেন নদীর দিকে। সেখানে গিয়েও কয়েকটি থাবার ছাপ দেখতে পেলেন। সেগুলো কিন্তু অপেক্ষাকৃত

বড় ধরণের। আরও চলতে চলতে ক্রমশ বনের একেবারে পাশে এসে পড়লেন হায়াৎ খান। সেখানেও তাঁর নজরে পড়ল সেই ছাপ। তারপর নিকটস্থ একটা পাহাড়ের কাছ বরাবর যেতেই হঠাৎ সেগুলো যেন মিলিয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে থেকে। কিন্তু এত যে থাবার ছাপ তিনি দেখলেন, এর কোনটাই বাঘের পায়ের ছাপ বলে তাঁর মনে হল না। সেদিন চারদিক ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

পুলিস হেডকোয়ার্টারের কর্মচারীরা তাঁকে 'জান'-এর মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট সান্ত্বনা দিতে এসেছিলেন বটে, কিন্তু হায়াৎ খানের এই সব মিষ্টি মধুর কথা কিছুই ভাল লাগছিল না। তিনি মনে মনে এই কথাই শুধু ভাবছিলেন যে এমন একজনও কি কেউ নেই, যে তাঁকে এই হত্যা রহস্যের একটুখানি আভাসও দিতে পারে।

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে ফেরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এক পরিচিত বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রীর। সে হায়াৎ খানকে অভিবাদন করে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই বললে, হুজুর ভাবছেন কেন—দেখুন না আমি আপনার জান-এর হত্যাকারীকে বার করে দেব।' সে কথা শুনে যদিও তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন হায়াৎ খান, কিন্তু বুড়ো মিস্ত্রী তাতে মোটেই দমল না। সে চলে যেতে-যেতেও আবার বললে, 'বিশ্বাস না করেন, আপনিই পরে দেখবেন হুজুর।'

পরের দিন রাত্রে আবার একটি দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। একজনের আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া উধাও হয়েছে। সেখানে কেবল রক্ত ছাড়া আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায়নি ঘোড়াটির। হায়াৎ খান নিজে এই ঘটনার অনুসন্ধান করলেন বটে, কিন্তু কোন হদিসই বার করতে পারলেন না।

এর কয়েকদিন পরে আর একটি কুকুর আক্রান্ত হওয়ায় খবর এল পাহাড় অঞ্চলের এক বাড়ি থেকে। শুধু আক্রান্ত নয়, আক্রান্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্যও কুকুরটি। তবে সে-বাড়ির মালীর কাছ থেকে অবশ্য কিছুটা নতুন তথ্য সংগ্রহ করলেন খান সাহেব। মালী তার জবাবদিহিতে যা' বলেছিল, তা হচ্ছে ঃ সে একটা ছায়ার মত বিরাট জন্তুকে এগিয়ে আসতে দেখে, তবে জন্তুটা যে কি তা সে চিনতে না পারলেও, সেটা যে বীভৎস ধরনের এবং তার গায়ের রং যে কালো ও ধূসরবর্ণের লোমে ভরা তাতে তার সন্দেহ ছিল না। আর তার সঙ্গে ছিল একটা সাদা রংয়ের শেয়াল। শেয়ালটা কেবল জন্তুটার আগে আগে নিঃসাড়ে যাতায়াত করছিল। বড় জন্তুটা কুকুরটার পেছন দিক থেকে

অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খপ্ করে একেবারে তার টুঁটিটা কামড়ে ধরে। তারপর এক ঝাঁকুনিতে ছিঁড়ে ফেলে লোহার শিকলটা এবং মৃত কুকুরের দেহটাকে তৎক্ষণাৎ দাঁতে করে বয়ে নিয়ে চলে যায় বনের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে, এক নিমেষেই সব শেষ হয়ে যায়। এইটুকু বলতে বলতেই উত্তেজনায় মালী হাঁপিয়ে উঠছিল বার বার। জোরে জোরে নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছিল তার নাক দিয়ে। দেহটা কাঁপছিল আতঙ্কে। দরদর করে ঘামছিল সে।

মালীর এই উক্তির পর আরও যে কয়েকটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে একটি সাদা শেয়ালের কথা প্রায় সবার মুখেই শোনা যায় একবাক্যে। একজন পাহারাদার বলে যে, সে রাত্রে তার মনিবের বাগান পাহারা দেবার সময়, আস্তাবলের দিকে একটা সাদা শেয়ালকে কয়েকদিন থেকে তাড়া করেছে বটে, কিন্তু মারতে পারেনি। অত্যন্ত দ্রুত পালিয়েছে জন্তুটা এবং চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে।

রহস্য ক্রমশই যেন আরও ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগল। গাঁয়ের চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে সরকারের কাছে প্রত্যেকেই আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য অধিকার চাইল। হায়াৎ খানের দরজায় এসে ধন্না দিতে লাগল চাষীর দল। জমির মালিকরা বললে, হিংস্র জন্তুর এই উৎপাতে চাষের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে, এ থেকে যেমন করে হোক পরিত্রাণের উপায় চাই। হায়াৎ খান নানা ভাবে তাদের সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, হায়দ্রাবাদের চীফ পুলিস অফিসারের কাছে আবার তিনি খবর পাঠিয়েছেন এর যথাযথ বিহিত করবার জন্য।

সেই দিনই একজন স্থানীয় লোক এল হায়াৎ খানের কাছে। এসে বর্ণনা দিল এক ভয়াবহ কাহিনীর। সে বলল ভোরবেলা সে তার জমিতে যাবার পথে দেখেছে, আবছা আলো আঁধারের মধ্যে একটা সাদা শেয়াল চলেছে রাস্তা দিয়ে। সেটা যে শেয়ালই ছিল সে সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। অনতিদূরে তার জমির মধ্যে, তার যে ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছিল, শেয়ালটা দ্রুত তারই দিকে এগিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ তার চোখ পড়ল বিরাটাকার কুৎসিত চেহারার একটা জন্তু ঘোড়াটাকে আক্রমণ করল। সঙ্গে সঙ্গে কি যে ঘটে গেল কিছুই বুঝতে পারল না সে। কোন আওয়াজও কানে এল না তার। তারপর চোখের পলকে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। সরে পড়ল তারা সবাই, শুধু ঘোড়াটা পড়ে রইল যেন মাটিতে। সে ছুটে গেল ঘোড়াটার কাছে। কিন্তু গিয়ে দেখে, তখন সব শেষ। ঘোড়ার আধ খাওয়া দেহটা শুধু একটু একটু নড়ছে জায়গায় জায়গায়।

জমা জমা রক্ত মাটির সঙ্গে মিশে একটা বিশ্রী গন্ধ বেরিয়েছে। সেই দৃশ্য দেখে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে তার। সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।

এই ঘটনাটি শোনার পর হায়াৎ খান আবার কোমর বাঁধলেন নতুন করে। ঘটনাস্থলে তক্ষুণি গিয়ে মৃত ঘোড়ার দেহটা ঢেকে ফেললেন পাতা আর ডালপালা দিয়ে। শকুনরা এক্ষুনি নেমে এসে পাছে কোন ক্ষতি করে জন্তুটার, সেই জন্যেই তিনি এই ব্যবস্থা করলেন। তারপর ঠিক তার পাশেই একটা গাছে তৈরি করলেন একটা মাচান। ঘোড়ার বাকী দেহটুকুর লোভে যদি সেই জানোয়ারটা আবার ঐখানে আসে রাত্রের দিকে, সে জন্য হায়াৎ খান নিজে বন্দুক উঁচিয়ে বসে রইলেন সারা রাত সেই মাচানে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে রাত্রে কারুরই দেখা মিলল না। তবে ভোরের দিকে স্থানীয় চাষীদের কাছ থেকে খান সাহেব শুনলেন যে, একটা সাদা রঙের শিয়াল চকিতে কয়েকবার বনের বাইরে এসে আবার বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বন্দুক ছোঁড়ার জন্য তারা তৈরি ছিল বটে, কিন্তু সেই সুযোগ তাদের ঘটেনি।

সেই যে বুড়ো মিস্ত্রীর কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছিলুম, সেই ছুতোর মিস্ত্রী ভূম সিং আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না। কাঠের আর লোহার রড্ দিয়ে সে তৈরি করে ফেললে এক বৃহৎ খাঁচা। ঠিক করলে, জন্তুটাকে যেমন করেই হোক হত্যা করবে সে। কিন্তু সে ব্যাপারে খান সাহেব চ'টে আগুন হয়ে গেলেন। এ কী ছেলেখেলা? চোখ রাঙিয়ে তিনি ভূম সিংকে বললেন, তুমি কি পাগল হলে নাকি ভূম সিং? একটা বাঘকে তুমি আটক করবে ঐ নড়বড়ে খাঁচায়?

এই ব্যঙ্গ কিন্তু ভূম সিংকে দমাতে পারল না। প্রথম দিকে জঙ্গলে ঐ খাঁচার মধ্যে সে নিজে বন্দুক নিয়ে বসে জন্তুটাকে মারবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তাতে অন্য বিপত্তি দেখা দিল। সেই অজ্ঞাত হিংস্র জন্তুটা ক্ষেপে গিয়ে বিকট চিৎকারে ভরিয়ে তুলল সারা চত্বর। মাসাবকুন্তার লোকেরা আতঙ্কে আরও যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পুলিস সুপার আদেশ দিলেন ভূম সিংকে খাঁচাটা সরিয়ে ফেলার জন্যে। কিন্তু ভূমসিং কাকুতি মিনতি করে আরো দুটো দিন সময় চেয়ে নিলে। সে বললে, হুজুর এই দু'দিন আমি অন্য ভাবে চেষ্টা করে দেখব, এবং আমার বিশ্বাস এবার আমি ওকে নিশ্চিত ঘায়েল করতে পারব। আপনি আমাকে পাগল ভাবতে পারেন, কিন্তু এখানকার বন্য জন্তুদের আমি নিজের ছেলের চেয়েও ভাল করে চিনি। আমার বিশ্বাস এই অদৃশ্য আক্রমণকারীটি একটি স্ত্রী-হায়েনা।

আপনি দয়া করে আমাকে আর দুটো দিন সময় দিন, তাতে যদি আমি সফল না হই-আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দেবেন।

খান সাহেব নরম হলেন বুড়ো ভূম সিং-এর কথায়। আর দু দিনের সময় দিলেন তাকে। পরের দিন সারা চত্বরটা তন্ন তন্ন করে ঘুরে এল ভূম সিং। যাদের যাদের বাড়িতে অঘটন ঘটেছিল, তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা করে ঘটনার বিবরণ ভাল করে শুনে নিল সে। তারপর সন্ধ্যার দিকে ভূম সিং খাঁচাটাকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করলে। গেটটাকে ঠিক মত তুলে তার সঙ্গে দড়ি বেঁধে দড়িটাকে পাশের গাছে তুলে দিলে। সেই গাছেরই ডালে ভূম সিং নিজে আজ রাত্রে জাগবে। খাঁচার সামনে ঝুলিয়ে রাখলে একটা জ্যান্ত বড় মুরগী, আর খাঁচার ভেতর ফেলে রাখলে একটা মরা কুকুর। মুরগীটা ঝটপট করতে লাগল খাঁচার দরজায়। ভূম সিং খাওয়া দাওয়া সেরে গাছের উপর গিয়ে উঠে বসে রইল। এক হাতে তার খাঁচার দরজার দড়ি আর অপর হাতে লম্বা টর্চ।

সে রাত্রে জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ ভরা ছিল। ঠায় খাঁচার দিকে চেয়ে দড়ি হাতে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেতে লাগল ভূম সিং-এর। গাছের উপর বসে বসে যখন সে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, চাঁদ যখন প্রায় ডুবু ডুবু, তখন হঠাৎ কিসের যেন খসখস আওয়াজে চমকে উঠল ভূম সিং। হ্যাঁ, ঠিকই তো! ঝোপ-ঝাড় ঠেলে বৃহদাকার কি যেন একটা এগিয়ে আসছে খাঁচাটার দিকে। সাদা শেয়ালটাকে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। সেটা এগিয়ে এসেই লাফিয়ে ধরল মুরগীটাকে।

ঝটপট শব্দ। তারপর দুটো মিলেই ঢুকে পড়ল খাঁচাটার মধ্যে। খড়খড় করে একটা আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভূম সিং হাতের দড়িটাকে দিলে আলগা করে। ঝপাস্ করে খাঁচার দরজাটা পড়ে গিয়ে বেরুবার পথ বন্ধ করে দিলে। আর তারপরেই লাফালাফি দাপাদাপি আরম্ভ হল খাঁচার মধ্যে। বিকট চিৎকার। ভূম সিং সাহসে ভর করে লাফিয়ে নেমে পড়ল গাছ থেকে। ভোর হয়ে এসেছিল তখন। চিৎকার করে কাছের গ্রামে গিয়ে হাঁক ডাক করতে লাগল ভূম সিং। সাহসী লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার পাশে। বন্দুক, বল্লম, টাঙ্গি নিয়েও এলো কেউ কেউ। চার পাঁচটা মশাল জ্বালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে সবাই ঢুকে গিয়ে দেখে, এক বীভৎস চেহারার হায়েনা আর তার সঙ্গে একটা সাদা শেয়াল কোঁদাকুঁদি করছে খাঁচাটা ভেঙে বেরুবার জন্য।

ক্রমশ ফরসা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল মাসাবকুন্তার চারদিকে। পুলিস ও সরকারী লোকজন নিয়ে হায়াৎ খান নিজে এসে উপস্থিত হলেন সরেজমিনে। ভূমি সিংকে দেখেই আনন্দে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

খাঁচাটাকে নানারকম কায়দা করে বনজঙ্গল থেকে বাইরে আনতে পুলিসের লোককে হিমসিম খেয়ে যেতে হল। কিন্তু সেই সময় অত লোকের মাঝখান থেকেও সাদা শেয়ালটা এক ফাঁকে খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে মারলে চোঁচা দৌড়। সবাই 'গেল গেল' চিৎকার করে উঠলেও তাকে আর ধরা গেল না। চালাক বটে শেয়ালটা।

পুলিশের হেডকোয়ার্টারে এনে ভূমসিং-এর খাঁচা থেকে অপর একটা মজবুত ধরনের লোহার খাঁচায় পোরা হল হায়েনাটিকে। কিন্তু সেই সময়ে সবাই লক্ষ্য করল যে জানোয়ারটা একেবারে অন্ধ। কোন চোখেই দেখতে পায় না ঐ বিশালকায় জন্তুটা। ঐ সাদা শেয়ালটার সাহায্যে সে সমস্ত শিকার করত। এবং ঐ শেয়ালটাই নিঃশব্দে সব জায়গায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত হায়নাটাকে। তারপর তাকে দিয়ে জীবজন্তু হত্যা করিয়ে প্রসাদ পেত শেয়ালটা।

শেষ পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের জু-গার্ডেনে পাঠিয়ে দেওয়া হল হায়েনাটাকে। ভারতবর্ষে নাকি এ ধরনের এতবড় হায়েনা এর আগে আর দেখা যায় নি! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সেখানে গিয়ে একদিনের জন্যে এতটুকু জলগ্রহণ পর্যন্ত না করে, ধরা পড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যায়।



বল যার সাহস তার

সনৎকুমার ঘোষ

অলিম্পাস!

গ্রীস দেশের এক বিরাট ঐশ্বর্য এই অলিম্পাস পর্বত—আমাদের দেশের হিমালয়ের মতো।

কত দেবদেবীর কল্পনা এই অলিম্পাসের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। সে দেশের অধিবাসীরা মনে করে, অলিম্পাসের শাখা-প্রশাখায় তাদের দেব-দেবীরা বসবাস করেন।

তাই গ্রীকদের কাছে অলিম্পাস খুবই পবিত্র—তীর্থভূমির মতো তার সম্মান।

অলিম্পাসের নিকটবর্তী যে সব রাজ্য, তাদেরও সম্মান কম নয়। ক্ষুদ্র এক রাজ্য, এলিস তার নাম,—অলিম্পাসের প্রতিবেশী বলে গ্রীকদের কাছে তারও বিপুল সম্মান।

এলিস-এর যিনি রাজা, নাম তাঁর অজিয়াস। সিংহাসনে যেদিন তিনি প্রথম আরোহণ করেন, প্রজারা সেদিন তাঁকে কত সম্মানই না করেছিল! অলিম্পাস পর্বতের অধিবাসী দেবতার মতোই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল, ভালবেসেছিল। আর কত আশাই না তারা করেছিল রাজা অজিয়াসকে নিয়ে!

তারপর যত দিন যায়, ততই যেন তাদের সে ধারণা কর্পূরের মতো ধীরে ধীরে উবে যেতে শুরু করে। কারণ, দেখা গেল, রাজা অজিয়াস প্রথমে কিছুকাল তাঁর প্রজাদের ভালমন্দের প্রতি খুব মনোযোগী হলেও বেশীদিন তাঁর সে মনোভাব বজায় থাকেনি। ক্রমে ক্রমে তাঁর সমস্ত মনোযোগ চলে গেল অন্যদিকে।

তিনি মানুষকে ভালবাসতে ভুলে গেলেন, ভুলে গেলেন তাদের শ্রদ্ধা

করতে। তার বদলে দুনিয়ার যত বড় বড় ষাঁড়, তাদের জন্যই হলো তাঁর সবচেয়ে বেশী দরদ।

একশ, দু'শ, পাঁচশ করে, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তিন হাজার ষাঁড় কিনে ফেললেন।

তাদের জন্য সারি সারি আস্তাবল তৈরী হলো, হাজার হাজার লোক তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হলো, আর গ্রামকে গ্রাম লোকবসতি উচ্ছেদ করে তিন হাজার ষাঁড়ের জন্য চারণভূমি তৈরি করা হলো সেখানে।

মোট কথা, রাজার খেয়ালে সেখানে এক বিরাট কান্ডের সূত্রপাত হলো।

তিন হাজার ষাঁড়কে খাওয়ানোর খরচ, তাদের তদারকের খরচ, সবকিছু মিলিয়ে যে খরচ শুরু হলো, তার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গেল। প্রজাদের সুখ-সুবিধা ও ভরণপোষণের খরচ, অথবা রাজ্যের কোন উন্নতি সাধন করা রাজা অজিয়াস-এর পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠলো।

ক্রমশঃ প্রজাদের জন্য রাজার দরদও আর রইলো না।

এমনি ভাবে দিন কেটে যায়। এক দুই করে ধীরে ধীরে কেটে গেল ত্রিশটি বছর। রাজার সমগ্র মনোযোগ তখনও একমাত্র ষাঁড়গুলির দিকেই নিবদ্ধ।

কিন্তু তাদের শুধু খাওয়া-দাওয়ার দিকেই তাঁর মনোযোগ ; অন্যদিকে কোন দৃষ্টিই রইলো না। গরু-ঘোড়া প্রতিপালন করতে হলে তাদের আস্তাবলও যে পরিষ্কার করা দরকার, রাজা অজিয়াস বুঝি তা ভুলেই গেলেন একেবারে! তার ফলে তিন হাজার ষাঁড়ের ত্রিশ ত্রিশটি বছরের মলমূত্র একই ভাবে পড়ে রইলো ; এক দিনের জন্যও কেউ তা পরিষ্কারের চেষ্টা করলো না।

ষাঁড়ের মলমূত্র জমে জমে পর্বতপ্রমাণ ক্লেদাক্ত নরকের সৃষ্টি হলো। আর তার দুর্গন্ধে শুধু এলিস রাজ্যই নয়, সারা অলিম্পাস-এর আবহাওয়া দূষিত হয়ে গেল।

লোকজন বিরক্ত হয়ে উঠলো রাজা ও তাঁর অপূর্ব খেয়ালের ওপর। নাকে রুমাল চেপে আর কাঁহাতক কতদিন চলা যায়?

প্রজাদের আবেদন-নিবেদনে রাজ-দপ্তর ভারী হয়ে ওঠে ; কিন্তু তবু তার প্রতিকার হলো না বিন্দুমাত্র। কারণ, ত্রিশ বছরের মলমূত্র ও আবর্জনায় তখন যে নরকের সৃষ্টি হয়েছে, সকলেই বুঝতে পারলো, এ নরকের জঞ্জাল দূর করা বুঝি দেবতারও অসাধ্য!

কাজেই যেকোন দুঃসাধ্য বা অসাধ্য কাজের কথা উঠলেই রাজা "অজিয়াস-এর আস্তাবল পরিষ্কারের" (Clearing Augean stable) সঙ্গে তার তুলনা করা হতো।

রাজা অজিয়াস-এর এই যুগ-যুগান্তব্যাপী আবর্জনার স্তূপ হয়তো পৃথিবীর মৃত্যু অবধি ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে থাকতো! কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল, যার ফলে এই ক্লেদ-ভার মুক্তির একটা উপায় হল।

সেই সময় সমস্ত অসাধ্যসাধনের নেতা বলে সারা পৃথিবীতে একজন খুব পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি দেবরাজ জুপিটারের এক পুত্র শক্তিমান হারকিউলিস!

দেবরাজ জুপিটারের রানী জুনো। জুনো ছিলেন হারকিউলিসের সৎমা। তিনি তাঁর সতীনের ছেলে হারকিউলিসকে একেবারেই দেখতে পারতেন না। কাজেই হারকিউলিস যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন থেকেই জুনো তাঁর ধ্বংসের চেষ্টা করে আসছিলেন।

জুনোর চক্রান্তেই ব্যবস্থা হয়েছিল যে, হারকিউলিস কিছুকাল গোলামি করবেন থিব্‌স্ রাজ্যের রাজা ইউরিসথিউসের কাছে।

রাজা ইউরিসথিউস ছিলেন হারকিউলিসের আপন ভাই ; কিন্তু জুনো দেবীর কৌশলে তিনি হারকিউলিসকে বঞ্চিত করে রাজা হয়েছিলেন। পাছে হারকিউলিস একদিন তাঁর প্রাপ্য সিংহাসন ইউরিসথিউসের কাছ থেকে কেড়ে নেন, এই আশঙ্কায় তিনি সর্বদাই খুব সশঙ্কিত ছিলেন।

কাজেই তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল—হারকিউলিসের ধ্বংস সাধন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি হারকিউলিসকে একটার পর একটা কেবলই অসাধ্য কাজের আদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ; কিন্তু কী আশ্চর্য, হারকিউলিস তাঁর অসাধারণ সাহস ও শক্তির দৌলতে, যত কঠিন কাজই হোক না কেন, সমস্তই সুন্দরভাবে সমাধা করে দিয়েছিলেন।

দেবী জুনোর পরামর্শে রাজা ইউরিসথিউস আবার একবার সক্রিয় হয়ে উঠলেন। রাজা ইউরিসথিউস ডেকে পাঠালেন হারকিউলিসকে।

শক্তিশালী বীর হারকিউলিস বলিষ্ঠ পদক্ষেপে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজসভা যেন থমথম করে উটলো?

হারকিউলিস একটিও কথা কইলেন না আদেশের প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দাম্ভিক রাজা ইউরিসথিউস,—তিনিই কথা কইলেন সকলের আগে। তিনি বললেন, "রাজা অজিয়াস-এর আস্তাবলের কথা তুমি শুনেছ নিশ্চয। আজ ত্রিশ বছর ধরে তিন হাজার ষাঁড়ের মলমূত্র ও যত কিছু আবর্জনা সেখানে এক নরকের সৃষ্টি করে রেখেছে। তার দুর্গন্ধে সারা গ্রীসের আবহাওয়া দূষিত হয়ে উঠেছে।

তুমি বীর, তুমি শক্তিশালী। তাই তোমাকে আদেশ করছি, তুমি এখনই সেখানে চলে যাও। তারপর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেই আস্তাবল পরিষ্কার করে তোমার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দাও। তা যদি না কর, তাহলে মনে করবো, তুমি ইচ্ছা করেই কাজে গাফিলতি করেছ। আর সেজন্য তোমাকে চরম শাস্তি ভোগ করতে হবে।"

হারকিউলিসের বুঝতে বাকী রইলো না যে কী তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্য! আর কে যে এর পেছনে আছেন, সেটুকু বুঝতেও তাঁর দেরি হলো না। তবু উপায় নেই। নিষ্ঠুর রাজার আদেশ, সে তাঁকে মানতেই হবে।

রাজা অজিয়াসের আস্তাবলের উদ্দেশ্যে তিনি এলিস রাজ্যে চলে গেলেন।

অগণিত সারি সারি আস্তাবল! সে দৃশ্যে হারকিউলিস বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। আস্তাবলের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের স্তূপ পাহাড়-সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। আর তার পাদদেশে অতি দুর্গন্ধ ক্লেদ ও মলমূত্রের ধারা সশব্দে বয়ে চলে। সেই তরল ধারায় কোটি কোটি কৃমিকীট পরম সুখে সাঁতার কেটে ইতস্ততঃ চলাফেরা করে।

দুর্গন্ধে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসতে চায়! দূষিত আবহাওয়ায় বুঝি কোন পশু-পক্ষীও সেখানে ভিড় জমাতে সাহস করে না!

হারকিউলিস নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন ; তারপর মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন, মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই নরক তাঁকে পরিষ্কার করতে হলে কী তাঁকে করতে হবে!

হারকিউলিস কিছুক্ষণ এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ালেন। বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো আস্তাবলের কিছুটা দূর দিয়ে একটা নদী বয়ে চলেছে। তারও অদূরে আরও একটা নদী।

নদী দুটিই শীর্ণ ও সংকীর্ণ। কিন্তু সেই শীর্ণ নদীর বুকেও যে স্রোত, সে স্রোতে বুনো হাতিও বুঝি ভেসে চলে যায়!

নদী দুটি ও তাদের প্রচন্ড খরস্রোত লক্ষ্য করে হারকিউলিসের মাথায় একটি চমৎকার মতলব এসে গেল! তিনি বাজার থেকে প্রকান্ড একখানি কোদাল কিনে নিয়ে এলেন। তারপর সেই কোদাল নিয়ে শুরু হলো তাঁর কাজ।

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি শুধু কোদাল চালিয়ে যান, আর একটি নদী ক্রমশঃ অপর নদীর নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে দুটি নদীর স্রোতোধারা মিলে মিশে এক হয়ে গেল!

হারকিউলিস দুটি বিভিন্নমুখী নদীকে এক জলধারায়, একমুখী নদীতে পরিণত করে দিলেন। শক্তিমানের প্রথম উদ্যম সার্থক হয়ে উঠলো।

দুটি নদীর তখন যেন একটি মাত্র মুখ, একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র গতি হয়ে গেল! সাধ্য কি যে, কেউ আর তখন বুঝতে পারে যে, মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বেও এ নদী এমন ছিল না—এর তখন গতি ছিল দুটি বিভিন্ন পথে!

নিজের সাফল্যে হারকিউলিসের মুখে আনন্দের হাসি ফোটে। শক্তিমানের পক্ষে এই তো পরম সম্পদ্! সে তো সব সময় পুরস্কার আশা করে না! সে চায় আনন্দ—শুধু বিজয়ের আনন্দ, সাফল্যের আনন্দ!

হারকিউলিসও তাঁর প্রথম সাফল্যের আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। দুটি সংকীর্ণ নদীর জলধারা তখন একটি নদীতে পরিণত হয়ে, একই খাতে বইতে শুরু করেছে! স্রোতের বেগ অধিকতর তীব্র ও অধিকতর প্রচন্ড হয়ে, ভয়ংকর শব্দে—বুঝি পাহাড়-পর্বত ভেঙে গুঁড়িয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়!

হারকিউলিস কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, না না, এখনও অনেক কাজ বাকী ;—রাজা অজিয়াসের আস্তাবল এখনও যে মূর্তিমান্ নরকের মতো, ঐ যে অদূরে তাঁর সম্মুখেই বিদ্যমান! এ নরক, এ আবর্জনা যে তাঁকেই দূর করতে হবে! সারা গ্রীসের দুঃখ-দুর্দশা বেদনা মোচনের দায়িত্ব যে তিনি তাঁর আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন! সে তাঁকে পালন করতেই হবে!

নিজের গুরু দায়িত্ব-ভারে আত্মচেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। ক্ষণিকের কর্মবিরতি পরিত্যাগ করে, কোদাল কাঁধে আবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর শুরু হলো তাঁর অবশিষ্ট কাজটুকু। কঠিন মাটির বুকে হারকিউলিসের যন্ত্র অনবরত আঘাত করে চলে, আর চাপ চাপ মাটি তাতে স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

দেখা গেল, সমগ্র নদীর গতিমুখ এবার যেন ক্রমশঃ সেই আস্তাবলের দিকেই এগিয়ে আসছে! হারকিউলিসের পরম শত্রু, স্বর্গের দেবী জুনোও বুঝি সে দৃশ্য দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলেন!

কঠোর পরিশ্রমে হারকিউলিসের সারা দেহ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো ; কিন্তু তবু তাঁর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই—সারা নদীর জলধারা তিনি তখন আস্তাবলের কাছে এনে ফেলেছেন!

অবশেষে একসময় এসে গেল এক পরম মুহূর্ত, এলো এক শুভক্ষণ! যে নদী একদিন ছিল ভিন্নপথের পথিক, সেই বিভিন্নমুখী দুটি নদীকে তিনি একই খাতে প্রবাহিত করে, আস্তাবলের কাছে, অতি কাছে নিয়ে এলেন!

এরপর—আর শুধু সামান্য প্রচেষ্টা!

শক্তিমান্ হারকিউলিস কখনও বিফলতার কাছে মাথা নীচু করেন না, কোন পরাজয় তিনি মানতে রাজী নন। তাঁর বাকী কাজটুকুই বা অসম্পূর্ণ রইবে কেন?

দ্বিগুণ উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দ্বিগুণ বলে তাঁর কোদালী চালনায় তৎপর হয়ে ওঠেন।

তারপর মুহূর্তমধ্যে,—ব্যস্, এক অভাবনীয় কান্ড!

নদীর প্রচন্ড গতিবেগ, তার সমস্ত শক্তি নিয়ে চক্ষুর নিমেষে আস্তাবলের সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের ওপর হিংস্র দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তারপর কিছুক্ষণ শুধু একটানা হুড়হুড় দুদ্দাড় শব্দ আর ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস!—

সে ভয়াবহ বিস্ময়কর দৃশ্য ও প্রচন্ড শব্দ স্বয়ং হারকিউলিসও সহ্য করতে পারলেন না! ঘর্মাক্ত ক্লান্তদেহে তিনি সেই ভয়ংকরী নদীর তীরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন!

মূর্ছাভঙ্গে জ্ঞান যখন তাঁর ফিরে এলো, হারকিউলিস উঠে দাঁড়ালেন! কিন্তু আশ্চর্য, পৃথিবীর রূপই যেন তখন বদলে গেছে! অজ্ঞানের অন্ধকারে, আলস্যের অন্ধ তলদেশে যে তলিয়ে ছিল, সে পৃথিবীও যেন হেসে উঠেছে আলোঝলমল প্রাণ নিয়ে, অপূর্ব উদ্দীপনায়!

রাজা অজিয়াস-এর ঘৃণিত আস্তাবলের বাস্তব নরকপুঞ্জ কখন যে অদৃশ্য হয়ে গেছে কেউ তা জানে না! নদীর প্রচন্ড জলস্রোতে সমস্ত আবর্জনা ও ক্লেদরাশি মুহূর্তে ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেছে! শক্তিমানের বলবীর্য, সাহস ও শক্তি পৃথিবীর এক চরম অভিশাপকে দূর করে দিয়েছে!

আনন্দে উদ্বেল জনসঙ্ঘ শক্তিমান্ হারকিউলিসকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে প্রীতি-সম্ভাষণ করে!

শক্তিমান্ হারকিউলিসের এই সাফল্য বুঝি সেই হতে পৃথিবীর বুকে প্রাণরস জুগিয়ে আসছে! তার ফলে মাটির পৃথিবীর ক্ষীণজীবী মানুষের বুকে হিমাদ্রির মতো অটল শক্তির অধিকারী হওয়ার আকাঙ্খা জেগে ওঠে!

পৃথিবীর মানুষ আজ জানে যে, একমাত্র শক্তিসাধক ব্যক্তির পক্ষেই বিরূপ ভাগ্যদেবীর নির্দেশও অমান্য করা সম্ভবপর হতে পারে। দেবী জুনোর নির্দেশ ও তাঁর সমগ্র পরিকল্পনা শক্তিমান্ হারকিউলিসের দেহ-মনের সংস্পর্শে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল! শক্তিসাধকের পক্ষে এ এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা!

পাশ্চাত্ত্য জগতে কিছুকাল যাবৎ তাই শক্তিসাধনার আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশও একদিন এ বিষয়ে একেবারেই পিছিয়ে ছিল না। মনে হয়, গৌরবময় স্বদেশী যুগে, ও তার অব্যবহিত পূর্বেই বুঝি এর সাধনা শুরু হয়েছিল সবচেয়ে বেশী।

তাই অতি অল্পদিনের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন শক্তিসাধক শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্লবীর গামা, প্রফেসর রামমূর্তি, ভীম ভবানী প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত গোবরবাবু ও আরও অনেকে আজও তাঁদের ঐতিহ্য বহন করে আসছেন।

শুধু ঐতিহ্য বহন করাই নয়, বাঙলার তরুণদের যথার্থ শক্তির অধিকারী করার জন্য আজও তাঁদের চেষ্টার অন্ত নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙালী তরুণদের একটা বিরাট অংশকে আজ সে বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ও অমনোযোগী বলে মনে হয়। মল্লমঞ্চে শক্তিসাধনা ও শক্তিচর্চার অপেক্ষা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়াই যেন অনেকের কাম্য হয়ে পড়েছে!

যথার্থ শক্তিসাধনার অভাবে, দেহ-মনের দুর্বলতার জন্য বাঙালীর প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয়ে গেছে। কাজেই দেশের কোন সমস্যা-সমাধানে বা রাজা অজিয়াস-এর আস্তাবলের ন্যায় কোনরূপ জাতীয় আবর্জনা দূরীকরণে বাঙালীর কোন আমন্ত্রণ নেই ; সে বিষয়ে আজ তার কোন ক্ষমতাও নেই। বাঙালী আজ ক্রমশঃই যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। তাই আজ দেশ থেকে দেশান্তরে তারা বিতাড়িত ও তারা প্রতিকারহীন অসহায়।

শক্তিসাধক শ্যামাকান্ত একদিন তাঁর শক্তি-সাহসের দৌলতে হিংস্র ব্যাঘ্রকেও কাবু করেছিলেন। রামমূর্তি ও ভীমভবানী অযুত বলশালী বিশালকায় হস্তীকে পর্যন্ত তাঁদের বক্ষে ধারণ করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের তুলনা কই?

মোট কথা, বাঙালীর জীবনচাঞ্চল্য আজ কমই দেখা যায়। সে জিনিস দেখতে হলে পাশ্চাত্ত্য জগতে অনুসন্ধান করতে হবে। ডাম্বেল ও বারবেল নিয়ে সে দেশের আনাচে কানাচে আজ কত সাধনা শুরু হয়ে গেছে! তাই জো উইডারের মতো আনন্দোচ্ছল শক্তিসাধক সে দেশে একেবারেই বিরল নয়।

অনেকে মনে করেন, শক্তিসাধক মাত্রকেই না জানি কত কি হাতি-ঘোড়া খেতে হয় ; কিন্তু সে ধারণা একেবারেই ভুল।

জো উইডার বলেন, "যা কিছু খাবে, তাইই হজম করতে হবে ভাল করে, এই হচ্ছে মূল উপদেশ। সেজন্য আহারের সময় সব কিছু বেশ করে চিবিয়ে নিতে হয়। যে কোন জিনিস খুব ভাল করে চিবিয়ে নিলে, জিনিসটি শিলে পেষা কাইয়ের মতো হয়ে যায় (Enzymes)। এই কাই জিনিসটাই হলো স্বাস্থ্য-শক্তির মূলকেন্দ্র।"

জো উইডার প্রাণভরে এরই প্রশংসা করেছেন।

জেরী ম্যাক্‌কার্টি নামক অপর এক ব্যায়ামবীর বলেছেন, "দেহমনে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী হওয়ার একমাত্র প্রধান উপায় হলো শক্তিসাধকের ইচ্ছাশক্তি।"

তিনি বলেন, "দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলের দৌলতে যে কোন ব্যক্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দেহে মাংসপেশীর অপূর্ব তরঙ্গ সঞ্চারে সমর্থ হন।"

ম্যাক্‌কার্টির নিজের উদাহরণেই তা উত্তমরূপে প্রমাণিত হতে পারে।

সমবয়সী অপর এক কিশোরের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে, তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শক্তিসাধনা শুরু করেন। একান্ত ইচ্ছার ফলে, মাত্র এক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর দেহখানিকে সুগঠিত করে তুলেছেন, তাঁর মাংসপেশীর প্রতিটি হিল্লোল এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে!

শ্বেত জাতির ন্যায় পীত জাতিও আজ শক্তিচর্চায় মনোনিবেশ করেছে। ছেলেমেয়ে, ধাড়ী, তারা অধিকাংশই এখন শক্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সাধনার পূণ্যপীঠে কোন অসংযম বা অশোভন আচরণের স্থান নেই। যে কোন ধরনের শক্তিসাধনাকে পবিত্র মনে করতে হবে। নইলে, দেবমন্দির আসুরিক লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য জগতে—অনেক মুষ্টিযোদ্ধাই এই মূলনীতিকে অবহেলা করে চলেন। কত বড় বড় প্রতিযোগিতায় বিখ্যাত মুষ্টিকরাও অনাবশ্যক ও বেআইনী ভাবে প্রতিযোগীকে মারাত্মক আঘাত করতেও কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হননি। এক মল্লবীর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক মল্লবীরকে চেয়ারের আঘাতে ভূপাতিত করেছেন, এমন জঘন্য উদাহরণও দেখা গেছে।

শক্তিসাধনাকালে হারকিউলিস কখনও অসংযত বা অশোভন আচরণ করেছিলেন কি? তা করেননি বলে আজও তিনি অমর। শুধু তাই নয়, দুর্গত জাতির এক পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণার কারণকে দূর করে তিনি জাতীয় কল্যাণ সাধন করতে পেরেছিলেন।

আমাদের জাতীয় জীবনেও কি সেরকম কোন ব্যাথা-বেদনা ও ক্ষোভের কারণ নেই? অগণিত বৃষ প্রতিপালনের ব্যয় বহন করে জাতীয় সরকার কি নুয়ে পড়েননি? অজিয়াস-এর আস্তাবলের পুঞ্জীভূত মলমূত্র ও আবর্জনা আমাদের জাতীয় জীবনেও যে এক চিরন্তন নরকের সৃষ্টি করে রেখেছে!

দেশের তরুণদেরই আজ এগিয়ে আসা উচিত দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য। আর সেজন্য দরকার তাদের কঠোর শক্তিসাধনা ও সংযম।

তাই দেশের আনাচে কানাচে যেমন শক্তিসাধনার অগণিত পীঠস্থান গড়ে তোলা দরকার, তেমনি দরকার তাদের দেহ-মনে হারকিউলিসের রূপায়ণ।

বাঁচতে হলে তরুণদের আজ নব রূপায়ণ চাই।



গল্প হলেও সত্যি

ছন্দা মিত্র

অজানার প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরদিনের। তাই সুদূরের পথ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। যে পথের কোনো ঠিকানা নেই-কোনো সীমানা নেই-যে পথের বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর হাতছানি—

ওথিয়ারের মনে সেই পথের ডাক। জাতে তিনি নরম্যান, উত্তর দেশে তাঁর বাস। কিন্তু আরও উত্তরে কী আছে, কারা আছে তা জানবার আগ্রহ তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠল। অবশেষে অন্ধ আবেগে একদিন আকুল হয়ে ছুটলেন উত্তর দিকে। নিজের দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও উত্তরে...

পথে পথে বাধা—পায়ে পায়ে মৃত্যুর ইশারা। দুরন্ত শীতে গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যায়, তুষার ঝড়ে দিক ভুল হয়ে যায়, তার ওপর শ্বেত ভালুক হিংস্র থাবা মেলে ওৎ পেতে থাকে। তবু কোনো বাধা, কোনো বিপদকে গ্রাহ্য করলেন না ওথিয়ার। চললেন এগিয়ে। হোয়াইট সী, নর্থ কেপ ও ডুইনা রিভার ধীরে ধীরে তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তে লাগল। পথ যত এগোয় ততই উৎসাহ বাড়ে তাঁর মনে। চোখে ভাসে রঙীন স্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেল একদিন। ডুইনা নদীর মুখে যেতেই সে দেশের আদিবাসীরা ছুটে এল। আক্রমণ করতে এল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। ওথিয়ার কতরকম ভাবে ওদের শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোনো ভাষাই ওরা বোঝে না। ক্রমে ক্রমে ওরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। বেগতিক দেখে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন ওথিয়ার। বুঝলেন এ পথে

এভাবে আসা ভুল হয়েছে। কিন্তু কি করবেন, কেউ যে আসতে রাজী হয়নি। তাই তো মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন অচেনা দুর্গম পথে।

এটা হচ্ছে হাজার বছর আগেকার কথা। আলফ্রেড দি গ্রেট (৮৪৯-৮৯৯ খ্রীঃ) তখন ইংল্যান্ডের রাজা। ওথিয়ার ফিরে এসে তাঁর কাছে সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করলেন।

ধীরে ধীরে ওথিয়ারের অভিযানের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রশ্ন জাগল সাধারণ মানুষের মনে। ডুইনা নদীর মুখে আক্রমণকারী সেই হিংস্র অধিবাসী কারা? এস্কিমো, ইন্যুইট, না চীনাদের পূর্বপুরুষ!

মাস যায়, বছর যায়, পার হয়ে যায় কত যুগ-যুগান্ত। সেই অচিন পথে আর পড়ে না কোনো অভিযাত্রীর পদচিহ্ন।

এদিকে কালের গতি ঘুরতে থাকে। জেলেরা মাছ ধরতে যায়-অশান্ত যুবকের দল মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে দিশেহারা হয়ে। এস্কিমোদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কখনও বা পরিচয় জমে ওঠে তাদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে সংশয় কেটে যায়। তারা দেখে এস্কিমোরা তো হিংস্র নয়। ওথিয়ার যা বলেছিলেন, এরা তো তেমন নয়। ইন্যুইট বা চীনাদের পূর্বপুরুষও নয় এরা। শান্ত, সেবা-পরায়ণ, নিরীহ ও বুদ্ধিমান এই সব এস্কিমো নরনারী।

এবার উইলিয়াম ব্যারেন্টস নামে এক সাহসী ডাচ যুবক কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে উত্তর মেরুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন হল্যান্ড থেকে। শক্তসমর্থ শরীর, মনে দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, চোখে রঙীন স্বপ্ন। কিন্তু অর্থসঙ্গতি নেই ব্যারেন্টসের। তাই সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন রেশম, মখমল এবং নানা ধরনের কিছু দামী শৌখিন জিনিস। পথে পথে সেগুলো বিক্রি করে পাথেয় যোগাড় করবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যারেন্টসের। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল। সমুদ্রে জমতে লাগল বরফ। অনবরত শক্ত বরফের চাঙড়ের সঙ্গে জাহাজ ধাক্কা খেতে লাগল। তারপর মেরু সাগরের মাঝখানে এসে আটকে গেল জাহাজ। সাধ্য কি আর একটুও এগিয়ে যায়!

জাহাজ বন্দী হলো বরফের বেড়াজালে। যে শক্ত বরফের চাঁই তা সহজে গলবে বলেও মনে হয় না। প্রচণ্ড শীতের রাজত্ব চলছে চারদিকে। বসন্তের তখনও অনেক দেরি।

বরফে ধাক্কা লেগে জাহাজ ক্ষতবিক্ষত। একটানা জাহাজে বন্দী থাকতেও আর ভাল লাগে না। অগত্যা ব্যারেন্টস নেমে পড়লেন। ভাবলেন, বরফের ওপরেই গড়বেন অস্থায়ী আস্তানা। বরফে আটকে থাকা ভাসমান কাঠ কিছু যোগাড় হলো। তা ছাড়াও জাহাজ থেকে নিয়ে আসা হলো কিছু তক্তা। যন্ত্রপাতি সঙ্গেই ছিল। তক্তা ও কাঠ দিয়ে তৈরি হলো আস্তানা। তক্তার খাট তৈরি করে আঠারো জন লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

সেখানেই বাস করতে লাগল অভিযাত্রী দল। কিন্তু অবিশ্রান্ত তুষারপাতের ফলে তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটল। আস্তানাটি ঢেকে গেল বরফে। তার ওপর সাদা ভালুকের উৎপাত। ভালুকরা দলে দলে এসে কাঠের ছাদ খুলে ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করত। দিনের বেলা ভয় বিশেষ থাকে না। রাত্রি হলেই মুশকিল। কখন অতর্কিতে ঢুকে যে কি বিপদ ঘটাবে তার ঠিক নেই।

একদিন দল বেঁধে তারা সাদা ভালুকদের তাড়া করল। তাতে কয়েকজন ঘায়েলও হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল ভালুকরা।

এইভাবে কোনো রকমে কাটতে লাগল অভিযাত্রীদের দিন। ক্রমে খাদ্য ফুরিয়ে আসতে লাগল। আর সামান্য কিছুদিনেব মতো মাত্র আছে. তারপর কি হবে কে জানে?

তারা ঘুরে ঘুরে সেই অঞ্চলের নীল শেয়াল শিকার করতে লাগল। তার মাংস মোটামুটি খারাপ নয়। তাই খেয়ে তারা অন্য খাবার বাঁচাতে লাগল। তবে সব সময় ঐ নীল শেয়াল শিকার করাও সম্ভব হয় না। তখনই হয় মুশকিল।

দিন বুঝি আর কাটে না। সুনিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল অভিযাত্রীর দল।

তারপর একসময় শীত কমতে শুরু করল। বসন্ত আসছে! অভিযাত্রীরা চোখের সামনে যেন আবার আশার আলোক দেখতে পেল। মুক্তির আনন্দে ভরে গেল তাদের মন। কিন্তু ভাঙা জাহাজ নিয়ে কেমন করে দেবে তারা সমুদ্রে পাড়ি? অতখানি মেরামত করাও সম্ভব নয়।

অনেক ভাবনা চিন্তা করে অবশেষে তারা একখানি কাঠের নৌকা তৈরি করল। তৈরি করল কয়েকটি কাঠের বৈঠা। পালা করে সেই বৈঠা দিয়ে তারা নৌকা বাইবে।

নৌকাটি খুব বেশি বড় নয়। তাতে কোনোরকমে সবার স্থান সঙ্কুলান হয়ে যাবে। কিন্তু বেশি জিনিসপত্র নেওয়া চলবে না।

উইলিয়াম ব্যারেন্টস দেখলেন এখানে থেকে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। জিনিসপত্রের মায়া ত্যাগ করেই সঙ্গীদের নিয়ে তিনি নৌকা ভাসিয়ে দিলেন হিমশীতল সাগরের জলে।

সাগরের ঢেউয়ের দোলায় নৌকা দুলছে আর মরণদোলায় দুলছে সব যাত্রীরা। দুশ্চিন্তা ব্যারেন্টসের মনেই সবচেয়ে বেশি। কারণ তিনিই সবাইকে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে এসেছেন এই ভয়ঙ্কর পথে, যে পথ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর পথ। অথচ এখান থেকে ফিরবারও আর কোনো উপায় নেই। যতটা পথ তাঁরা ফেলে এসেছেন ততটা পিছিয়ে গিয়ে লোকসমাজে পৌঁছবার আগেই সবার মৃত্যু হবে।

বিভ্রান্ত ব্যারেন্টস। কি করবেন তিনি! তাঁর সঙ্গীরা পিছিয়ে যাওয়ার ভরসা পায় না—এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহও কারুর নেই। মনে তাদের চাপা আক্রোশ—তাদের এই চরম দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ব্যারেন্টসের অদূরদর্শিতা।

ব্যারেন্টস তা বুঝতে পারলেন। তবু উৎসাহ দিয়ে চললেন তাঁর সঙ্গীদের—'এগিয়ে চলো। মৃত্যু যখন হবেই তখন বিজয়ীর গৌরব অর্জনের চেষ্টা করাই ভাল। পিছিয়ে গিয়ে ভীরুর মতো মরতে আমরা চাই না।'

তাঁর কথায় আর কোনো উৎসাহ পায় না সঙ্গীরা। ক্রমশ যেন সবাই ঝিমিয়ে পড়তে থাকে।

ব্যারেন্টসের মনে ঝড় ওঠে। ঝড় ওঠে সমুদ্রের বুকেও। খোলা নৌকার ওপর সেই ঝড়ের ঝাপটায় জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে সবার।

অনাহার, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় কাতর ব্যারেন্টস সেই ধকল আর সহ্য করতে পারেন না। ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। জীবনের শেষ ক'দিন তিনি নিজে কোনো খাদ্য গ্রহণ করেননি। অনাহারে থেকে সঙ্গীদের জন্য খাদ্য বাঁচিয়েছেন।

দলপতির মৃত্যুতে অভিযাত্রীরা হতাশায় ভেঙে পড়ল। সমস্ত রাগ ও দুঃখ ঝেড়ে ফেলে তারা শেষ শ্রদ্ধা জানাল তাদের বন্ধুর প্রতি। নীরবে প্রার্থনা জানাল ভগবানের কাছে—'দুঃসাহসী নায়কের আত্মার সদ্গতি হোক।'

১৫৯৭ সালের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে ব্যারেন্টসের দেহটি তুলে নিয়ে তারা ভাসিয়ে দিল সাগরের জলে। জানাল শেষ বিদায়।

দলপতির মৃত্যু হয়েছে, এবার তাদের মৃত্যুর পালা। এই নির্জন মেরুসাগরের পথে মৃত্যু ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

এইভাবে কেটে গেল আরও একটি দিন। নৌকা বাইবার শক্তি আর কারুর নেই। হাল ছেড়ে দিয়ে বসে রইল সকলে। নৌকা যেদিকে যায় যাক।

কেটে যায় আরও একটি দিন।

মৃত্যু—এবার অনিবার্য মৃত্যু। ক্ষীণ দুর্বল শরীর নিয়ে বসে থাকাও আর সম্ভব নয়। শুয়ে পড়ে সবাই পাটাতনের ওপর।

সহসা দেখা গেল একটি জাহাজ এগিয়ে আসছে সেদিকে। অসীম সমুদ্রে এমনভাবে একটি ছোট নৌকায় কয়েকটি লোককে ভাসতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—তারা বিপন্ন। জাহাজটি কাছে এগিয়ে আসতেই মৃতপ্রায় অভিযাত্রীরা হাত তুলে তাদের উদ্ধার করার ইঙ্গিত জানাল। জাহাজের নাবিকরা ধরাধরি করে নৌকা থেকে তুলে নিলে মৃতপ্রায় লোকদের। পড়ে রইল অভিযাত্রীদের অতিকষ্টে গড়া নৌকা এবং তাদের অনেক কিছু স্মৃতি। কিন্তু সবচেয়ে অমূল্য এক সম্পদকে তারা রেখে গেল সাগরের জলে—সে সম্পদ ব্যারেন্টস। ব্যারেন্টসকে তারা জীবিত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারল না। সাগরের বুকে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ইতিহাসের পাতায় এক নীরব স্বাক্ষর রেখে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।

এই দুঃসাহসী অভিযাত্রী দলের স্মৃতি ধীরে ধীরে মুছে গেল মানুষের মন থেকে। কিন্তু দুশো চুয়াত্তর বছর পরে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে নরওয়ের এক ক্যাপ্টেন আবার আলোড়ন জাগিয়ে তুললেন। খুঁজে পেলেন তিনি উত্তর মেরুর নোভাজেমলা অঞ্চলে একটি কুঁড়েঘর, যেখানে রয়েছে ব্যারেন্টস ও তাঁর সহযাত্রীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পুঁথিপত্র। প্রায় অক্ষত অবস্থায়। দেয়ালে ব্যারেন্টসের ঘড়িটি তখনও টাঙানো রয়েছে। দেখে মনে হয় যেন কয়েকদিন আগে সেগুলো ভুল করে কেউ ফেলে গিয়েছে। আধপোড়া মোমবাতিটি দেখলে মনে হয় যেন একটু আগেও সেটি জ্বলছিল।

ক্যাপ্টেন সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে হল্যান্ড গভর্নমেন্টকে উপহার দিলেন। সেই জিনিসগুলি এখনও আমস্টারডাম্ মিউজিয়ামে যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে রক্ষিত আছে।

বহুকাল আগে ব্যারেন্টস যে নীরব স্বাক্ষর রেখে গিয়েছিলেন, ইতিহাসের পাতায় একদিন তা জ্বলন্ত হয়ে উঠল। পৃথিবীর মানচিত্র খুললে দেখা যাবে নোভাজেমলার উত্তর-পূর্ব তীরে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র দেশ, নাম তার ব্যারেন্টস ল্যান্ড। দেশটি অভিযাত্রী বীরের অমর স্মৃতি আজও বহন করছে।

১৮৪৭ খ্রীঃ স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন ও তাঁর দলবল উত্তর মেরুর পথে তুষারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৫২ সালে স্যার অগাস্টাস ইংগলফিল্ড ফ্রাঙ্কলিনকে খুঁজতে এসে আবিষ্কার করেছিলেন কেপ স্যাবিন ও এলজমিয়ার দ্বীপ। কিন্তু হারানো অভিযাত্রীদের কোনো সন্ধান পাননি।

পরবর্তীকালে উত্তর মেরু অভিযানে মানুষ সফল হলেও ব্যারেন্টসই ছিলেন সেই পথের প্রথম অভিযাত্রী।

THANKS!!!!

